হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

৭

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

১৭

সম্পাদনা
গীতা দত্ত
সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূচীপত্র

মায়ামৃগের মৃগয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাতের অতিথি

ঢং ঢং ঢং!

রাত তিনটে! কলমদানীতে কলম রেখে অরুণ চেয়ার-টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বিখ্যাত লেখক অরুণকুমার চৌধুরী।

আজ একটা জরুরি রচনা শেষ করার কথা। কিন্তু লেখা শেষ হল না। যত রাত বাড়ে, লেখাও যেন তত পুরুভুজের মতন বহু বাহুবিস্তার করতে থাকে। রাত তিনটের পর রচনাকে আর এমন অতিবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া চলল না। ক্ষান্ত হতে বাধ্য হল অরুণ।

উর্ধ্বমুখে হাঁ করে অরুণ মস্ত-বড়ো একটি জৃম্ভণ ত্যাগ করলে। তারপর গেঞ্জিটা খুলে রেখে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলে।

পায়ে পায়ে শয্যার দিকে এগিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে শব্দ হল—ধ্রুম ধ্রুম ধ্রুম!

রিভলবারের আওয়াজ! এত রাত্রে কলকাতার রাস্তায় রিভলবার ছোড়ে কে?

মুহূর্তে ভেঙে গেল অরুণের তন্দ্রাজড়তা। সে একদৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখা গেল কেবল নিরেট অন্ধকার। এ আর সেই আগেকার আলোকময়ী নগরী নয়—এ হচ্ছে, ব্ল্যাক-আউটের অপরিচিত কলকাতা, রাত সাড়ে নয়টা বাজলেই তিমির-ঘোমটায় মুখ ঢেকে এখন ঘুমিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়।

অন্ধকারকে যেন সশব্দে পদাঘাত করতে করতে দ্রুতবেগে কে ছুটে এল। তারপর পায়ের শব্দ থেমে গেল ঠিক অরুণের বাড়ির সামনে এসেই।

হঠাৎ কোথায় বেজে উঠল একটা তীব্র বাঁশি! সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে জাগল কত লোকের স্পষ্ট-অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর এবং দ্রুত পদশব্দ!

তারপরেই তার ঘরের দরজায় করাঘাত—একবার, দুইবার, তিনবার!

অরুণ চমকে উঠে বললে—'কে?'

চাপা গলায় শোনা গেল, 'চুপ! আমি বরুণ। আলো জ্বেলো না। শীগগির দরজা খোলো!'

দরজা খুলতেই বরুণ ঘরের ভিতর এসে ঢুকল—শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনেই বোঝা গেল, সে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে।

অরুণ সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি বাড়ির ভিতরে এলে কেমন করে?'

বরুণ বললে, 'তোমার ট্যাঙ্কের জলের পাইপ ধরে।'

—'কিন্তু—'

—'আর কিন্তু নয়, আমি এসেছি এইটেই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। ওই শোনো—'

কড়াকড়, কড়াকড়, কড়াকড়! অরুণের বাড়ির সদর দরজার কড়া ক্রমাগত বাজতে লাগল!

—'ব্যাপার কি বরুণ?'

—'বলবার সময় নেই। পুলিস এসে পড়েছে—নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পেয়েছে! ডিটেকটিভ প্রশান্তের চোখ বিড়ালের মতোন—অন্ধকারেও দেখতে পায়! অদৃশ্য হলুম!'

—'কোথায়?'

—'আমি নিজেই এখন জানি না।' ফস করে একটা টর্চ জ্বেলে বরুণ একলাফে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ল।

কড়াকড়, কড়াকড়, কড়াকড়!

তারপরেই ডাকাডাকি—'বাড়িতে কে আছেন? দরজা খুলুন!'

অরুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন মিনিট-খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন!'

—'কে আপনারা?'

—'পুলিস!'

—'এখানে কি দরকার?'

—'আপনার বাড়িতে আসামি ঢুকেছে।'

—'অসম্ভব। আমার—'

—'ও সব কথা পরে হবে। আগে দরজা খুলে দিন।' শেষ কথাগুলো কর্কশ হুকুমের মতন শোনাল।

অরুণ আগে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। তারপর নিচে নেমে এসে সদর দরজা খুলে দিলে।

এত অন্ধকারেও বোঝা গেল, রাস্তা পুলিসের লোকে ভরে গিয়েছে। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল এক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রকাণ্ড ব্যক্তি—অরুণ দেখেই চিনলে, সে হচ্ছে বাংলার গোয়েন্দা পুলিসের প্রসিদ্ধ কর্মচারি প্রশান্ত মজুমদার। তার পিছনে ও আশে-পাশে কয়েকজন সাধারণ পুলিস অফিসার ও সার্জেন্ট।

আঁধার রাতের ভিতরে প্রশান্তের দুই ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ চক্ষু যেন তীব্র অগ্নিকণা বৃষ্টি করছে। প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার নাম কি?'

—'অরুণ চৌধুরী।'

—'পেশা?'

—'সাহিত্য চর্চা।'

—'ও, আপনি হচ্ছেন লেখক অরুণ চৌধুরী? বেশ, বেশ! এতক্ষণ আপনি কি করছিলেন?'

—'রাতটা ঘুমোবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। আমি ঘুমোচ্ছিলুম।'

—'কিন্তু আপনার এ নিদ্রা এখন কাল-নিদ্রায় পরিণত হতে পারে তা জানেন?'

—'না, অতটা আমি জানি না।'

—'দস্যু দীনবন্ধু আপনার বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে।'

—'আপনার এ কথা আমি মানতে রাজি নই। কারণ আমার সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।'

—'দীনবন্ধু দশজন সাধুর মতন সদর দরজা দিয়ে কারুর বাড়িতে ঢোকে না। সে আপনার বাড়িতে ঢুকেছে ওই জলের পাইপ বয়ে।'

—'এ কথা সত্য হলেও বলব, আমার নিদ্রা কালনিদ্রায় পরিণত হবার ভয় নেই। কারণ কে না জানে, দীনবন্ধু ডাকাত হলেও নরহত্যা করে না?'

প্রশান্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'তাহলে আপনি কি দীনবন্ধুকে আশ্রয় দিতে চান?'

—'না।'

—'তাহলে আপনার বাড়িটা আমরা একবার খুঁজে দেখতে পারি কি?'

—'মিছেই খুঁজবেন। দীনবন্ধু আমার বাড়িতে যদি ঢুকেও থাকে, তাহলে এখনও সে ধরা পড়বার জন্যে অপেক্ষা করছে না।'

প্রশান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'অপেক্ষা করতে সে বাধ্য। আর তার পালাবার পথ নেই। আপনার বাড়ির দুদিকে রাস্তা আর দুদিকে খোলা জমি। চারিদিকেই পুলিসের পাহারা। দীনবন্ধু পাখি নয় যে উড়ে পালাবে।'

অগত্যা অরুণকে বলতে হল, 'বেশ, তাহলে খুঁজে দেখুন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গড়গড়ার নল

একতলা, দোতলা ও তেতলার সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজে পুলিসের লোকেরা শেষটা প্রবেশ করল অরুণের শয়নগৃহে।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'এই ঘরেই শুয়ে আপনি ঘুমোচ্ছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বাড়ির সব জায়গা—এমন কি ইঁদুরের গর্ত পর্যন্ত খুঁজতে বাকি রাখি নি। দীনবন্ধু নিশ্চয় এই ঘরেই লুকিয়ে আছে।'

দুজন সার্জেন্ট উপরে এসেছিল। প্রশান্তের কথা শুনে তারা কোমরের রিভলবারে হাত দিলে।

প্রশান্ত বললে, 'অরুণবাবু, আপনাকে এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতন দেখাচ্ছে কেন?'

অরুণ তাড়াতাড়ি শুকনো হাসি হেসে বললে, 'রাত সাড়ে-তিনটের সময়ে পুলিসের হাঙ্গামা কার ভালো লাগে মশাই?'

প্রশান্ত আর কিছু না বলে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পুলিসের লোকেরা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল।

তীক্ষ্ণ চোখে বিছানার দিকে চেয়ে প্রশান্ত বললে, 'অরুণবাবু, আপনি আমাদের সঙ্গে ছলনা করছেন। সত্যিই কি আপনি ঘুমোচ্ছিলেন?'

—'আপনার এই অন্যায় প্রশ্নের অর্থ বুঝলুম না।'

—'মাপ করবেন অরুণবাবু, আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না। কিন্তু বিছানার

চাদর আর বালিশের দিকে চেয়ে দেখুন। কোথাও একটুও ভাঁজ নেই, দেহের ভার পড়েছে এমন কোনও চিহ্নই নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আজ রাত্রে এ বিছানায় শুয়ে কেউ ঘুমোয়নি।'

অরুণ বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে, 'আমিও আপনার কথা সমর্থন করি।'

—'তার মানে?'

—'লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ওই ইজিচেয়ারখানার উপরে।'

—'ও, তাই নাকি?'

পুলিসের খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ হল। ঘরের মধ্যে কারুকে পাওয়া গেল না।

অরুণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, 'প্রশান্তবাবু, দেখলেন আমার কথা ঠিক কি না? দীনবন্ধু এখানে নেই। আপনারা অকারণেই আমার শান্তিভঙ্গ করলেন!'

প্রশান্ত হতাশ ভাবে বললে, 'আশ্চর্য! দীনবন্ধু কি ভেলকি জানে? হাতের মুঠোয় এসেও কর্পূরের মতন উড়ে গেল!'

ঢং ঢং ঢং ঢং! রাত চারটে।

অরুণ বললে, 'এইবারে আপনারা আমাকে একটু ঘুমোবার ছুটি দিলে সুখী হব।'

প্রশান্ত বললে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এইবারে আমরাও বিদায় হচ্ছি। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম, ক্ষমা করবেন। কি করব বলুন, মানুষকে কষ্ট দেওয়াও আমাদের কর্তব্যের মধ্যে! আচ্ছা, আসি মশাই—নমস্কার!'

—'নমস্কার।'

পুলিসরা অদৃশ্য হল। অরুণ ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল। আজ মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল। তার বাড়ির ভিতরে বরুণকে পাওয়া গেলে সেও হয়তো ফাঁকি দিতে পারত না আইনের নাগপাশকে।

আইনের নাগপাশ! হ্যাঁ, বরুণকে বাঁচাবার জন্যে তার ভিতরেও সে ধরা দিতে রাজি আছে,—কিন্তু আজ যে বরুণ সত্যসত্যই বাঁচল, সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা।

বরুণ—তার শৈশববন্ধু বরুণ! এক গ্রামে তাদের জন্ম, একসঙ্গে তারা ছেলেবেলায় খেলা করেছে, বাল্যে ইস্কুলে পড়েছে, যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বরুণ ধনীর সন্তান হলেও চিরদিনই গরিবের দুঃখে কাতর। সে মেলামেশা করত গরিবদের সঙ্গেই এবং বরাবরই তার মূলমন্ত্র ছিল—'দরিদ্র-নারায়ণের সেবা'। যেখানে অভাবের হাহাকার, সেইখানেই তার আবির্ভাব। যেখানে বন্যা বা ঝড় বা ভূমিকম্পের দৈব দুর্বিপাক হয়েছে, চুম্বকের টানে আকৃষ্ট লোহার মতন বরুণ সেখানে ছুটে যাবেই। কত যে তার গোপন দান ছিল, অরুণ পর্যন্ত জানে না।

এই বরুণ হঠাৎ একদিন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। একে একে বছরের পর বছর কাটতে

লাগল, তবু তার সন্ধান নেই। সকলে স্থির করলে, বরুণ সন্ন্যাসী হয়েছে। কিন্তু অরুণ এ-কথা বিশ্বাস করেনি। সে জানত, বরুণ হচ্ছে জনতার সাধক—লোকালয়ের বাইরে গিয়ে সাধনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। এবং যাবার সময়ে বরুণও তাকে চিঠিতে জানিয়ে গিয়েছিল—'আমি অদৃশ্য হচ্ছি আরও ভালো করে দৃশ্যমান হবার জন্যে।'..........

সুদীর্ঘ আট বৎসর অজ্ঞাতবাস করবার পর বরুণ আবার যখন দৃশ্যমান হল, লোকের কাছে সে তখন 'দস্যু দীনবন্ধু' নামে বিখ্যাত!

মনে আছে তার, বরুণের মুখে প্রথম যেদিন এই সত্য জানতে পারলে, সেদিন সে কতখানি আহত হয়েছিল! বরুণ আজ ডাকাত দীনবন্ধু!

তারপর বরুণ যখন তার দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলে, তখনও সে মত-পরিবর্তন করলে না বটে, কিন্তু মানতে বাধ্য হল যে, ডাকাত বলতে সব সময়েই অসাধু বোঝায় না!

খাঁটি বন্ধুত্ব ভোলা অসম্ভব। দস্যু হলেও বরুণকে সে ত্যাগ করতে পারবে না!

এই আজকেই বরুণকে রক্ষা করবার জন্যে তাকে মিছে কথা কইতে হল। এক্ষেত্রে উপায় কি?

অরুণ বসে বসে এইসব কথা ভাবছে, এমন সময়ে ঘরে এসে ঢুকল শ্রীধর।

শ্রীধরও আগে ছিল ডাকাত এবং বার-দুয়েক জেলও খেটেছিল। কিন্তু তারপর প্রথমে বরুণের অধীনে চাকরি নেয়। এবং বরুণ অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করবার পর অরুণ তাকে দেয় নিজের ভৃত্যের পদ।

শ্রীধরের বয়স এখন আটচল্লিশ বৎসর। কিন্তু এখনও তাকে দেখলে মনে হয়, দুর্গা-প্রতিমার অসুরের মতন বলবান। চেহারাও প্রায় সেই রকম—ইয়া গালপাট্টা ঝাঁটা-গোঁফ, পাকানো চোখ, চওড়া বুকের পাটা। মিশমিশে কালো রং।

শ্রীধরকে দেখে অরুণ বললে, 'আপদরা বিদেয় হয়েছে?'

শ্রীধর বড়ো-বড়ো দাঁত বার করে একগাল হেসে বললে, 'কারা, বড়দার স্যাঙাতরা? হ্যাঁ, বিদেয় হয়েছে।'

শ্রীধর বরুণকে 'বড়দা' ও অরুণকে 'ছোটদা' বলে ডাকত।

—'সদর বন্ধ হয়েছে তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে আজকের কাণ্ডটা তুমিও দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত—সব।'

—'তার মানে, বরুণকেও তুমি দেখেছ?'

—'খালি কি দেখেছি? বড়দাকে একটা গড়গড়ার নল বখসিসও দিয়েছি!'

অরুণ সবিস্ময়ে বললে, 'গড়গড়ার নল?'

—'হ্যাঁ গো ছোটদা, হ্যাঁ। কর্তাবাবু (অরুণের পিতা) মারা যাবার পর তাঁর গড়গড়ার রবারের নলটা দালানে একটা হুকে টাঙানো ছিল। সেইটে বড়দাকে দিয়েছি।'

—'হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হল কেন? বরুণ তো তামাক খায় না।'

—'অত শত জানিনে বাবু! হঠাৎ বড়দা এসে শুধোলেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি একটা গড়গড়ার নল দিতে পারিস শ্রীধর? আমিও চট করে নলটা এনে দিলুম আর কি?'

—'বরুণের সবই অদ্ভুত! পুলিস যখন হানা দিয়েছে—ধরতে পারলে একেবারে দ্বীপান্তর, তখন সে খুঁজছে গড়গড়ার নল! শ্রীধর, নল নিয়ে বরুণ কোথায় গেল?'

—'সোজা ছাদের দিকে।'

—'কিন্তু ছাদে সে নেই। যাক, বরুণ যে পালাতে পেরেছে এইটেই ভাগ্যের কথা!'

—'কে বলে বরুণ পালিয়েছে? আমি হাজির!'

অরুণ চমকে ফিরে দেখে, দরজার সামনে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে বরুণ!

অরুণ এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি এই বাড়িতেই ছিলে?'

—'নিশ্চয়!'

—'একি, তোমার সর্বাঙ্গ যে ভিজে, জামা-কাপড় দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়ছে!'

—'আমার নাম বরুণ, আমি হচ্ছি জল-দেবতা! এতক্ষণ তাই জলের তলায় বাস করছিলুম।'

অরুণ হতভম্বের মতন বললে, 'তোমার ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

—'ভীমের চোখে ধুলো দেবার জন্যে দুর্যোধন যেমন দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন, প্রশান্তকে ফাঁকি দেবার জন্যে আমিও তেমনি ঢুকেছিলুম তোমার ছাদের জলের সিস্টার্নের ভিতরে।'

—'অসম্ভব! আমার সামনে প্রশান্ত সিস্টার্নের ডালা খুলে ভিতরে উঁকি মেরে দেখেছিল।'

—'খালি উঁকি মারেনি অরুণ, জলের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নাড়াচাড়াও করেছিল।'

—'তবে?'

—'কিন্তু আমি তখন সিস্টার্নের তলার সঙ্গে মিশিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছি। তোমার ওই জলাধারটি প্রকাণ্ড। তার তলদেশ ছিল পুলিসের নাগালের বাইরে।'

—'কিন্তু প্রশান্ত যে সিস্টার্নের পাশে সন্দিগ্ধ ভাবে পাঁচ-ছ মিনিট ধরে দাঁড়িয়েছিল! তুমি নিঃশ্বাস ফেলছিলে কেমন করে?

—'একটি গড়গড়ার রবারের নলের সাহায্যে।'

—'কি বললে?'

—'ভায়া, সিস্টার্নের অতিরিক্ত জল-নিকাশের জন্যে উপরে পাশের দিকে একটা পাইপ থাকে তা জানো? গড়গড়ার রবারের নলের একদিকটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম সেই পাইপের মধ্যে, আর নলের অন্য-দিকটা ছিল আমার মুখবিবরে। জলের তলায় শুয়ে নল-পথে আমি মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছিলুম। ব্যাপারটা কঠিন আর অভ্যাসসাপেক্ষ বটে, কিন্তু পরীক্ষিত। পুকুরে ঢুকে খড়ের সাহায্যে এইভাবে নিঃশ্বাস ফেলে আগেও কেউ কেউ শত্রুকে ফাঁকি দিয়েছে!'

—'কিন্তু প্রশান্ত যদি লাঠি দিয়ে সিস্টার্নের তলাটা পরীক্ষা করত?'

—'আমি ধরা পড়তুম। কিন্তু সে যখন তা করেনি আর আমিও ধরা পড়িনি, তখন তোমার এত-বেশি মাথা না ঘামালেও চলবে! এখন বাবা শ্রীধর, তুমি জাগ্রত হও—বিস্মিত হয়ে অতবড়ো হাঁ করে আমার দিকে আর তাকিয়ে থেকো না, কারণ চেষ্টা করলেও তুমি আমাকে গিলে ফেলতে পারবে না! তোমার মুখ বন্ধ কর—দৌড়ে আমার জন্যে তোয়ালে আর শুকনো জামা-কাপড় এনে দাও!'

শ্রীধরের দুই চোখ তখন নাচছে! গদগদ কণ্ঠে সে বললে, 'বড়দা গো! দুটো পায়ের ধূলো দাও! তোমার মতন সর্দার পেলে, আবার আমি ডাকাতি করতে রাজি আছি! শাবাশ বুদ্ধি, শাবাশ বুদ্ধি!'

বরুণ ভ্রূভঙ্গি করে বললে, 'থামো থামো! আমার আর শিষ্যের দরকার নেই—এখান থেকে দূর হও!'

শ্রীধর মাথা নাড়তে নাড়তে আপন মনে বলতে বলতে বেরিয়ে গেল—'শাবাশ বুদ্ধি, শাবাশ বুদ্ধি! এমন সর্দার পেলে দুনিয়া জয় করতে পারি!'

বরুণ তখন পকেটের ভিতর থেকে একে একে বার করলে গোটাকয় হীরার আংটি, একছড়া মুক্তার মালা, একছড়া রত্নহার এবং আরও খান-কয়েক জড়োয়া গহনা!

অরুণ বিস্ফারিত চক্ষে অলংকারগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

বরুণ মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললে, 'এগুলোর দাম কত হবে জানো?'

অরুণ বিরক্ত স্বরে বললে, 'না। জানতেও চাই না।'

—'অন্তত দেড় লাখ টাকা। এগুলো হচ্ছে বংশীবদন সাহার সম্পত্তি। এবারের যুদ্ধে বংশীবদন কোটিপতি হবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার, শহর-গ্রামের পথে পথে অনাহারে হাজার হাজার মানুষ মারা পড়ছে, খেতে দিতে পারছে না বলে মা সন্তান বিলিয়ে দিচ্ছে, বাপ পুত্রহত্যা করছে, কিন্তু বংশীবদনদের মতন লোকের বিরাট সব গুপ্তভাণ্ডারে গিয়ে দেখো, মজুত করা রয়েছে চাল আর ডাল আর আটা-ময়দা আর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পাহাড়! এইসব মাল আটগুণ দশগুণ কি আরও বেশি দামে বিক্রি করে পাষণ্ড বংশীবদনের দল দেশবাসীদের অস্থি-কঙ্কালের উপরে বসে ধনকুবের হতে চায়! তাই আমি নিয়েছি এদের শাস্তি দেবার ভার!'

অরুণ বললে, 'শাস্তি দেবার তুমি কে?'

বরুণের দুই চক্ষু জ্বলে উঠল! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পূর্ণকণ্ঠে সে বললে, 'আমি হচ্ছি ঈশ্বরের লাঠি! যারা দরিদ্রের রক্তশোষণ করে, তাদের পিঠ ভাঙব বলে আমি হয়েছি তৈরি! রাজার আইনের জাল হচ্ছে ছেঁড়া—ধরা পড়লেও এই বংশীবদনের দল নানা ফাঁক দিয়ে সুকৌশলে বেরিয়ে আসে। তাই আমি দাঁড়াতে চাই এদের বিরুদ্ধে। আইনের জালের ফাঁক দিয়ে এক-একজন বেরিয়ে আসবে, আর আমিও চালাব একে একে তাদের ওপরে লাঠি!'

—'আইনের ত্রুটি শোধরাবার জন্যে তুমিও তো চাইছ আইনকে অমান্য করতে!'

—'ধরো, তাই।'

—'আরও অনেকে যদি তোমার মত অবলম্বন করে, তাহলে রাজার শাসনকার্য যে অচল হয়ে পড়বে।'

—'বিষ ভালো জিনিস নয়। কিন্তু বিষপানের পর যাঁর বেঁচে থাকবার শক্তি আছে, তিনিই পূজা পান নীলকণ্ঠ মহাদেব নামে। আমার মত অবলম্বনের শক্তি হবে ক-জনের? চোর-ডাকাত না হয়েও চোর-ডাকাতের অভিশপ্ত জীবন যাপন করবার সাধ্য আর সাহস হবে কার?'

—'তুমি পরস্ব হরণ কর। তুমিও তো চোর-ডাকাতের মতো!'

—'ভাই অরুণ, তোমার মুখেও এ কথা শুনে দুঃখিত হলুম। আমি কি চুরি-ডাকাতি করি, স্বার্থের জন্যে? তুমি কি জানো না, বংশীবদনের গহনাগুলো বেচে যদি দেড়লাখ টাকা পাই, তাহলে তার সমস্তটাই লাভ করবে তারা—যাদের জীবনে আশা নেই, দেহে বস্ত্র নেই, উদরে অন্ন নেই? আমি যে দরিদ্রনারায়ণদের প্রতিনিধি! দেশের জন্যে মানুষ নয়—মানুষের জন্যেই দেশ! দেশের চেয়ে মানুষ বড়ো আর আমি হচ্ছি সেই মানুষের সেবক।'

আচমকা বিষম জোরে অরুণের সদর-দরজার কড়া নেড়ে কে চিৎকার করে বললে, 'দরজা খুলুন—দরজা খুলুন—শীগগির দরজা খুলুন!'

বরুণের মুখ ম্লান হয়ে গেল—এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই সে বললে, 'বন্ধুবর প্রশান্ত আবার এসেছেন তাঁর ভ্রম-সংশোধন করতে। আমিও আবার অদৃশ্য হলুম—তুমি অনায়াসে দরজা খুলে দিতে পারো!' সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকাশ্যের গোপনতা

দরজা খুলে দিয়ে অরুণ এবারে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কি মশাই, শেষ রাতে বারবার আমাকে জ্বালাতন করবার অধিকার কি আপনাদের আছে?'

প্রশান্ত বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়ে বললে, 'নিশ্চয়ই নেই—নিশ্চয়ই নেই! কিন্তু আপনিও তো এখনও ঘুমোননি দেখছি। আর উপর থেকে আপনাদের কথাবার্তার আওয়াজও তো নিচে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছিলুম। কার সঙ্গে এত কথা কইছিলেন?'

—'শ্রীধরের সঙ্গে।'

—'শ্রীধর কে?'

—'আমার চাকর।'

—'চাকরের সঙ্গে এত কথা?'

—'আপনাদের উপদ্রবের কথাই হচ্ছিল।'

—'হ্যাঁ, আমরা যে উপদ্রব করছি, এটা স্বীকার না করলে পাপ হবে। কিন্তু আমাদের আর একবার উপদ্রব করবার অনুমতি দেবেন কি?'

—'আবার!'

—'একটু সন্দেহ থেকে গিয়েছে, সেটা দূর করবার সুযোগ চাই।'

—'আপনি কি মনে করছেন, দীনবন্ধু এখনও আমার বাড়িতে লুকিয়ে আছে?'

—'সেই রকমই তো সন্দেহ হচ্ছে! বাড়ির চতুর্দিকব্যাপী পুলিসের এই বেড়াজাল ভেদ করে একটা টিকটিকিরও যে পালাবার উপায় নেই!'

—'বেশ, আসুন। কিন্তু জানবেন, এই শেষ বার! এর পরেও আপনারা যদি অত্যাচার করতে চান, তাহলে খানা-তল্লাসির পরওয়ানা আনতে হবে।'

—'বেশ, রাজি!'

প্রশান্তের সঙ্গে সঙ্গে এ-অঞ্চলের থানার ইনস্পেক্টার, দুজন সার্জেন্ট ও আরও কয়েকজন পুলিসের লোক পদশব্দে বাড়ি মুখরিত করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। পিছনে পিছনে চলল অরুণ।

প্রশান্ত আর কোনোদিকে চাইলে না, সোজা উঠে গিয়ে দাঁড়াল ছাদে। তারপর অগ্রসর হল জলের সিস্টার্নের দিকে।

অরুণের বুক দুপ-দুপ করতে লাগল! এইবারেই সর্বনাশ! বরুণ ঠিক আন্দাজ করেছে, প্রশান্ত এসেছে তার ভ্রম-সংশোধন করতে!

প্রশান্ত ইনস্পেক্টারের কাছ থেকে তার লাঠিটা চেয়ে নিলে। তারপর সিস্টার্নের ডালা খুলে লাঠিগাছা জলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চারিদিকে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অরুণের মাথা ঘুরে গেল। সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে নিলে।

প্রশান্ত লাঠিগাছা আবার জল থেকে বার করে আনলে। তার মুখ দেখে বোঝা গেল, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়।

অরুণ আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

প্রশান্ত তবু দমবার পাত্র নয়। টর্চ নিয়ে সিস্টার্নের ফাঁকের ভিতরে মাথা গলিয়ে ভিতরটা ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ সে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল।

ইনস্পেক্টার বললে, 'ব্যাপার কি?'

অরুণের বুকে আবার লাগল চমক!

প্রশান্ত সিস্টার্নের ভিতর থেকে গড়গড়ার রবারের নলটা টেনে বার করে আনলে।

ইনস্পেক্টার বললে, 'ও আবার কি?'

—'তামাক খাবার নল। সিস্টার্নের জল-নিকাশের পাইপের সঙ্গে লাগানো ছিল। অরুণবাবু, এটা এমন অস্থানে এল কেন?'

অরুণ যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, 'জানি না।'

ইনস্পেক্টার বললে, 'একটা তুচ্ছ তামাকের নল নিয়ে ভাববার সময় এখন নেই। দেখছেন তো প্রশান্তবাবু, আপনার অনুমান ঠিক নয়। আসামি সরে পড়েছে।'

—'হ্যাঁ, এখন হয়তো সরে পড়েছে! কিন্তু এই রবারের নলটাই প্রমাণিত করছে, আমরা প্রথম বারে যখন এখানে এসেছিলুম, দীনবন্ধু তখন এইখানে জলে ডুব দিয়ে—খুব সম্ভব—শুয়েছিল।'

—'ধেৎ!'

—'রবারের নলটা ছিল তার মুখে, আর সে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল মুখ দিয়েই।'

—'অ্যাঁ!'

—'হ্যাঁ। আমি—খালি আমি কেন—আমরা সকলেই হচ্ছি গাধার মতন নির্বোধ, তাই তখন লাঠি দিয়ে সিস্টার্নের তলদেশ পর্যন্ত পরীক্ষা করিনি! এখন চোর পালিয়েছে, তাই আমাদের বুদ্ধিও বেড়েছে।'

ইনস্পেক্টার গর্জন করে বললে, 'আসামি নিশ্চয়ই এখনও এই বাড়ির ভেতরে আছে! আমরা আবার খুঁজে দেখব!'

প্রশান্ত নিরাশ কণ্ঠে বললে, 'খুঁজতে চান, খুঁজে দেখুন। কিন্তু আর কোনও আশা নেই। দীনবন্ধু হচ্ছে মহা সুচতুর! হাতের কাছে পেয়েও তাকে ছুঁতে পারলুম না, এতক্ষণ সময় পেয়েও সে কি আর ধরা দেবার জন্যে বসে আছে?'

আবার খোঁজাখুঁজি শুরু হল।

দোতলায় নেমে শ্রীধরকে ডেকে প্রশান্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমারই নাম শ্রীধর?'

—'আজ্ঞে!'

—'তোমাদের বাবু শোবার ঘরে বসে একটু আগে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?'

—'আজ্ঞে, আমার সঙ্গে।'

—'বাপু শ্রীধর, আমি যদি বলি তোমাদের বাবু অন্য একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছিলেন?'

—'আজ্ঞে, তাহলে সত্যকথা বলা হবে না!'

অরুণ রুষ্ট স্বরে বললে, 'প্রশান্তবাবু, আপনি কি আমাকেও সন্দেহ করছেন?'

বিনয়ে নত হয়ে প্রশান্ত বললে, 'ক্ষমা করবেন। পুলিসের লোক আমি, সকলকেই সন্দেহ করা রীতিমতো বদ-অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রায় মুদ্রাদোষের মতন আর কি?'

দোতলার পর একতলায় সন্ধান আরম্ভ হল। কোথাও আসামি নেই।

তখন অন্ধকারের নিবিড়তা কমে আসছে প্রভাতের আভাসে। এখনও ঘোর-ঘোর ভাব কাটেনি বটে, কিন্তু দৃষ্টি নয় আর অন্ধ।

ইনস্পেক্টার বললে, 'সব ঘরই তো দেখা হল, সব ফোক্কা! বাকি আছে শুধু ওই বাইরের ঘরটা।'

প্রশান্ত নিস্তেজ ভাবে বললে, 'সদর দরজায় পুলিসের পাহারা, তার পাশেই ওই বাইরের ঘর—ওর সব দরজা-জানলাই খোলা রয়েছে, ওর ভিতরটাও এখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দীনবন্ধু ওখানে থাকবার ছেলে নয়।'

ইনস্পেক্টার তবু দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে বললে, 'নাঃ, ভেতরে কৌচ-সোফা ছাড়া আর কিছুই নেই! আসামি একেবারে পগার পার, আমাদের কাদাঘাঁটাই সার!'

পুলিসের সবাই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

দরজার চৌকাঠের উপরে দাঁড়িয়ে অরুণ সহাস্যে বললে, 'কি মশাই, এবার দরজা বন্ধ করি, না আরও-একবার ভিতরে পায়ের ধুলো দিতে চান?'

প্রশান্ত বললে, 'না, আর বোধহয় দরজার কড়া নাড়ব না।'

—'নাড়লেও দরজা আর খুলব না! উল্টে খবরের কাগজে আজকের সব কথা জাহির করে দেব। জানেন, আমি সাংবাদিক?'

প্রশান্ত ত্রস্তকণ্ঠে বললে, 'আজকে যে-রকম ল্যাজেগোবরে হলুম তাই কি আমাদের পরম শাস্তি নয় মশাই? এর মধ্যেই তো কাগজওয়ালারা দীনবন্ধুর ব্যাপার নিয়ে আমাদের যথেষ্ট দুয়ো দিচ্ছে, তার ওপরে আজকের কেলেঙ্কারিটাও ছাপার হরপে বেরুলে আমাদের যে মুখ দেখাবার যো থাকবে না! অতখানি উপকার না করলেই খুশি হব।'

উপরের ঘরে ঢুকে অরুণ অত্যন্ত করুণ ভাবে একেবারে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শ্রীধর অমন মস্তবড় শরীর নিয়েও ঘরময় যেন নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল ছোট্ট টুনটুনির মতন হালকা পায়ে।

অরুণ মুখ ভার করে বললে, 'তোমার অত ফুর্তি আমার ভালো লাগছে না শ্রীধর!'

—'ছোটদা, আমার ফুর্তি আমার কিন্তু বেশ লাগছে।'

—'তাই নাকি? এবারে গড়গড়ার নল তো হয়েছে অচল, বরুণ তোমার কাছ থেকে কি চেয়ে নিয়ে গিয়েছে? গড়গড়ার কলকে নাকি?'

—'এবারে বড়দাও কলকে চায়নি, পুলিসও কলকে পায়নি।'

—'তোমাদের দীনবন্ধু করবে ডাকাতি আর আমি সামলাব তার ঠেলা?'

—'তুমি আর কি ঠেলা সামলালে ছোটদা? নাকানি-চোবানি খেয়ে মরল তো পুলিসই!'

একটু চুপ করে থেকে অরুণ বললে, 'আচ্ছা শ্রীধর, বরুণ-শয়তান কেমন করে পালাল বল তো?'

—'Talk of the devil and he will appear! শয়তানের নাম করলেই শয়তান হয় মূর্তিমান!'

অরুণের মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই বরুণ আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল!

ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে অরুণ যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলে না!

শ্রীধর তারিফ করে বললে, 'ধন্যি বড়দা, ধন্যি! তুমি কি উপে যাওয়ার মন্ত্রও শিখেছ?'

—'Devil a bit! মোটেই না শ্রীধর, মোটেই না! আমি বাইরের ঘরে কৌচে আসীন হয়ে মুক্তিলাভের স্বপ্ন দেখছিলুম।'

অরুণ অবিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে বললে, 'বাইরের ঘরে? দরজা-জানলা খুলে, পাহারাওয়ালাদের কাছ থেকে হাতকয়েক তফাতে বসে? কি যে বল বরুণ!'

—'ঠিক তাই!'

—'উঠোন থেকে আমরা সবাই দেখেছি বাইরের ঘরে কেউ ছিল না।'

—'উঠোন থেকে তোমরা উঁচু কৌচের কেবল পিছনদিকটাই দেখতে পাচ্ছিলে। আমি ছিলুম কৌচের কোলে গুটি-সুটি মেরে।'

—'এত দুঃসাহস তোমার হল?'

—'কেন হবে না? প্রথমত, আমার হচ্ছে মরিয়ার সাহস। দ্বিতীয়ত, আমি মানুষের মনের রহস্য জানি।'

—'মনের রহস্য?'

—'হ্যাঁ। শোনো। ভেবে দেখলুম, প্রশান্ত আবার যখন ফিরে আসছে তখন গড়গড়ার নল আর ব্যবহার করা নিরাপদ হবে না। অথচ আমাকে লুকোতে হবে। কিন্তু কোথায় লুকোই? বাড়ির গোপনীয় স্থানগুলোর দিকেই পুলিসের চোখ পড়বে বিশেষ ভাবে। কিন্তু দরজা-জানলা-খোলা বাইরের ঘরের মতন প্রকাশ্য জায়গা নিশ্চয়ই কারুর সন্দেহ জাগ্রত করবে না। বিশেষ ওই বাইরের ঘরটা একটু আগেই যখন ভালো করে খুঁজে দেখা হয়েছে। কৌচখানা দরজা-জানলার দিকে পিছন ফেরানো ছিল বলে আমার আরও সুবিধা হল। তার ভিতরেই আশ্রয় নিলুম। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ভুল করিনি! খোলা ঘর দেখে পুলিস অবহেলা করে চলে গেল।'

দুই হাতে তালি দিয়ে শ্রীধর বললে, 'শাবাশ বুদ্ধি—শাবাশ বুদ্ধি! আগে যদি এমন সর্দার পেতুম তাহলে কি আমাকে দু-দুবার জেল খেটে মরতে হত!'

বরুণ বললে, 'আমি জানি আমাকে ধরবার জন্যে পুলিস আজ ফাঁদ পেতেছিল! কিন্তু তার ভিতর থেকেই আমি বংশীবদনের ট্যাঁক হালকা করে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু পুলিসকে আরও শিক্ষা দেওয়ার দরকার। তুমি দেখে নিয়ো অরুণ, এইবারে আমিও ফাঁদ পাতব পুলিসের জন্যে......শ্রীধর, তুমি হাঁ-করে থাকার অভ্যাস ছাড়ো। যাও, নিয়ে এস তোয়ালে, জামা আর কাপড়!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার নাম হনুমান

বংশীবদন সাহার বাড়ির চুরির কথা গোপন রইল না, সমস্ত খবরের কাগজেই বেরিয়ে গেল।

আরও প্রকাশ পেল, ওখানে যে চুরি হবে পুলিস আগেই সে-খবর পেয়েছিল এবং চোর ধরবার জন্যে যথাসময়েই উপস্থিত হয়েছিল ঘটনাক্ষেত্রে। তবু তাদের চোখে ধুলো দিয়ে দীনবন্ধু বামাল নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে।

কাগজওয়ালারা কম নিষ্ঠুরও নয়। এই ঘটনা অবলম্বন ও পুলিসকে ঠাট্টা করে তারা হরেক-রকম ব্যঙ্গচিত্র ছাপাতেও ছাড়লে না।

তার উপরে আর এক কাণ্ড! জনৈক পত্রপ্রেরক বলে কে একজন কাগজে একখানা পত্র পাঠিয়ে অরুণের বাড়িতে পুলিসের দুর্দশার সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করে দিলে এবং সেই সঙ্গে এটাও জানালে যে, বংশীবদনের চোরাই গহনা বিক্রি করে যত টাকা পাওয়া গিয়েছে, দীনবন্ধু তার এক কপর্দকও নিজে গ্রহণ করে নি, সমস্তই বিলিয়ে দিয়েছে দীন-দুঃখীদের।

প্রশান্ত হাত কামড়াতে কামড়াতে মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখলে, গোটা দেশটা তার শোচনীয় দুরবস্থা দেখে কেবল অট্টহাসির ঐকতানই তুলছে না, সকলের কাছে পুলিসই হয়ে পড়েছে ঘৃণ্য; আর চোর দীনবন্ধুই হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধার পাত্র!

উপরওয়ালাদের কাছে ধমক খেয়ে প্রশান্ত আরও দমে গেল। প্রথমশ্রেণীর গোয়েন্দা বলে তার নামডাক ছিল যথেষ্ট; দীনবন্ধুর পাল্লায় পড়ে এইবারে তার সব সুনাম বুঝি লুপ্ত হয়ে যায়!

অত্যন্ত অশান্ত হয়ে প্রশান্ত ফোনে অরুণকে ডেকে বললে, 'অরুণবাবু, এই কি আপনার উচিত হল?' প্রভৃতি।

জবাব এল; 'আপনি উচিত-অনুচিত কি বলছেন?........ও, বুঝেছি, কাগজে সেদিনকার ব্যাপার নিয়ে যা বেরিয়েছে? বিশ্বাস করুন, ও-পত্র আমি পাঠাইনি।'

খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে প্রশান্ত আন্দাজ করলে, এ হচ্ছে নিশ্চয়ই স্বয়ং দীনবন্ধুর কীর্তি! সে তখনই উঠে খবরের কাগজের আফিসে গিয়ে হাজির হল।

সম্পাদক বললে, 'চিঠিখানা ডাকে আসেনি, কোনও লোক দিয়ে গিয়েছে।'

—'তার চেহারা কি রকম?'

—'আমি তাকে দেখিনি। আপনি সহকারী সম্পাদক সত্যবাবুর কাছে যান।'

সত্যবাবু পত্রবাহকের চেহারার এই বর্ণনা দিলেন—'না বেঁটে, না ঢ্যাঙা; না রোগা, না মোটা; না কালো, না ফর্সা!'

—'বয়স?'

—'না বুড়ো, না ছোকরা।'

—'মশাই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

—'বাপরে, পুলিস আর বাঘ কি ঠাট্টার পাত্র?'

প্রশান্তের বক্র দৃষ্টি দেখলে, সত্যবাবুর চোখে ভয়ের ভাব বটে, কিন্তু কালো মেঘের পিছনে বিদ্যুতের আভাসের মতন তার গোঁফের আড়ালে যেন ঈষৎ হাসির ইঙ্গিত!

সহ-সম্পাদকের এই দুঃসহ ব্যবহার কোনোক্রমে সহ্য করে প্রশান্ত বললে, 'নাম আর ধাম না থাকলে আপনারা তো চিঠি ছাপেন না। পত্রপ্রেরক তার নাম-ধাম দেয়নি?'

দপ্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে সহ-সম্পাদক বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছে বইকি! আসল নাম হচ্ছে অশান্ত মজুমদার।'

প্রশান্ত মজুমদার নিজের দ্বিতীয় রিপুকে প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করে বললে, 'আর ঠিকানা?'

সহ-সম্পাদক যা বললেন তা হচ্ছে প্রশান্তের নিজের বাড়ির ঠিকানা!

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে প্রশান্ত বললে, 'মশাই, পত্রপ্রেরকরা ভুল ঠিকানা দেয় কি না, সে খোঁজ রাখা আপনারা দরকার মনে করেন না বুঝি?'

সহ-সম্পাদক জবাব দিলেন, 'তাহলে প্রত্যেক কাগজের মালিককে একটি বিরাট গোয়েন্দাবাহিনী পুষতে হয়।'

প্রশান্ত আর বাক্যব্যয় না করে নিজের বাড়ির দিকে দ্রুত পদচালনা করলে। এবং যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করলে যে, এই দুঃসহ সহ-সম্পাদকটিকে যদি কোনোদিন হাতের মুঠোর মধ্যে পাই, তাহলে আমার হাতের মুঠো খোলবার জন্যে বড় অল্প আয়োজনের প্রয়োজন হবে না!

চারিদিকেই দীনবন্ধুর নাম! প্রশান্তের যশের প্রদীপ ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে এবং খবরের কাগজে কাগজে দীনবন্ধুর উদারতা ও পরদুঃখকাতরতার নূতন কাহিনীর আকার হয়ে উঠছে অধিকতর দীর্ঘ!

দীনবন্ধু কোথাও অনাথা বিধবার একমাত্র আশ্রয়স্থল বাঁধা-পড়া বাড়ি উদ্ধার করে দিচ্ছে, কোথাও হাজার হাজার দরিদ্র ও ভিখারির মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করছে, কোথাও কন্যাদায়গ্রস্তের কাছে মোটা টাকার বাণ্ডিল পাঠাচ্ছে, কোথাও অত্যাচারী জমিদারের পিঠে বেতের ও কপালে তপ্ত লোহার ছাপ বসিয়ে দিয়ে আসছে।

কেউ দীনবন্ধুর নামে ভয়ে কাঁপে, কেউ-বা দেবতা ভেবে তার নামে জয়ধ্বনি দেয়!

দীনবন্ধুর পিছনে ছুটে ছুটে প্রশান্তের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন হাঁপিয়ে পড়ল। সে যেন ছায়াকে অনুসরণ করছে—দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারছে না! প্রশান্তের দৃঢ় ধারণা হল, পুলিসকে গোপনে খবর জোগানো যাদের পেশা, তাদের দলেও দীনবন্ধুর একাধিক গুপ্তচর আছে।

সেদিন বাসায় ফিরতেই তার স্ত্রী নবতারা বললে, 'ওগো, একটি ভদ্রলোক তোমার পথ চেয়ে বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন! তোমার ফিরতে এত দেরি হল কেন?'

প্রশান্ত ভারভার মুখে গজগজ করে বললে, 'সাধ করে কি আর দেরি করেছি! ছুটতে হয়েছিল বজবজে!'

—'কেন গো, এত জায়গা থাকতে বজবজে?'

—'একখানা উড়োচিঠিতে খবর পেলুম, দীনুডাকাত নাকি সেখানে মস্ত এক ভোজের আয়োজন করেছে—'

গালে হাত দিয়ে নবতারা বললে, 'ওমা, অবাক! কালে-কালে হল কি! ডাকাত আবার ভোজ দেয় নাকি?'

—'এ হচ্ছে আধুনিক ডাকাত গিন্নী, আধুনিক ডাকাত! কাগজওলারা এর নাম দিয়েছে বিশ শতাব্দীর রবিনহুড! কেউ কেউ তাকে বিশ শতাব্দীর বিশেডাকাত বলেও ডাকে!'

—'সবই আদিখ্যেতা! মরুক গে, তারপর?'

—'বজবজে এক গরিব বিধবার মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না, দীনুডাকাতের টাকার জোরে আজ তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।'

নবতারা একেবারে বিগলিত হয়ে বললে, 'দীনুর তো তাহলে খুব দয়ার শরীর! আহা, তার ভালো হোক, মঙ্গল হোক—'

বাঘের ঘরেও হরিণের শুভকামনা! প্রশান্ত মর্মাহত হয়ে গর্জন করে উঠল, 'গিন্নী! তুমিও কাগজওলাদের দলে!'

মুখ ফসকে ফস করে বেসুরো কথা বেরিয়ে গিয়েছে বুঝে নবতারা অনুতপ্তের মতন জড়সড় হয়ে রইল।

প্রশান্ত খানিকক্ষণ গজগজ করে বললে, 'কিন্তু বজবজে যাওয়াই সার হল! সেখানে দীনুর টাকায় বিধবার মেয়ের বিয়েও হচ্ছে, ভোজও হচ্ছে—কিন্তু দীনু হাজির নেই।'

স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নবতারা বললে, 'আহা, তবে তো তোমার ভারি কষ্ট হয়েছে! কিন্তু কি আর করবে বল, যে পুজোয় যে মন্ত্র! এখন বঠ্‌কখানায় গিয়ে ভদ্রলোকটির সঙ্গে একবার দেখা করে এস!'

—'আমি বাড়িতে ঢোকবার সময়ে দেখে এসেছি, বৈঠকখানায় কেউ নেই।'

—'তাহলে তিনি বসে বসে চলে গিয়েছেন।'

আর কিছু না বলে নবতারা গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরের ভিতরে।

উপরের ঘরে প্রবেশ করে প্রশান্ত জামা-কাপড় পরিবর্তন করছে, হঠাৎ তার নজর পড়ল ঘরের একদিকে! সেখানে বড়ো টেবিলটার দেরাজগুলো খোলা এবং টেবিলের উপরেও কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে এলোমেলো ভাবে! এবং তার উপরে কাগজচাপার নিচে রয়েছে এমন একখানা বড়ো আকারের নীল খাম—প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ছুটে গিয়ে প্রশান্ত খামখানা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ভিতরের চিঠিখানা বার করে পড়তে লাগল :—

শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মজুমদার
করকমলেষু

বন্ধুবর,

এসে ফিরে গেলুম। আপনার সঙ্গে দেখা হল না বলে আমি দুঃখিত। যদিও আপনার মুখচন্দ্র দেখবার আশা আমার ছিলও না।

আপনার স্ত্রী নবতারাঠাকুরাণী হচ্ছেন প্রথমশ্রেণীর গৃহিণী। রান্নাঘরে বসে এমন একমনে তিনি হাতা ও খুন্তির সদ্ব্যবহার করছিলেন যে, কখন-যে আমি পা টিপে ছায়ার মতন উপরে উঠে এসেছি সেটা দেখবার অবকাশও তাঁর হয় নি। ঝি গিয়েছে আপনার শিশু পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বেড়াতে এবং চাকর গিয়েছে বাজারে, কাজেই আমাকে বাধা দেবার কেউ ছিল না।

আমার সম্পর্কীয় কতগুলো দরকারি কাগজপত্র আপনি হস্তগত করেছেন। সেগুলো

আমার কাছে থাকাই নিরাপদ। তাই সেগুলো নিয়ে যেতেই আমি এসেছি এবং সেগুলো নিয়েই চললুম। আপনার বিশেষ অসুবিধা হবে বলে আমিও বিশেষ দুঃখিত।

একটা সুখবরও দিই। আপনি চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের নাম শুনেছেন তো? তারা দুই ভাই কলকাতার সবচেয়ে না হোক—সর্বপ্রধান বস্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্য। পথে পথে নগ্ন বা প্রায়নগ্ন নর-নারীর জনতা, কিন্তু অতিরিক্ত লাভে তারা করছে অগ্নিমূল্যে কাপড় বিক্রি। চুনিচাঁদ বহু লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেলেছে। টাকার ভার তারা প্রায় সইতে পারছে না—এই ভারের খানিকটা আমি কমিয়ে দিতে চাই। তাই স্থির করেছি, আগামী অমাবস্যার রাতে আমি চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের বাড়িতে যাব অনাহূত অতিথির মতো। আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ব্যাকুল। সেই রাত্রে আমাদের দেখাশোনা হতে পারে।

কিন্তু সাবধান! আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, এ শুভখবরটা যেন চুনিচাঁদ মানিকচাঁদ ভ্রাতৃযুগলের দুই জোড়া কর্ণকুহরের মধ্যে প্রবেশ না করে। কারণ তাহলে তারা মূল্যবান জিনিসগুলো নিশ্চয়ই স্থানান্তরিত করে ফেলবে এবং কোনও রহস্যজনক উপায়ে আমিও যথাসময়ে তা জানতে পারব। বলাবাহুল্য তাহলে ঘটনাক্ষেত্রে আমার উপস্থিতির দরকার হবে না এবং আমাকে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ থেকে আপনিও হবেন বঞ্চিত। ইতি—

আপনার অনুগত
দীনবন্ধু

পুনশ্চ। আর একটা কথা জানাতে ভুলে গিয়েছি। শ্রীমতী নবতারাঠাকুরাণীর রান্নার হাত বোধহয় খুব মিঠে। কারণ রান্নাঘর থেকে যেসব সুগন্ধ এসে আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে, তা যেমন মোহনীয় তেমনি লোভনীয়। আজ 'ঘ্রাণে অর্ধভোজন' হল, একদিন রসনায় পূর্ণভোজন করবার দুর্দমনীয় সাধ হচ্ছে। চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের বাড়িতে যদি আপনার প্রচণ্ড আলিঙ্গনপাশ থেকে অব্যাহতি পাই, তাহলে একদিন স্বেচ্ছায় এখানে এসে নবতারাঠাকুরাণীর স্বহস্তে পরিবেশিত অমৃত গলাধকরণ করে ধন্য হয়ে যাব। আমি নিজেই নিমন্ত্রণ করছি নিজেকে—আপনাকে আর কষ্ট দিলুম না।'

পত্র পাঠ করে প্রশান্তের মুখ হয়ে উঠল হত্যাকারীর মতো। দাঁতে দাঁতে ঘষে সে বললে, 'দীনু আসবে আবার এখানে? ইঁদুর আসবে বিড়ালের কাছে নিমন্ত্রণের খাবার খেতে? একবার এসে আরামটা দেখুক না!'

তারপর কিছু শান্ত হয়ে প্রশান্ত একখানা টুলের উপরে বসে পড়ে ভাবতে লাগল।

চুনিচাঁদ মানিকচাঁদ মস্তবড়ো ব্যবসায়ী, তাদের ঘরে টাকা ধরে না, আর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট।

দীনবন্ধু হানা দেবে ওদের ভাণ্ডারেই। এখন কি করা উচিত? পুলিসের বড়োসাহেবের কাছে সব কথা খুলে বলবে? অসম্ভব!

কারণ, প্রথমত তাহলে দীনবন্ধুর চিঠিখানাও সাহেবের কাছে দাখিল করে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, সে কেমন করে, কত অনায়াসে তাকে বাঁদরনাচ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে!

দ্বিতীয়ত, বড়োসাহেব ব্যাপার দেখে তাকে অযোগ্য ভেবে তার বদলে যদি আর কারুর হাতে চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের ভার অর্পণ করেন? তাহলে দীনুডাকাতকে গ্রেপ্তার করবার গৌরব সে কেমন করে অর্জন করবে?

অতএব ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই ভালো বুদ্ধিমানের মতো। হঠাৎ দীনুডাকাতকে বন্দী করে সে নিজের পদোন্নতির ব্যবস্থা করবে, কাগজওয়ালাদের উপরে টেক্কা মারবে, গোটা বাংলাদেশকে চমকে দেবে।

চুনিচাঁদ মানিকচাঁদও থাকুক অন্ধকারে। তাদের খবর দিলেও সব ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা। খুব সম্ভব তাদের বাড়ির ভিতরেও দীনুর চর আছে। চুনিচাঁদ মানিকচাঁদ ভয় পেয়ে যদি টাকাকড়ি গহনাপত্র সরিয়ে ফেলে, তবে দীনুর কানে সে খবর পৌঁছতে দেরি হবে না। তাহলে তাকে আর পাওয়াও যাবে না নাগালের মধ্যে।

দীনু বিশেডাকাতের উপরেও একহাত নিতে চায়! বিশে যাদের বাড়িতে ডাকাতি করবে, খবর পাঠাত তাদেরই কাছে। আর দীনু বিজ্ঞাপনী পাঠায় খোদ পুলিসের কাছেই। কী স্পর্দ্ধা!

রও, তুমি বড়ো বাড় বেড়েছ, এইবারে তোমার দর্প যদি চূর্ণ না করতে পারি তবে আমার নাম হনুমান!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঢাকের বদলে নরুণ

বুদ্ধু হচ্ছে মস্ত একদল চোর ও গুণ্ডার সর্দার। জোড়াবাগানের একটা প্রকাণ্ড বস্তীর মধ্যে তার প্রধান আড্ডা।

বাইরের লোক জানে, সে গোরু ও মোষের গাড়ির গাড়োয়ানদের সর্দারি করে। তার খাটালে পঞ্চাশ-ষাটটা গোরু ও মোষ থাকে এবং গাড়ি ও গাড়োয়ানও থাকে অনেক। তার এই আইনসঙ্গত পেশার জন্যে বুদ্ধুর উপরে দৃষ্টি দিয়েও পুলিস বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে না।

তার আসল লাভ হয় চোর, গাঁটকাটা ও গুণ্ডা পুষে। এইসব চোর, পকেটমার ও গুণ্ডা কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দিনেরাতে যা হস্তগত করে, সমস্ত এনে দেয় বুদ্ধুর হাতে। তাদের সকলেরই জন্যে এক-একটা নির্দিষ্ট অংশ থাকে। বাকি বা প্রধান অংশ জমা হয় বুদ্ধুর নিজের ভাণ্ডারে।

চোর, পকেটমার ও গুণ্ডাদের মধ্যে যারা মাঝে মাঝে ধরা পড়ে জেলে যায়, তারা খালাস না পাওয়া পর্যন্ত তাদের পোষ্য বা পরিবার প্রতিপালনের ভার নেয় বুদ্ধু স্বয়ং। ফলে তার দলের লোকরা নির্ভয়ে চুরি ও রাহাজানি করে এবং ভারি ভারি পকেট হালকা করে বেড়ায়। জেলকে তারা ভয় করে না। তারা এমন অনায়াসে জেলে যায়, যেন বায়ুপরিবর্তনে যাচ্ছে!

কলকাতার দিকে দিকে এমনি আরও অনেক সর্দার আছে। অনেকের এমনি হোমরা-চোমরা চেহারা যে, বাহির থেকে দেখলে কেউকেটা বলে মনে হয়। পুলিস তাদের স্বরূপ চিনেও আইনের পাকে জড়াতে পারে না সহজে।

তাদের অনেকের বিশেষ বিশেষ চর আছে। তারা এসে নানারকম খবর দিয়ে যায়। কেউ এসে জানায় তাদের প্রধান শত্রুপক্ষের অর্থাৎ পুলিসের ভিতরের কথা। পুলিসের দৃষ্টি কোন আড্ডার উপরে পড়েছে, তারা কবে কোথায় খানাতল্লাস করতে আসবে, চরের মুখে প্রায়ই সে খবর পেয়ে সর্দাররা আগে থাকতে সাবধান হতে পারে।

আর একদল চরের কাজ, কোন বাড়িতে হানা দিলে দামি মাল বা টাকাকড়ি পাওয়া যাবে তার সঠিক খবর আনা। এদের সঙ্গে প্রায়ই গৃহস্থদের বাড়ির ভৃত্য বা অন্য কোনও লোকের যোগ থাকে। কোন পথে, কোন ঘরে, কখন গেলে নিরাপদে চুরি করা চলবে, এই চরেরা সেসব সংগ্রহ করে আনে যথাসময়ে।

সম্প্রতি একজন চর বুদ্ধুর কাছে একটা লোভনীয় সংবাদ বহন করে এনেছে।

চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের লোহার সিন্দুকের গর্ভে আছে একলক্ষ টাকার নোট, পঞ্চাশহাজার টাকার মোহরের থলি, ষাটহাজার টাকার জড়োয়া গহনা। বাড়ির দুই মালিক ভীষণ কৃপণ, বেশি চাকর-বাকর-দ্বারবান প্রভৃতির জাঁকজমক নেই—এত টাকা, অথচ একখানা মোটর পর্যন্ত রাখেনি, ইত্যাদি।

কোন পথ দিয়ে কোন ঘরে গেলে খুব সহজে লোহার সিন্দুকের নিকটস্থ হওয়া যাবে, তা জানতেও বাকি রইল না।

আসছে পরশুদিন চুনিচাঁদ বাড়ির সমস্ত মেয়ে ও ছেলেদের নিয়ে দেওঘরে গমন করবে। বাড়িতে থাকবে খালি মানিকচাঁদ, একজন পাচক, দুজন চাকর ও একজন দ্বারবান।

চুনিচাঁদ দেওঘরে একদিন মাত্র থেকেই কলকাতায় ফিরে আসবে। কাজেই আসছে অমাবস্যার রাত্রেই প্রায় খালিবাড়ির ভিতরে ঢুকে কেল্লা মাৎ করবার বড়োই সুবিধা!

বুদ্ধুর বিরাট দেহ মহা উত্তেজনায় ফুলে আরও বড়ো হয়ে উঠল। লোভেজ্বলন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সে বললে, 'এ যে পয়লা নম্বরের শিকার রে বেটা! জয় মা কালী, বেটীকে জোড়া পাঁঠা বলি দেব!'

—'সর্দার তাহলে রাজি!'

—'খালি রাজি নই রে বেটা, এবারে দলের সাথে হামি বি যাব!'

—'আপনি নিজে!'

—'হাঁ রে, হাঁ! ছিঁচকে চোট্টা পাঠিয়ে কি এত ভারি কাম হয়? এ দাঁও ফসকালে আফসোস করে মরতে হবে যে!'

* * * *

অমাবস্যার রাত গায়ে মা কালীর রং মেখে করছে থমথম।

জনশূন্য পথে বাস করছে খালি হিংস্র অন্ধকার। তার কালিমা এত ঘন যে সন্দেহ হয়, এর মধ্যে তীব্র বিদ্যুৎ জ্বললেও সে দীপ্তি করবে না কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ।

গীর্জার ঘড়ি সেই বুকচাপা কালো স্তব্ধতার মধ্যে আর যেন চুপ করে থাকতে না পেরে হঠাৎ দুইবার চিৎকার করে উঠল—ঢং, ঢং!

একটা গলির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে প্রশান্ত বললে, 'রাত দুটো।'

পিছন থেকে ইনস্পেক্টার বললে, 'দীনুডাকাতটা সময়ের মূল্য বোঝে না। রাত কাবার হতে চলল, এর পরে কাজ সেরে লম্বা দেবার অবসর পাবি না যে!'

হঠাৎ খানিক তফাতে তিন-চারটে কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠল।

প্রশান্ত বললে, 'চুপ! কুকুরগুলো কী দেখে চিৎকার করছে?'

প্রশান্ত তার পুলিসচক্ষু চালিয়ে অন্ধকারের গাঢ়তাকে ছিন্নভিন্ন করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই। না কোনও ছায়া, না কোনও কানাকানি, না কোনও পদশব্দ।

খানিকক্ষণ গেল।

আচম্বিতে দূরে জাগল একখানা দ্রুতগামী মোটরের শব্দ। গাড়িখানা ভয়ানক বেগে কাছে এসেই ছুটে গেল অন্যদিকে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল একটা উচ্চ কণ্ঠস্বর—'বন্ধু প্রশান্ত! হাজির আছ তো? আমি হাজির!'

তাহলে দীনবন্ধু বাক্যরক্ষা করেছে!

ইনস্পেক্টার বললে, 'উঃ, বেটার সাহস দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়! পুলিসকে কেয়ার করে না!'

প্রশান্ত একেবারে বোবা। বুকের ভিতরে তার রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল। এখন ভগবান স্বয়ং কাছে এসে দাঁড়ালেও সে বোধহয় গ্রাহ্যের মধ্যেও আনবে না। সে কান পেতে শুনলে, দীনবন্ধুর মোটরখানার শব্দ কয়েক সেকেন্ড পরেই থেমে গেল। তাহলে মোটরখানা কাছেই দাঁড়িয়েছে!

কয়েক মিনিট কাটল। চারিদিকে আবার সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা।

ইনস্পেক্টার অধীর কণ্ঠে বললে, 'দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ব নাকি?'

নিম্ন অথচ কর্কশ স্বরে প্রশান্ত বললে, 'না। সময় হয়নি।'

ইনস্পেক্টার বললে, 'স্যার, আপনি আজও হালে পানি পাবেন না দেখছি। দীনুবেটা অন্ধকারে চুপিসাড়ে কাজ সেরে এতক্ষণে সরে পড়িপড়ি করছে। চলুন, বেরিয়ে পড়ি!'

প্রশান্ত এবারে প্রায় গর্জন করে বললে, 'না!'

আরও মিনিট-কয় কাটল। গীর্জার ঘড়িতে বাজল আড়াইটের ঘণ্টা।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে তীব্র স্বরে ফুকরে উঠল একটা পুলিসবাঁশি!

প্রশান্তের দেহ হঠাৎ সিধা হয়ে উঠল ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতো। লম্বা এক লাফ মেরে গলির বাইরে এসে সে চিৎকার করে উঠল—'চল সবাই চুনিচাঁদ-মানিকচাঁদের বাড়ির ভিতরে!'

এক মুহূর্তে স্তব্ধতা গেল পালিয়ে! দিকে-দিকে পায়ের জুতোর ছুটোছুটি-শব্দ, বহু কণ্ঠের হই-হই রব, অনেকগুলো টর্চের আলোকে অন্ধকার হয়ে গেল খণ্ড-বিখণ্ড!

একজন লোক দৌড়ে এসে বললে, 'স্যার, চোরেরা ওইদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে!'

—'দীনু তাহলে দল বেঁধে এসেছে?'

—'হ্যাঁ, দশ-বারোজন লোক!'

ইনস্পেক্টার ছুটতে-ছুটতে দমে গিয়ে বললে, 'আজ এখানে তুমুল লড়াই হবে দেখছি!'

প্রশান্ত ছুটতে ছুটতে ভীষণ স্বরে বললে, 'হোক লড়াই। আমি মরব, তবু দীনুকে ছাড়ব না!'..........

পুলিসের কতক লোক বাইরে রইল, কতক বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর মহা হুড়োহুড়ির শব্দ, গোলমাল, রিভলবারের আওয়াজ, আর্তনাদ! রাত্রি যেন শব্দ-হলাহলে জর্জরিত! পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল, জানলার পাল্লাগুলো খুলে গেল! ডাকাত পড়েছে ভেবে মেয়ে-পুরুষের চিৎকার, ভীত শিশুদের কান্না!

তারপর ধীরে ধীরে নানা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির উচ্চতা নেমে এল আবার নিচের পর্দায়।

....

প্রশান্ত দেখলে, দশজন চোর হাতে পরেছে হাতকড়ি এবং তাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছে সকলের উপরে মাথা তুলে, সগর্বে! সে বুদ্ধু।

প্রশান্তের মুখে ফুটল গভীর নিরাশার কাতরতা। এ দলে দীনবন্ধু নেই। সে আবার ফাঁকি দিয়েছে!

ইনস্পেক্টার বললে, 'আরে, এ যে দেখছি আমাদের বুদ্ধু!'

বুদ্ধু বুক ফুলিয়ে বললে, 'হাঁ, হাঁ, হামি বুদ্ধু! পুলিসকে ডর করে না বুদ্ধু!'

ইনস্পেক্টার বললে, 'আমি তো জানতুম তুমি একটা মস্ত দলের সর্দার! তাহলে এখন দেখছি তুমি সর্দারি ছেড়ে দীনুর তাঁবেদারি করছ?'

বুদ্ধু ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'হামি, করব তাঁবেদারি! কে তোমাদের দীনু?'

—'আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা হচ্ছে! দীনুডাকাতকে তুমি চেনো না?'

—'ও হো হো, সেই বেটা স্বদেশি ডাকু? তার খবর হামরা রাখি না।'

—'রাখো না? আজ সে তোমাদের সঙ্গে করে এখানে আনেনি?'

—'না, না, হামরা দীনু-ফিনুর তোয়াক্কা রাখি না। হামরা এসেছি নিজেদের ধান্দায়। নসীব মন্দ, তাই ধরা পড়ে গেলুম!'

ইনস্পেক্টার অবাক হয়ে প্রশান্তের মুখের পানে চাইলে।

কিন্তু প্রশান্তের বিশ্বাস হল না যে, বুদ্ধু দীনুর দলের লোক নয়। ঠিক একদিনে এক সময়ে, একই বাড়িতে বুদ্ধু ও দীনুর আবির্ভাব, অথচ দুজনের মধ্যে কোনোই সম্পর্ক নেই, এও কি সম্ভব? প্রশান্ত বুদ্ধুকে জেরা করতে উদ্যত হল।

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির অপর প্রান্ত থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল—'সর্বস্ব নিয়ে গেল—সর্বস্ব নিয়ে গেল—সর্বস্বান্ত করে গেল!'

ইনস্পেক্টার চমকে উঠে বললে, 'ও আবার কে চ্যাঁচায় বাবা?'

একজন চাকর বললে, 'এ যে ছোটোবাবুর গলা!'

প্রশান্ত সচকিত স্বরে বললে, 'কোথায় তোদের ছোটোবাবুর ঘর?'

—'হুজুর, অন্দর মহলে!'

—'শীগগির আমাদের সেখানে নিয়ে চল!'

—'আসুন হুজুর, এই পথে।'

জনকয়েক পাহারাওয়ালার জিম্মায় আসামিদের রেখে বাকি সকলে প্রশান্তের পিছনে-পিছনে ছুটল।

ইনস্পেক্টার বললে, 'এ যে বাবা, হেঁয়ালি-নাট্য! যবনিকা পড়বে কখন?'

মস্ত বাড়ি। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গিয়ে দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে একেবারে তেতলায় উঠতে সময় লাগল।

তারপর সকলে একটা মাঝারিআকারের ঘরে ঢুকে দেখলে, মেঝের উপরে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এক মাঝবয়সী পুরুষের দেহ।

পুলিস দেখেই সে চিৎকার করে উঠল—'এখনও দৌড়ে যান, এখনও হয়তো তাকে ধরতে পারবেন!'

প্রশান্ত বললে, 'কাকে?'

—'চোর, চোর, চোরকে!'

—'এ ঘরে চোর এসেছিল?'

—'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ! আমার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে! আমার মুখ পর্যন্ত বেঁধে রেখে গিয়েছিল, কোনোরকমে মুখের বাঁধন খুলে ফেলেছি, তাই কথা কইতে পারছি! এখনও যান মশাই, এখনও গিয়ে তাকে ধরে ফেলুন!'

—'কজন চোর এসেছিল?'

—'একজন—হাতে তার রিভলবার!'

—'সে কতক্ষণ গিয়েছে?'

—'ছ-সাত মিনিট আগে।'

প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'তাহলে তাকে ধরবার চেষ্টা করা মিছে! এ চোর কে তা বুঝেছি। সে মোটরে চড়ে পালিয়েছে। এখন বলুন দেখি, আপনার কি চুরি গিয়েছে?'

—'সর্বস্ব মশাই, সর্বস্ব! ওই লোহার সিন্দুকে আমাদের তিনলাখ টাকার সম্পত্তি ছিল! সব গিয়েছে গো, সব গিয়েছে! ওগো আমার কি হবে গো!' ....'সা রে গা মা'-র সব পর্দা ছুঁয়ে মানিকচাঁদ এইবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করলে।

প্রশান্ত বুঝলে মানিকচাঁদকে এখন আর কোনও প্রশ্ন করা মিছে—টাকার শোকে সে পাগল হয়ে গিয়েছে!

প্রশান্ত লোহার সিন্দুকের সমুখে গিয়ে দাঁড়াল। সিন্দুকের দরজা খোলা। তার ভিতরে এক বাণ্ডিল কোম্পানীর কাগজ ছাড়া আর কোনও মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ তার কানে গেল, মানিকচাঁদ কাঁদতে কাঁদতে বলছে—'এ আবার কোন দেশি চোর গো! সর্বস্ব লুট করে, মালিককে খুন করব বলে রিভলবার তোলে, তার সর্বাঙ্গ দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলে—'মশাইয়ের লাগছে বলে আমি দুঃখিত'! আবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে হাসতে হাসতে চিঠি লিখে—'

—'কি বললেন? সে চিঠি লিখেছে?' —প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে সচমকে।

—'হ্যাঁ গো, চিঠি লিখেছে—নিজের সোনাবাঁধানো ফাউন্টেন পেন দিয়ে চিঠি লিখে রেখে গেছে!'

—'কোথায় সেই চিঠি?'

—'ওই বিছানার উপরে দেখুন! ....খালি তো চিঠি লিখলে না—আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল গো! আমি এখন কি করব গো, দাদা এলে কি বলব গো—' কান্না ও কথা সমান চলল।

খাটের কাছে গিয়ে প্রশান্ত দেখলে, বিছানার উপরে পড়ে আছে মস্ত একখানা নীল খাম। প্রশান্তের বুকটা ধুপ করে উঠল—খাম দেখেই বুঝলে, এ কার চিঠি!

চিঠিখানা এই ঃ

'গর্দভরাজ শ্রীমান প্রশান্ত মজুমদার

সমীপেষু

তোমাকে আগে 'বন্ধুবর' বলে ডেকে নিজেই আমি নিজেকে অপমান করেছি। তোমার মতন নির্বোধচূড়ামণি আমার বন্ধু হবার যোগ্য নয়। তোমার মাথায় একমাত্র পদার্থ আছে আর তার নাম হচ্ছে 'গোবর।' একে গাধা, তায় গোবরভরা মাথা। হয়তো তুমি গাধাও নও, গোরুও নও। তাদেরও চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব—যার নাম নেই অভিধানে।

মূর্খ! যখন তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে জানালুম যে, আমি এখানে নির্দিষ্ট তারিখে আবির্ভূত হব, তখনই তোমার বোঝা উচিত ছিল, পুলিসকে ফাঁকি দেবার জন্যে আমি এক নূতন-রকম ফাঁদ পাতব।

চোর কখনও পুলিসকে জানিয়ে চুরি করতে আসে না। সেটা অস্বাভাবিক। কারণ চুরি হচ্ছে লুকোচুরির ব্যাপার। যখনই তোমাকে আমার ইচ্ছা জানিয়েছি, তখনই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমি তোমাদের জন্যে ফাঁদ তৈরি করছি। আমি আজ চুরি করেছি তোমাদের সাহায্যেই।

বুদ্ধু আজ যাতে এখানে নির্দিষ্ট সময়ে চুরি করতে আসে, সে ব্যবস্থা করেছি আমিই। আমারই চর গিয়ে তাকে এখানে ভাগ্যপরীক্ষা করবার জন্যে প্রলুব্ধ করেছিল।

আমি ঠিক জানতুম, বুদ্ধুর দল যখন এখানে আবির্ভূত হবে, তখন আঁধার-রাতে তাদের আমারই দল ভেবে সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমরা আক্রমণ করবে। আর সেই ফাঁকে আমিও ধীরে-সুস্থে নিশ্চিন্ত হয়ে করব নিজের কার্যোদ্ধার।

একদিন তুমি আমাকে বিপাকে ফেলেছিলে। আমি তামাক খাই না। তবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে আমাকে জলের তলায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল—তোমার জন্যেই। আজ তার প্রতিশোধ নিলুম।

তবে তোমার একটা উপকার করে গেলুম। অমি সমাজের শত্রু নই—আমি হচ্ছি অত্যাচারীর শত্রু। কিন্তু আজ আমার কৃপায় তোমরা বুদ্ধু নামে যে জীবটিকে ধরতে পারলে, সে হচ্ছে দেশ ও দশের শত্রু। তাকে তোমরা এতদিন বহু চেষ্টা করেও ধরতে পারোনি। আমি আজ তাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করে গেলুম। ঢাকের বদলে নরুণ পেলে বলে আমাকে ধন্যবাদও দিও। ইতি—

দীনবন্ধু'

পত্র পাঠ করবার পর প্রশান্তের মুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল।

সে এগিয়ে এসে মানিকচাঁদকে বললে, 'দেখছি আপনি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। এখন বলুন দেখি, যে চোরটা এসেছিল তাকে দেখতে কেমন?'

—'মাঝবয়সী! মাথায় সাদা পাকা লম্বা চুল। চোখে নীল রঙের চশমা। গোঁফ আছে, আর আছে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। গালে একটা বড়ো আঁচিল। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় বোধহয় সাড়ে ছ-ফুট উঁচু। বেজায় চওড়া বুক। আর তার হাত-দুখানা যে লোহার মতন শক্ত, সেটা আমি টের পেয়েছি যখন সে আমাকে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধছিল!'

প্রশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানসপটে এই বর্ণনার অনুযায়ী একখানি ছবি এঁকে নিলে। সে নিজে কোনোদিন দীনবন্ধুর চেহারা দেখবার সুযোগ পায়নি।

ইনস্পেক্টার কৌতূহলী স্বরে বললে, 'চিঠিখানা কি? আমাকে যে দেখালেন না?'

প্রশান্ত শুষ্ক স্বরে বললে, 'ও চিঠি আমাকে লেখা। আপনার দেখবার দরকার নেই।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীনবন্ধু কলাবিদ

দুদিন পরেই শহরের প্রত্যেক খবরের কাগজে সব কথা প্রকাশিত হয়ে গেল। সব কথা মানে, প্রশান্তের বাড়িতে দীনবন্ধুর আবির্ভাব থেকে চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের বাড়ির চুরি পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস সবিস্তারে।

দেশের লোক বিস্ময়স্তম্ভিত! চোরের এমন দুঃসাহস এবং চুরির এমন আশ্চর্য কৌশল নিয়ে পথে-ঘাটে পাড়ায়-পাড়ায় জোর আলোচনা চলতে লাগল। যেখানে তিন-চার-পাঁচ জন লোক জমে, সেইখানেই দীনবন্ধুর নাম ও কীর্তিকাহিনী!

একখানা কাগজ লিখলে ঃ 'আমরা চৌর্যবৃত্তির সমর্থন করছি না। নিজের জন্যে হোক আর পরের জন্যেই হোক, চুরি সব সময়েই নিন্দনীয়।

কিন্তু দীনবন্ধু যে মস্ত প্রতিভার অধিকারী, সে সত্য আর অস্বীকার করা চলে না। প্রতিভার প্রধান লক্ষণ, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। দীনবন্ধুর তা আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে পুলিসকে ঠকাবার জন্যে যেসব নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করছে, তা যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনি অভাবিত।

চোর ডাকাত ধরবার জন্যে পুলিস শিক্ষিত হয়েছে পুরাতন পদ্ধতিতে। কিন্তু দীনবন্ধুকে ধরতে গেলে সে পদ্ধতি হবে অচল। কারণ অন্যান্য চোরের মতন সে চুরির সময়ে সেকেলে কৌশল অবলম্বন করে না। বাঙালি গোয়েন্দারা যতদিন না এই সত্য উপলব্ধি করতে পারছে, ততদিন দীনবন্ধু ধরা পড়বে না।

হিন্দুদের চৌষট্টি কলা—চুরিকেও আর্টের একটি অঙ্গ বলে স্বীকার করেছে। সুতরাং দীনবন্ধুকেও আমরা একজন উঁচুদরের কলাবিদ বলে গ্রহণ করতে পারি।'

প্রশান্তের আর কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই। সে যেখানেই যায়, সকলে তার কাছ থেকে শুনতে চায় দীনবন্ধুর কথা। শুধু শুনতেই চায় না, দীনবন্ধুকে তারিফ এবং তাকে ঠাট্টাও করতে চায়! শেষটা এমন হয়ে উঠল যে, দীনবন্ধুর নাম করলেই প্রশান্তের মনে হয়, কে যেন বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে!

পুলিসের বড়োসাহেব অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার তাকে ডেকে পাঠালেন। প্রশান্তের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

বড়োসাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তোমার জন্যে পুলিসের কি-রকম অখ্যাতি হচ্ছে বুঝতে পারছ?'

—'স্যার, আমি যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তবু যদি সফল না হই, সেটা আমার দুর্ভাগ্য।'

—'ভুল চেষ্টা সফল হয় না।'

—'আমি কি ভুল করেছি স্যার?'

—'নিশ্চয়! চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের বাড়িতে দীনুডাকাত যে চুরি করতে যাবে, তুমি আগেই সেই খবর পেয়েও আমাকে জানাওনি। এই হচ্ছে তোমার প্রথম ভুল।'

প্রশান্ত নিরুত্তর হয়ে মাথা হেঁট করে রইল।

—'তোমার দ্বিতীয় ভুল, চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের বাড়ির চারিদিকে তুমি পাহারা বসাওনি কেন? বাড়ি ঘেরাও করলে দীনুডাকাত তো পালাতে পারত না!'

—'স্যার, আমরা সকলেই জানি, দীনু একলাই চুরি করে। কাজেই আমরা খুব বেশি লোক নিয়ে যাইনি। বুদ্ধুর দলকে আমরা ভেবেছিলুম দীনুর দল—বুঝে দেখুন, তাই ভাবাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিনা! অতবড়ো একটা দলের জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলুম না, আর দু-চারজন লোক নিয়েও আমরা তাদের ঠেকাতে পারতুম না। কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে একেবারে সব লোক নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে হয়েছিল।'

বড়োসাহেব তার যুক্তি শুনে খুশি হলেন বলে মনে হল না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ভাবছি দীনুর মামলার ভার অন্য লোকের হাতে দেওয়া উচিত কিনা!'

প্রশান্তের মাথায় হল যেন বজ্রাঘাত! খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। তারপর ছলছল চোখে প্রায় কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'স্যার, সে অপমান আমি সহ্য করতে পারব না—আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে!'

তার অবস্থা দেখে বড়োসাহেবের মনে দয়ার সঞ্চার হল। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপাতত মামলার ভার তোমার হাতেই রইল। ....তুমি আজকের কাগজ দেখেছ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'রোজ সকালে খবরের কাগজ পোড়ো। দীনু লোকটা দেখছি নানা ব্যাপারেই কাগজের সাহায্য নেয়। কাগজ পড়লে তার গতিবিধির অনেক খবর পাওয়া যায়।'

এ সত্য প্রশান্তও জানে। কিন্তু সংবাদপত্রে রোজ বেরোয় তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা বা ব্যঙ্গচিত্র। সেসব পড়লে বা দেখলে মাথা এমন বিগড়ে যায় যে, সারাদিন আর কাজকর্মে মন বসে না। তাই সে খবরের কাগজগুলোকে বয়কট করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নিজের এই হাস্যকর দুর্বলতার কথা তো বড়োসাহেবের কাছে প্রকাশ করা যায় না, অতএব উপদেশ হজম করতে হল নীরবে।

বড়োসাহেব একখানা খবরের কাগজ বার করে তার এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ।'

বিজ্ঞাপনটা হচ্ছে এই :

'দীনবন্ধুর বুদ্ধি ও শক্তি দেখে প্রশান্ত মজুমদার চমৎকৃত হয়েছেন।

দীনবন্ধু তাঁর শত্রু হলেও উদার প্রশান্ত মজুমদার তাকে অভিনন্দন দিতে চান।

দীনবন্ধু ও তার বন্ধুবান্ধবকে প্রশান্ত মজুমদার নিজের বাড়িতে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেছেন।

ফলাফল শীঘ্রই সর্বসাধারণকে জানানো হবে।'

বিষম রাগে মুখ রাঙা করে প্রশান্ত নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগল।

বড়োসাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'রাগ করা মিছে, প্রশান্ত! খবরটা ঠাট্টা বলেই ধরে নাও।'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না স্যার, ঠাট্টা নয়!'

—'তবে?'

—'আমার বিশ্বাস, দীনুর নিশ্চয়ই কোনও কুমতলব আছে।'

—'এ বিশ্বাসের কারণ?'

—'দীনু অকারণে কিছু করে না। আমার বিরুদ্ধে সে নতুন কোনও ষড়যন্ত্রের আয়োজন করছে।'

—'তাতে তার লাভ?'

—'জনসমাজে আমাকে হাস্যাস্পদ করা।'

হঠাৎ ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে কথা শুনতে শুনতে বড়োসাহেবের মুখ হয়ে উঠল অতিশয় গম্ভীর।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে তিনি বললেন, 'প্রশান্ত, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কলকাতা ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত হও।'

—'কোথায় যাব স্যার?'

—'মোহনপুরে। সেখানে যাবার শেষ ট্রেন কলকাতা ছাড়বে আর বিশ মিনিট পরে। ....আমাদের এক চর এইমাত্র খবর দিলে, দীনুডাকাত আজ বৈকালে মোহনপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত বাসিন্দাদের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র আর অর্থ বিতরণ করবে!'

—'আমায় একলা যেতে হবে?'

—'নিশ্চয়ই নয়! যে-কয়জন লোক দরকার মনে কর, নিয়ে যাও। কিন্তু ভুলো না, এক মিনিটও নষ্ট করবার সময় নেই।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাংস কেমন লাগল?

বৈকালে নবতারা বসে বসে কুটনো কুটছে, চাকর এসে বললে,—'একটা পাহারাওলা এই চিঠিখানা আমাকে দিয়ে গেল।'

নবতারা দেখলে তারই চিঠি। প্রশান্তের লেখা চিঠিখানা পড়তে লাগল :

'নবতারা,

কাজের ভিড়ে গতকল্য তোমাকে একটা দরকারি কথা জানাতে পারিনি।

আজকে আমার জন-দশেক বন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছিলুম। আমাকে এখনই হঠাৎ মোহনপুরে চলে যেতে হচ্ছে, বন্ধুদের সে খবরটা জানিয়ে যাবার সময় পেলুম না। সন্ধ্যার সময়ে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে আসবেন। তুমি তাঁদের জন্যে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কোরো।

যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উপেনবাবু আছেন। তাঁর নাম তুমি আমার মুখে শুনেছ বোধহয়। তিনি আমার দেশের লোক, বয়সেও প্রাচীন। তাঁর সামনে তোমার লজ্জা করবার দরকার নেই। আমার অনুপস্থিতির কারণ তাঁকে বোলো। আমার অবর্তমানে তিনিই যেন বন্ধুদের ভার নেন।

আমি রাত আটটার ট্রেনে কলকাতায় ফিরব। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

আর এক কথা। দীনুডাকাত শাসিয়েছে, সে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণের খাওয়া খাবে। দীনু মহা ধূর্ত। এই ফাঁকে সেও যেন আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে তোমাকে ভোগা দিয়ে না যায়। বাড়িতে পাহারা দেবার জন্যে সন্ধ্যার সময় দুজন পাহারাওয়ালারও ব্যবস্থা করে গেলুম। ইতি— প্রশান্ত।'

চিঠি পড়ে নবতারা ব্যস্ত স্বরে ডাকলে, 'ও বেহারী, শীগগির গোপালের মাকে ডাক!'

বেহারী ও গোপালের মা দাস ও দাসী।

বেহারী বললে, 'কি হয়েছে মা? চিঠিতে কি লেখা আছে?'

—'লেখা আছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। বাবুর আজ ভোজ দেবার শখ হয়েছে, অথচ নিজে হাজির থাকবেন না!'

—'ভোজ? কিসের ভোজ?'

—'ভূত ভোজন রে, ভূত ভোজন! বাড়িতে আজ দশ ভূতের পাত পাততে হবে! ডাক, ডাক, গোপালের মাকে ডাক, বেশি করে বাটনা বাটুক, দুটো উনুনে আগুন দিক! তুই বাজারে ছোট! বেলা সাড়ে-চারটে বেজেছে, সন্ধ্যে আর কার নাম!'

নবতারা দুদ্দুড় করে কখনও উপরে ওঠে, কখনও নিচে নামে, কখনও ঝি-চাকরকে বকে, কখনও ছেলে-মেয়ের পিঠে চড়-চাপড় বসিয়ে দেয়, কখনও রান্নাঘরে ঢুকে তরকারির জল মরে গেল কিনা দেখে আসে এবং কখনও প্রশান্তের উদ্দেশে এমন সব মতপ্রকাশ করে যা স্বামীদেবতার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক নয়। সে একাই একশো হয়ে বাধিয়ে তুললে যেন একটা রসাতলকাণ্ড!

সন্ধ্যার মুখে সর্বাগ্রে এলেন উপেনবাবু। নবতারা আত্মপ্রকাশের আগে দরজার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে নিলে, লোকটিকে দেখে লজ্জা করা উচিত কিনা!

বুড়ো-সুড়ো মানুষ, বয়স বোধহয় ষাট পার হয়েছে। একমাথা পাকা চুল, গোঁপদাড়িও সাদা, চোখ-মুখ শিশুর মতন সরল হাসিখুসিতে ভরা।

তখন সামনে বেরিয়ে নমস্কার করে নবতারা বললে, 'বাবা, বড়ো মুশকিলে পড়েছি!'

—'কেন বউমা?'

—'লোক নেমন্তন্ন করে উনি চলে গিয়েছেন বিদেশে। এই খানিক আগে খবর পেয়েছি। এখন আমি একলা কেমন করে সব দিক সামলাই বলুন দেখি?'

—'প্রশান্ত ওই-রকমই আলাভোলা মানুষ। সে কি আজ আর আসবে না?'

—'আসবেন, রাত আটটার পরে। এতক্ষণ ওঁর বন্ধুদের দেখাশোনা করতে হবে আপনাকেই।'

—'দেখব বইকি বউমা, সব দেখব! প্রশান্ত তো আমার পর নয়! তা রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে তো?'

—'ব্যবস্থা তো হয়েছে, কিন্তু রাঁধতে হবে আমাকেই।'

—'তোমাকে! কেন, বামুন আসেনি নাকি?'

—'উনি বামুন রাখতে চান না। বলেন, যার তার হাতে খেতে ঘেন্না করে।'

—'তাই নাকি? তাহলে এত লোককে নেমন্তন্ন করা প্রশান্তের উচিত হয় নি।'

উপেনবাবু সহানুভূতি প্রকাশ করতেই নবতারার বাঁধ ভেঙে গেল। গলার আওয়াজ যথাসম্ভব করুণ করে সে বললে, 'বলুন তো বাবা, কত বড়ো অন্যায়! নিত্যি-নিত্যি হাতা-খুন্তি নাড়তে-নাড়তেই জীবনটা বয়ে গেল। তার ওপর মাঝে মাঝে এইসব অত্যাচার! কত আর সয়?'

—'তা কিছু ভেবোনা বউমা, আমি যখন এসে পড়েছি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন বল দেখি মা, রান্নার কি আয়োজন হয়েছে?'

—'বেশি কিছু করবার নেই। লুচি, বেগুনভাজা, আলুর দম, মাছের কালিয়া, মাংস আর একটা চাটনি হলেই চলবে তো?'

—'খুব চলবে মা, খুব চলবে।'

—'বাজার থেকে দই, রাবড়ি আর কিছু খাবারও আনিয়ে নেব।'

—'ব্যস, এ তো রাজভোগ! এখন শোনো বউমা! ময়দা ঠাসা, লুচি ব্যালা আর মাংস রান্নার ভার নিচ্ছি আমি। দুহাতে কাজ এগুবে তাড়াতাড়ি।'

—'সে কি বাবা, আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারব না!'

একগাল মিষ্টি হেসে উপেনবাবু বললেন, 'পাগলি মেয়ে! এ আবার কষ্ট কি? রাঁধতে আমি ভালোবাসি, তুমি যদি আমাকে পর ভাবো তাহলে আমি দুঃখিত হব। প্রশান্ত যে আমার ছোটো ভাইয়ের সমান।'

উপেনবাবু তখনই উপরের জামাটা খুলে ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে কাজে মেতে গেলেন বিপুল উৎসাহে। কাজ করতে করতে তাঁর মুখ চলতে লাগল অশ্রান্ত ভাবে। প্রশান্তের ছেলেবেলার গল্প, নিজের অবিবাহিত জীবনের গল্প এবং আরও নানাজাতীয় গল্পের দ্বারা তিনি আসর এমন জমিয়ে তুললেন যে, নবতারার মনে হল তিনি যেন তার কতদিনের আপনার লোক।

আটটার আগেই বন্ধুরা সব একে একে এসে হাজির হলেন। নবতারা বাড়ির ভিতর থেকেই শুনতে পেলে, বৈঠকখানায় গিয়ে উপেনবাবু সকলকে বলছেন; 'প্রশান্ত একটু পরেই ফিরে আসবে। ততক্ষণ তোমরা নিজেরাই গল্পগুজব কর, তাস-দাবা-পাশা খ্যালো, পান-তামাক খাও।'

দুজন পাহারাওয়ালাও বৈঠকখানার দরজার কাছে বসেছিল।

বাড়ির ভিতরে এসে উপেনবাবু বললেন, 'বাড়িতে আবার লালপাগড়ি কেন বৌমা?'

—'দীনুডাকাতের ভয়ে। সে নাকি জোর করে আমাদের বাড়িতে খেতে চায়!'

—'জোর করে খেতে চায় মানে? এটা কি তার বাবার বাড়ি?'

—'তার বাবার বাড়িতে সে কি করে জানিনা বাবা, কিন্তু পরের বাড়িতে হানা দেওয়াই যে তার পেশা!'

—'গোটা বাংলাদেশটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে! যেখানে যাই সেখানেই শুনি দীনুর সুখ্যাতি! একটা চোরকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ভালো লাগে না!'

—'তা বাবা, দীনু বোধহয় আসলে মন্দ লোক নয়। দাতাকর্ণের মতন তার প্রাণ। তার দয়ায় এই অভাবের দিনে হাজার হাজার দুঃখীর অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর হচ্ছে।'

—'যার ধন তার ধন নয়, ন্যাপা মারে দই! কার টাকা, আর দান করে নাম কিনছে কে! পরের টাকায় অনেকেই পোদ্দারি করতে পারে!'

—'তা যাইই বলুন বাবা, দীনু ধরা পড়লে আমি খুশি হব না।'

কথাটা বোধকরি উপেনবাবুর মনের মতন হল না। তিনি উত্তর না দিয়ে বেলুন ও চাকি নিয়ে লুচি বেলতে বসলেন।

ঘড়িতে রাত সাড়ে নয়টা বাজল। রান্নাবান্নার কাজ চুকল।

উপেনবাবু বললেন, 'কই বউমা, প্রশান্ত তো এখনও এলো না।'

—'দেখছেন তো বাবা, পুলিসের বউ হওয়ার এই সুখ! ওঁর কি আক্কেল বলে পদার্থ আছে? হাড় কালী হয়ে গেল!'

—'খাবার-দাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এই বেলা সকলকে খাইয়ে দি—কি বলো?'

—'সেই কথাই ভালো। ওঁর জন্যে বসে থাকলে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল সাড়ে দশটায়। বন্ধুরা প্রশান্তের জন্যে আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে একে একে বিদায় নিলে।..........

প্রশান্ত ফিরে এল রাত সাড়ে বারোটায়। তার জামাকাপড় ধূলিধূসরিত, মুখে-চোখে শ্রান্তির ভাব।

নবতারা তার জন্যে তখনও জেগে বসেছিল। তাকে দেখেই বলে উঠল, 'আমার মতন দাসী পেয়েছিলে বলে এজন্মে বেঁচে গেলে। প্রভু, তোমার পায়ে গড় করি!'

সারাদিন গাধার খাটুনির পর ঘরে ফিরে এই অভাবিত অভ্যর্থনায় ভড়কে গেল প্রশান্ত। কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

—'হ্যাঁগা, তোমার কবে বুদ্ধি হবে? নিজের সংসারের জ্বালায় নিজেই জ্বলেপুড়ে মরি, তার ওপরে আবার উটকো আপদ!'

—'নবতারা, ভূমিকা রাখো। আসল কথা বলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'সব জেনেশুনে আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে? তুমি জানো না কিছু? ভাগ্যিস উপেনবাবু ছিলেন—'

বাধা দিয়ে প্রশান্ত বললে, 'উপেনবাবু? কে উপেনবাবু!'

—'উপেনবাবু গো, উপেনবাবু! তোমার দেশের লোক উপেনবাবু!'

—'উপেন বলে কোনও লোক আমাদের দেশে জন্মায়নি।'

ব্যঙ্গভরে একখানা কাগজ বার করে নবতারা বললে, 'এইবারে বল, এ চিঠিখানাও তুমি লেখোনি!'

পত্রখানা পড়তে পড়তে প্রশান্তের চোখ ক্রমেই বেশি বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। পড়া সাঙ্গ করে মাথায় হাত দিয়ে সে ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে ক্ষীণস্বরে বললে, 'এক গেলাস জল গিন্নি, এক গেলাস জল!'

প্রশান্তের অবস্থা দেখে নবতারা ভাবলে, তার স্বামী বোধহয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি জল এনে দিলে।

জল-পান করে প্রশান্ত বললে, 'তাহলে তারা এসেছিল?'

—'শুধু এসেছে? পেট ভরে খেয়ে গিয়েছে। বাবা, তোমার এক একটি বন্ধুর পেট এক একটি ধামার মতো। তা কাণায়-কাণায় ভর্তি করা চারটিখানিক কথা নয়।'

বেদনাবিকৃত মুখে ক্লিষ্ট কণ্ঠে প্রশান্ত বললে, 'থামো নবতারা, থামো। তোমার মুখে যত শুনছি, আমার বুক তত ধড়ফড় করছে। আপাতত আর কিছু শোনবার ইচ্ছে নেই।'

—'তোমার কি হল বল তো?'

—'যা হয়েছে, তার নাম নেই। শোনো। এ চিঠি আমি লিখিনি। এখানা জাল।'

—'জাল? তাহলে যারা এসেছিল—'

—'তারা হচ্ছে দীনুডাকাত আর তার সাঙ্গপাঙ্গ।'

নবতারা চিৎকার করে উঠে প্রশান্তের পায়ের কাছে বসে পড়ল।

হঠাৎ প্রশান্তের চোখ গেল টেবিলের দিকে। আবার সেখানে পড়ে আছে একখানা নীল রঙের বড়ো খাম!

কম্পিত হস্তে চিঠি বার করে প্রশান্ত পড়লে ঃ

'শ্রীমান প্রশান্ত মজুমদার

সমীপেষু

ভায়া,

নবতারাঠাকুরাণীর করকমল থেকে যে পত্র তুমি পেয়েছ, ওখানি আমার বিশ্রী হস্তে জন্মগ্রহণ করেনি। ওখানির ভাষা আমার, কিন্তু হস্তাক্ষরের জন্যে বাহাদুরির দাবি করতে পারে আমার এক জালিয়াত বন্ধু।

মোহনপুরে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ বিতরিত হয়েছে আমার নামে, চুনিচাঁদ মানিকচাঁদের অনিচ্ছাকৃত দানের ফলে। কিন্তু ওখানে যে আমি উপস্থিত থাকব, পুলিসের কাছে এই মিথ্যা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলুম আমিই। জানতুম, রাহু কখনও চাঁদকে গ্রাস করবার লোভ ছাড়তে পারবে না।

মোহনপুর থেকে কলকাতায় ফেরবার ট্রেন আছে একখানি মাত্র। তুমি যে রাত বারোটার আগে কলকাতায় ফিরতে পারবে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম।

আজ দুজন জাল পাহারাওয়ালা তোমার বাড়িতে এসেছিল নবতারার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করবার জন্যে। তাদের সন্ধান পেলে গ্রেপ্তার কোরো, আমার আপত্তি নেই।

তোমাকে ধন্যবাদ—মোহনপুর যাত্রার জন্যে। নইলে তোমার বাড়িতে না-নিমন্ত্রণে স্বয়মাহূত অতিথি হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতুম না।

নবতারাঠাকুরাণী হচ্ছেন স্ত্রীরত্ন। দীনুডাকাত সম্বন্ধে শ্রীমতীর কি উচ্চ ধারণা! তাঁর শ্রীহস্তের আলুর দম এবং কালিয়া কি সুমধুর! তাঁর শ্রীমুখের সদালাপ কি চিত্তাকর্ষক!

আমার রন্ধিত মাংসের কোর্মার অবশিষ্ট ভাগ তোমার জন্যে রেখে গেলুম, কৃপাপরবশ হয়ে।

যদি ভালো লাগে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাকে জানিও, আর একদিন স্বহস্তে রেঁধে তোমাকে খাইয়ে আসব। অলমতিবিস্তরেণ।

'উপেনবাবু' বা 'দীনবন্ধু'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অদৃশ্য মানুষ

—'বুরুস! বুরুস!'

বৈঠকখানা থেকে অরুণ চেঁচিয়ে বললে, 'শ্রীধর, মুচিটাকে ডাকো তো!'

শ্রীধর মুচি ডেকে আনলে।

অরুণ বললে, 'ওরে, এই জুতোজোড়ার তলায় হাফসুল বসিয়ে দিতে কত নিবি?'

জুতো পরীক্ষা করে দেখে মুচি বললে, 'এক টাকা।'

—'এক টাকা! বলিস কিরে?'

—'চামড়ার দাম ভারি চড়েছে হুজুর!'

—'যা, যা, বারোআনায় হয় তো করে দিয়ে যা।'

মুচি নারাজ হয়ে বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। বললে, 'এখনও বউনি হয়নি, জুতো দিন।'

বৈঠকখানার দরজার সামনে সে জুতো নিয়ে কাজে নিযুক্ত হল।

এমন সময়ে প্রশান্তের প্রবেশ।

অরুণ বললে, 'কি ব্যাপার! আবার দীনুডাকাত আমার বাড়িতে এসে লুকোয় নি তো?'

প্রশান্ত একখানা চেয়ারের উপরে দেহভার অর্পণ করে বললে, 'আজ এসেছি আপনার খোঁজে।'

—'আমি কোনও অপরাধ করিনি তো?'

—'আপনি কোনও অপরাধ করেছেন কিনা জানি না, তবে আপনার অপরাধের সরাসরি প্রমাণ আমার হাতে নেই বটে।'

—'কথাটা একটু বেসুরো হল না কি?'

—'মশাই, আমরা হচ্ছি পুলিস, সুর-বেসুরের হেরফের বুঝি না।'

—'বেশ, তবে বেসুরেই কথা বলুন।'

তীক্ষ্ণনেত্রে অরুণের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে, 'বরুণ বলে কারুকে আপনি চেনেন?'

অরুণ ভুরু কুঁচকে সচকিত স্বরে বললে, 'বরুণ?'

—'হ্যাঁ। বরুণকে আপনি চেনেন না?'

—'চিনি।'

—'তার সঙ্গে কবে থেকে আপনার আলাপ?'

—'ছেলেবেলা থেকে।'

—'এক গ্রামে আপনাদের জন্ম?'

—'হ্যাঁ।'

—'এম-এ পর্যন্ত আপনারা একসঙ্গে পড়েছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'বরুণ আপনার পরম বন্ধু?'

—'হ্যাঁ।'

—'তারপর?'

—'বরুণ বহুদিন নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

—'কথাটা ঠিক হল না।'

—'কেন?'

—'আপনি জানেন, বরুণ এখন নিরুদ্দেশ নয়।'

—'তবে?'

—'সে আবার ফিরে এসেছে!'

—'তার কথা আর কি জানেন?'

—'বরুণের নতুন নাম দীনবন্ধু।'

—'এত খবর যখন রাখেন, আমাকে প্রশ্ন করে মুখ ব্যথা করছেন কেন?'

—'দেখছি আপনি সত্য অস্বীকার করেন কিনা?'

—'কি ভয়ে অস্বীকার করব?'

—'পুলিসের ভয়ে।'

—'পুলিসকে ভয় করবে অপরাধীরা। আমি অপরাধী নই।'

—'কিন্তু দীনুডাকাত আপনার বন্ধু।'

—'দীনু চুরি করলে পুলিস কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে?'

—'পারে। সহচর বলে।'

—'না, পারে না। আমি বরুণের বন্ধু, দীনুডাকাতের সহচর নই।'

—'দীনু এ বাড়িতে লুকিয়ে থেকে পুলিসকে ফাঁকি দেয়।'

—'হ্যাঁ, আমার অজান্তে।'

—'তার প্রমাণ কি?'

—'আমার অজান্তে আমার বাড়িতে হয়তো অনেক বিছে সাপ লুকিয়ে আছে। তারা কেউ আপনাকে কামড়ালে কি আমি দায়ি হব?'

—'অরুণবাবু, উপমা দেবেন না, উপমায় কোনও কিছু প্রমাণিত হয় না।'

—'প্রশান্তবাবু, অনুমানও প্রমাণ নয়, অনুমান আদালতে টেকে না।'

—'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনি আমার কাছে কিছুই স্বীকার করবেন না?'

—'স্বীকার! আমি কি আসামি, যে অপরাধ স্বীকার করব?'

—'না, এখনও আপনি আসামি নন। কিন্তু হতে কতক্ষণ?'

—'প্রশান্তবাবু, বারবার আমাকে ভয় দেখাবেন না। ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবেন না।'

যেন কেল্লা ফতে করেছেন মুখে এমনই ভাব ফুটিয়ে প্রশান্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, 'এতক্ষণে আপনি স্বীকার করলেন যে, আপনার কাছে আদায় করবার মতন কিছু আছে?'

—'আপনার কথা শুনলে হাসি পায়। আপনার অবস্থা জলমগ্ন লোকের মতন। খড় ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছেন।'

—'অর্থাৎ?'

—'দীনবন্ধুর কাছে পদে পদে নাকাল হয়ে নিজের মান বাঁচাবার জন্যে আপনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। লোকে যেমন আসল শত্রুকে না পেলে তার খড়ের মূর্তি গড়ে পুড়িয়ে মনের ঝাল ঝাড়ে, আপনিও তেমনি দীনবন্ধুকে না পেয়ে তার বদলে একটা নকল বলির পশু খুঁজছেন—নইলে পূজার লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়! চমৎকার!'

প্রশান্তের মুখ লাল হয়ে উঠল—অরুণ তার যথার্থ দুর্বল স্থানে আঘাত করেছে। গম্ভীর স্বরে সে বললে, 'আমি দীনবন্ধুর ঠিকানা চাই।'

—'কার কাছে?'

—'আপনার কাছে।'

অরুণ হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'প্রশান্তবাবু, আমি দীনবন্ধুর ঠিকানা আপনাকে দিতে পারি।'

—'পারেন? দিন তবে।'

—'কিন্তু এক শর্তে।'

—'কি?'

—'আগে আপনাকেও দিতে হবে একটি ঠিকানা।'

—'কার?'

—'কালবোশেখীর।'

—'মানে?'

—'কালবোশেখী হচ্ছে দীনবন্ধুর মতো। সকলকে ত্রস্ত করে আচম্বিতে তার আবির্ভাব, চারিদিক তোলপাড় করে আচম্বিতে তার অন্তর্ধান! সে কোথা থেকে আসে? সে কোথায় চলে যায়? প্রশান্তবাবু, আমাকে কালবোশেখীর ঠিকানা দিন!'

প্রশান্ত আরওবেশি গম্ভীর স্বরে বললে, 'আপনি সাহিত্যিক। কবিত্ব প্রকাশ করছেন। কিন্তু পুলিস কবিত্ব বোঝে না, বোঝে খালি কর্তব্য। বেনাবনে কেন মুক্তো ছড়াচ্ছেন?'

—'লোকে মুদির দোকানে যায় চাল-ডাল আর ময়রার দোকানে যায় মণ্ডা কিনতে। আপনি এসেছেন সাহিত্যিকের কাছে। কবিত্ব ছাড়া এখানে আর কিছু মেলে না। রুচি না হয়, পথ দেখুন।'

মাটির উপরে ঠক ঠক শব্দে লাঠি ঠুকে প্রশান্ত বললে, 'আমি দীনুডাকাতের ঠিকানা চাই!'

পাশের টেবিলে পটাশ করে চড় মেরে অরুণ উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, 'জানি না, জানি না, জানি না! কতবার এক কথা বলব? আপনার অসভ্যতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর আমি সহ্য করব না!'

—'তাহলে আপনাকে অমি গ্রেপ্তার করব।'

—'তাহলে আপনাকে আমি বাধা দেব।'

—'বাধা দেবেন?'

—'নিশ্চয়! আমার নামে ওয়ারেন্ট কোথায়?'

—'ওয়ারেন্ট আনতে কতক্ষণ!'

—'আগে আনুন, তারপর কথা।' বলেই অরুণ একখানা খবরের কাগজ নিয়ে মুখের সামনে তুলে ধরলে।

প্রশান্ত বুঝলে মৌখিক তর্জন গর্জনে ভয় পাবার ছেলে নয় অরুণ। কিন্তু সে হচ্ছে পুলিস, তার তূণে ভিন্নরকম বাণেরও অভাব নেই। একটুখানি চুপ করে থেকে সে আর-একদিক দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করলে।

কণ্ঠস্বরে মধু মাখিয়ে ততোধিক মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে প্রশান্ত ধীরে ধীরে ডাকলে, 'অরুণবাবু!'

কিন্তু অরুণ বিগলিত হল না। নীরবে কাগজের হরপগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

প্রশান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল পাশের টেবিলের উপরে। সেখানে পড়ে আছে ভীষণরূপে পরিচিত নীলরঙের একখানা কার্ড!

প্রশান্ত টেবিলের উপর থেকে কার্ডখানা তুলে নিলে ঠিক যেন ছোঁ মেরে! কিন্তু কার্ডের উপরে দৃষ্টিপাত করেই তার চক্ষু স্থির!

তাতে লাল কালির লেখা—

'প্রশান্ত, নির্দোষ অরুণকে যেদিন গ্রেপ্তার করবে সেইদিনই তোমার মৃত্যুদিন। তুমি জানো, আমি দীনবন্ধু—আমার যে কথা, সেই কাজ। কেল্লার ভিতরে লুকোলেও তুমি মরবে।'

প্রশান্ত মড়ার মতন সাদা মুখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ধাঁ করে রিভলবার বার করে ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল উদভ্রান্তের মতো। কিন্তু ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নেই।

অকস্মাৎ প্রশান্তের এই যুদ্ধবেশ দেখে অরুণ বিস্মিত হয়ে বললে, 'ব্যাপার কি?'

প্রশান্ত কার্ডখানা অরুণের চোখের সামনে ধরলে। লেখা পড়ে অরুণ হতভম্বের মতন বললে, 'আশ্চর্য! কার্ডের কালি এখনও কাঁচা, কথাগুলো এইমাত্র লেখা হয়েছে!'

কর্কশ স্বরে প্রশান্ত বললে, 'হুঁ। এইতেই প্রমাণিত হচ্ছে দীনুডাকাত এই বাড়িতেই আছে!'

ঘরের উত্তর কোণ থেকে আওয়াজ এল—'কেবল এই বাড়িতেই নয়, ছায়ার মতন তোমারই সঙ্গে সঙ্গে!'

প্রশান্ত দুই হাত উঁচু একটা লাফ মারলে। উত্তর কোণে জনপ্রাণী নেই!

অরুণ একেবারে থ!

এবার শোনা গেল হা-হা-হা-হা করে একটা সুদীর্ঘ অট্টহাস্য! হাসির আওয়াজটা ঘরের ভিতরে প্রশান্তের চারিদিকে বেড়ে-বেড়ে ঘুরে আবার থেমে গেল।

প্রশান্তের সর্বাঙ্গে দিলে কাঁটা! দীনুডাকাত কি অদৃশ্য মানুষ? সে কি ভুতুড়ে মন্ত্র জানে? সে কি হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিশিয়ে থাকে?

প্রশান্ত আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা করলে না। পদে পদে চমকাতে চমকাতে দৌড় মেরে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল!

কিন্তু রাস্তাতেও কে তার কানের কাছে অদৃশ্য মুখ এনে বললে, 'খুন করব, খুন করব—আমি তোকে খুন করব!'

প্রশান্ত এবার দৌড়তে লাগল ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে!

অরুণ স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল—ভাবলে, হয় সে কোনও আজগুবি দুঃস্বপ্নলোকে বাস করছে, নয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে!

হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ এনে কে কোমল স্বরে বললে, 'ভাই অরুণ!'

অরুণ সচমকে ফিরে দেখলে, কেউ কোথাও নেই! অথচ সে হলপ করে বলতে পারে, এইমাত্র তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে বরুণ নিজে!

এমন সময়ে শ্রীধর ঘরে ঢুকে বললে, 'ছোটদা, এখানে এমন বিচ্ছিরি হাসি হাসছিল কে?'

অদৃশ্য কণ্ঠ বললে, 'আমি শ্রীধর, আমি!'

—'একি, বড়দা? তুমি কোথায় বড়দা?'

—'এই যে শ্রীধর, তোমার পাশেই!'

বড়দাকে আবিষ্কার করবার জন্যে মহাবিস্মিত শ্রীধর চরকির মতন ঘরময় ঘুরতে লাগল—কিন্তু কেউ কোথাও নেই!

—'শ্রীধর, তোমার হাঁ বন্ধ কর। আমায় কেউ দেখতে পাবে না, আমি প্রেতাত্মা!'

পর মুহূর্তে দুই চক্ষু কপালে তুলে শ্রীধর ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হল।

রোমাঞ্চিত দেহে অরুণ কাঠের পুতুলের মতন বসে বসে ভাবতে লাগল, তবে কি এই কথাই ঠিক? বরুণ কি হঠাৎ মারা পড়েছে, এখানে এসেছে তার প্রেতাত্মা? তাহলে প্রেততত্ত্ববিদদের কথা সত্য? মৃত্যুর পরেও দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব থাকে?..........

এমন সময় ঘরের বাহির থেকে মুচি ডাকলে, 'জুতো হয়ে গেছে বাবুজি!'

অরুণের তখন ওঠবারও ক্ষমতা ছিল না। সে ক্ষীণ স্বরে বললে, 'জুতো এইখানে নিয়ে এসো।'

মুচি এগিয়ে এসে তার হাতে জুতাজোড়া দিলে। তারপর সামনের চেয়ারের উপরে বেশ আরাম করে বসে পড়ল।

অরুণ ভাবলে, আজ কি পৃথিবীটা উল্টে গেছে? অনুপস্থিত লোক চিঠি নিয়ে আসে, অদৃশ্য মানুষ কথা কয়, মুচি মস্তবড়ো বাবুসায়েবের মতো ড্রইংরুমের গদিমোড়া চেয়ারের উপরে বসে পড়ে!

কিন্তু শেষোক্ত দৃশ্যটা হজম করা শক্ত। অরুণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'তবে রে পাজি ছুঁচো! আমার সামনে বেয়াদপি? ওঠ—এখনই ঘর থেকে বেরো, নইলে জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব!'

মুচি দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললে, 'বাবুজি, জুতো মেরে জুতো ছিঁড়লে আর আমি মেরামত করতে পারব না!'

এ বরুণের কণ্ঠস্বর! কিন্তু কথাগুলো বেরুল মুচির মুখ দিয়েই!

বিস্ফারিত চক্ষে অরুণ মুচির চোখের পানে তাকিয়ে রইল—নিজের চোখ-কানকেও আর বিশ্বাস করতে পারলে না!

মুচি বললে, 'অরুণ, তুমি কি এখনও আমাকে চিনতে পারছ না? আমি বরুণ!'

—'মুচির বেশে?'

—'এটা আমার ছদ্মবেশ।'

—'কিন্তু তোমার গায়ের রং কালো কেন?'

—'শিল্পীর তুলিকা চালনায়।'

—'আর ওই ফুলোফুলো গাল?'

—'দুই গালের ভিতরদিকে দুখণ্ড রবার আছে। রগের পাশে এই যে মস্ত আব দেখছ, এও কৃত্রিম।'

—'তুমি জুতোশেলাই করতেও জানো দেখছি!'

—'জুতোশেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব জানি। আমি কি ঘাস কাটবার জন্যেই আটবৎসরব্যাপী অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলুম?'

—'এতক্ষণে সব বুঝলুম! কিন্তু তুমি তো আমাদের সমুখে বসেই একমনে জুতো সেলাই করছিলে। তবে তোমার হাতে লেখা নীলরঙের কার্ডখানা টেবিলের ওপরে এল কেমন করে?'

—'ম্যাজিকের মহিমায়।'

—'ধেৎ!'

—'সত্যি বলছি। যখন তুমি খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকলে আর প্রশান্ত উত্তেজিত হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, কার্ডখানা আমি টেবিলের ওপরে ছুড়ে ফেলে দিলুম।'

—'আবার বাজে কথা! একখানা হালকা কার্ড দূর থেকে কখনও নির্দিষ্ট জায়গায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়?'

—'বলছি তো, ও হচ্ছে, ম্যাজিক অর্থাৎ হাতের কায়দা! রঙ্গমঞ্চে তুমি কি কখনও সায়েব যাদুকরদের ম্যাজিক দেখনি? হাতের পাৎলা তাস তারা অনেক দূরে নির্দিষ্ট জায়গায় যথেচ্ছ ভাবে ছুড়ে ফেলে দেয়?'

—'হুঁ, অজ্ঞাতবাসে গিয়ে তুমি দেখছি 'সবজান্তা লরেন্স'* হয়ে ফিরে এসেছ! তোমাকে

* সিপাহ-বিপ্লবের সময়ে স্যার জন লরেন্সকে সিপাহীরা ঐ নামে ডাকত।

আর কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না—এইবারে তোমার কণ্ঠস্বরের রহস্যটাও আন্দাজ করতে পারছি।'

মুখ টিপে হাসতে হাসতে বরুণ বললে, 'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। এ আর কিছু নয়—'ভেন্ট্রিলোকুইজমে'র মহিমা। বাংলায় যাকে বলে 'দূরাগতশব্দানুকরণ'!'

—'ঠিক। কিন্তু তোমার বুদ্ধি দেখছি বড়ো দেরিতে সচেতন হয়!'

—'কি করে বুঝব ভাই? বরুণের রূপান্তর যে মুচি, এটা সহজে কার মাথায় ঢোকে? মুচির স্বরূপ ধরতে পারলে আমি আর কিছুতেই বিস্মিত হতুম না! বাহাদুর বরুণ! কি নিখুঁত ছদ্মবেশই ধারণ করেছ! ....কিন্তু এ ছদ্মবেশের কারণ কি?'

—'এমন সব জায়গায় যেতে হবে, যেখানে এই ধরনের ছদ্মবেশ না থাকলে সুবিধা হয় না। আমি এখন গোটা কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াতে চলেছি। আমার কাজ এখন শহরের নাড়ীপরীক্ষা। আজ আর এর বেশি কিছু বলব না!'

—'কিন্তু তুমি আজ আমার বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে গেলে।'

—'কেন?'

—'প্রশান্ত একে আমাদের পূর্বইতিহাস জানতে পেরেছে, তার উপরে আমার বাড়িতে আজ যে অভিনয়টা হয়ে গেল, সে নিশ্চয়ই মনে করবে আমি হচ্ছি তোমার সহকারী। হয়তো কালকেই আমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরুবে।'

—'বৈধ কারণ দেখাতে না পারলে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করা যায় না। আজ এখানে সে কি প্রমাণ পেয়েছে? দীনুডাকাত নেই, অথচ সে নিজে এসে চিঠি লিখে সামনে রাখে। অদৃশ্য দীনুডাকাত কথা কইতে কইতে পলাতক গোয়েন্দার পিছনে তাড়া করে! এসব কি আইনে গ্রাহ্য হবার প্রমাণ? বিশেষ, প্রশান্তের ধাত আমি জানি। এই-সব আজগুবি গল্প বলে নিজের ভীরুতা আর বোকামি জাহির করে কখনোই সে হাস্যাস্পদ হতে রাজি হবে না। সব চেপে যাবে। ....থাক এসব বাজে কথা। আমার দেরি হয়ে গেল। চললুম।'

অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে দুঃখিত ভাবে বললে, 'ভাই বরুণ, আর কতদিন তুমি এমন সমাজছাড়া ভবঘুরে জীবন যাপন করবে?'

বরুণ চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে পূর্ণকণ্ঠে বলে গেল, 'যতদিন-না দরিদ্র-নারায়ণদের শূন্য ভাণ্ডারে মা লক্ষ্মী আবার তাঁর ঝাঁপি নিয়ে এসে দাঁড়ান।'

অরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাগজ নিয়ে বসল।

মিনিট দশেক পরে হঠাৎ তার বাড়ির সামনে মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল। তারপরেই বাড়ির ভিতরে হন্তদন্তের মতো এসে ঢুকল প্রশান্ত এবং একদল পাহারাওয়ালা!

অরুণ ভাবলে প্রশান্ত এসেছে তাকে গ্রেপ্তার করতে।

প্রশান্ত কিন্তু এসেই চেঁচিয়ে উঠল, 'মুচি, মুচি! সেই মুচিব্যাটা কোথায় পালাল?'

ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করে অরুণ মনে মনে হেসে বললে, 'মুচি জুতো শেলাই করে চলে গিয়েছে!'

—'হায় হায়, চলে গিয়েছে? কতক্ষণ চলে গিয়েছে?'

—'মিনিট পনেরো আগে।'

প্রশান্ত প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'কেন তাকে চলে যেতে দিলেন?'

—'কাজ শেষ হয়ে গেলে কে আবার মুচিকে ধরে রাখে?'

—'সে মুচি না ঘেঁচু! সেই বেটাই দীনুডাকাত!'

অরুণ অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'প্রশান্তবাবু, আর লোক হাসাবেন না, বাড়ি যান। 'দীনু দীনু' করে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মুচি ধাঙড় হাঁড়ি ডোম সকলেরই মধ্যে দেখতে পান দীনুডাকাতকে। গল্পে শুনেছিলুম, কুমড়োর কথা ভাবতে ভাবতে কোনও লোক জগন্নাথ দেখতে গিয়েও রত্নবেদীর উপরে দেখেছিল কুমড়োকেই!'

—'আরে রাখুন মশাই গল্প! আমার মাথায় জ্বলছে আগুন, আর উনি নিয়ে এলেন কিনা কুমড়ো আর জগন্নাথের রূপকথা! অমানুষিক গলার আওয়াজ শুনে হঠাৎ ভড়কে গিয়েছিলুম—এমন অবস্থায় কে না ভড়কে যায়? তারপর বাসায় ফিরে একটু চিন্তা করতেই বুঝলুম, সবটাই হচ্ছে ছেলেভুলানো ভুয়ো ব্যাপার! মানুষ নেই, কথা আছে! অদৃশ্য মানুষ! রামচন্দ্র! এ হচ্ছে ভেন্ট্রিলোকুইজম! মুচিটার দিকে তাচ্ছিল্য করে তাকাইনি—এ হচ্ছে তারই কাজ! আর যে মুচি ভেন্ট্রিলোকুইজম-এর সাহায্যে দীনু-ডাকাত হয়ে ভয় দেখায়, সে নিজে দীনুডাকাত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না! তাই তো দলবল নিয়ে ছুটে এলুম—কিন্তু আবার তাকে হারালুম, হাতে পেয়েও!'

অরুণ বললে, 'আপনার অনুমান সত্য কিনা আপনিই জানেন! কিন্তু দেখছি আপনার স্বভাব হচ্ছে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।'

প্রশান্ত বললে, 'হায় রে, আমার যে মান বাঁচানো দায় হয়ে উঠল!'

নবম পরিচ্ছেদ

নতুন ফাঁদের ব্যবস্থা

বড়োসাহেবের কাছ থেকে জরুরি তলব এসেছে।

প্রশান্তের বুক টিপটিপ করতে লাগল। কারণ দিনতিনেক আগে খবরের কাগজে 'মুচি এবং অদৃশ্য মানুষের কাহিনী' বেরিয়ে জনসমাজে তার মাথা দস্তুরমতো হেঁট করে দিয়েছে!

গল্পের নায়ক রূপে প্রশান্তের নাম ব্যবহার করা হয়নি—'প্রশান্তে'র বদলে বসানো হয়েছে 'অশান্ত'। কিন্তু ওই অশান্তই যে প্রশান্ত, কারুর একথা বুঝতে বাকি থাকেনি।

নিশ্চয় এ দীনুডাকাতেরই নিজের কীর্তি! বারবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এবং সাত ঘাটের জল খাইয়েও দীনু তাকে যতটা কাবু করতে না পেরেছে, কাগজে কাগজে ধারাবাহিক

ভাবে এই লেখনীবাণ ত্যাগ করে সে তাকে তারও চেয়ে ঢের বেশি আহত করে ফেলছে। একেবারে আধুনিক যুদ্ধরীতি! কেবল অস্ত্রে-অস্ত্রে যুদ্ধ নয়, তার সঙ্গে রীতিমতো প্রপাগাণ্ডা ও বাক্যবন্দুকের যুদ্ধ! দীনু দেখছি তার ভাত না মেরে ছাড়বে না!

আচ্ছা, দীনুর চেহারা কেমনধারা? দীনু তার এতবড়ো শত্রু, এতবার সে তার কাছাকাছি এসেছে, এমন-কি, কথাবার্তা পর্যন্ত কয়েছে, তবু সে তাকে একবারও ভালো করে দেখবার সুযোগ পায়নি!

তবে তার চেহারার কতকটা বর্ণনা পাওয়া গেছে বটে, মানিকচাঁদের মুখে। সে বর্ণনার প্রত্যেকটি কথা পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতো সে মুখস্থ করে রেখেছে ঃ

'মাঝবয়সী। মাথায় সাদা-পাকা লম্বা চুল। চোখে নীলরঙের চশমা। গোঁফ আছে, আর আছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। গালে একটা বড়ো আঁচিল। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় বোধহয় সাড়ে ছ-ফুট উঁচু। বেজায় চওড়া বুক।'

এটা তার আসল চেহারা? না ছদ্মবেশ? বলা শক্ত। ছদ্মবেশের ব্যাপারে দীনু যে কতবড়ো আর্টিস্ট, এই সে দিনে মুচিকে দেখেই প্রশান্ত সেটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে!

ভাবতে ভাবতে সে পুলিসআপিসে এসে পৌঁছল। তারপর বড়োসাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকল যূপকাষ্ঠের নিকটস্থ ছাগবৎসের মতো। যা ভেবেছে তাই! বড়োসাহেব প্রথমেই 'মুচি ও অদৃশ্যমানুষের কাহিনী'র প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, 'প্রশান্ত, তোমার আর দীনুডাকাতের ব্যাপারটা ক্রমেই থিয়েটারি প্রহসনের মতন হয়ে উঠছে না?'

প্রশান্ত ঘাড় হেঁট করে মৃদু স্বরে বললে, 'স্যার, গল্পটা অতিরঞ্জিত।'

—'কিন্তু কাল্পনিক তো নয়?'

—'গল্পে আমাকে খালি দুর্দশাগ্রস্ত, ভীরু, বোকা ভাঁড়ের মতন করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি যে একটু পরেই আসল রহস্য বুঝতে পেরে দীনুকে ধরবার জন্যে আবার ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম, তার কোনও উল্লেখই নেই।'

বড়োসাহেব বললেন, 'যাক ও প্রসঙ্গ। তোমার দুর্দশার কথা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। আমি এখনও তোমার উপরে বিশ্বাস হারাই নি। জানি, তুমি পরিশ্রমী, সুচতুর, সুযোগ্য কর্মচারি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, দীনুর বুদ্ধি আর চাতুর্য তোমার চেয়ে বেশি।'

প্রশান্ত কোলকুঁজো হয়ে পড়ে ভাবতে লাগল, বড়োসাহেব তার সুখ্যাতি করছেন না নিন্দা করছেন?

বড়োসাহেব বললেন, 'আচ্ছা, ওই অরুণ লোকটাকে তোমার কি মনে হয়?'

—'ধড়ীবাজ স্যার, মহা ধড়ীবাজ! অনেক কথাই জানে, কিন্তু কিছুই ভাঙে না। একেবারে পাকা বাঁশ, একটুও নোয় না। ও দীনুর বাল্যবন্ধু।'

—'আমি ওদের কাগজপত্র দেখেছি। আটবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর বরুণ যেদিন থেকে দীনবন্ধু নাম ধারণ করে ফিরে এসেছে, ওদের দুজনের মধ্যে আর তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই।'

—'কিন্তু স্যার, দীনু এখনও মাঝে মাঝে অরুণের বাড়িতে যায়।'

—'হতে পারে। সেটা বাল্যবন্ধুতার খাতিরে। আমার নিজেরও এমন বাল্যবন্ধু থাকতে পারে, এখন হয়তো যে দুরাত্মা। কিন্তু তার অপকর্মের জন্যে আমাকে কেউ দায়ি করতে পারবে না! অরুণ যে দীনুর সহকারী, তুমি এমন কোনও স্পষ্ট প্রমাণ পাওনি তো?'

—'না স্যার। তবে শীঘ্রই পাব বলে আশা করি।'

—'বেশ, তারপর তোমার সঙ্গে অরুণকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে। ......এখন তোমাকে কি জন্যে ডেকেছি শোনো।'

প্রশান্ত কান পেতে রইল। বড়োসাহেব দপ্তর থেকে একখানা কাগজ বার করে বললেন, 'পাটনা শহরে দিন-তিনেক আগে একটা বড়ো রকমের ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, সে খবর পেয়েছ?'

—'পেয়েছি স্যার।'

—'অনেকের অনুমান, এই ডাকাতির সঙ্গে দীনুর সম্পর্ক আছে।'

—'ওই ডাকাতিতে তিনজন লোক আহত, আর দুজন হত হয়েছে। দীনু কিন্তু নরহত্যা করতে চায় না।'

—'আমি ও কথা শুনেছি। কিন্তু এ রকম ডাকাতির ব্যাপারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৈব-গতিকে খুন-জখম হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?'

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'দীনু এখন পাটনাতেই আছে। এই চিঠিখানা পড়লেই সব বুঝবে। এখানা নকল, আসল চিঠি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁচেছে।'

চিঠিখানা এই ঃ

'ধনীরাম,

আগামী পনেরোই তারিখে আমি এখান থেকে পাঞ্জাব মেলে যাত্রা করে ১৬ই তারিখে সকালে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব। আমাদের 'ক্লাবে' তুমি দলের সবাইকে নিয়ে হাজির থেকো। বিশেষ জরুরি পরামর্শ আছে। ইতি

দীনবন্ধু'

বড়োসাহেব বললেন, 'চিঠিখানা ছিল খামের ভিতরে। কিন্তু নির্বোধরা জানে না, খামে চিঠি লিখলেও পুলিসের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।'

—'ধনীরাম কে স্যার?'

—'এক পাঞ্জাবি হোটেলওয়ালা। নিজের অজান্তেই সে এখন পুলিসের নজরবন্দী হয়ে আছে।'

—'আজ তো চৌদ্দ তারিখ। দীনু কাল পাটনা ত্যাগ করবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমায় কি করতে হবে?'

—'পরশু সকালে দলবল নিয়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির থাকবে।'

দীনবন্ধুকে বন্দি করাই তার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এবারে সুযোগ পেয়েও প্রশান্তের মন সম্ভাবনার আনন্দে নৃত্য করে উঠল না। দীনু যে কতবড়ো পিচ্ছল ও ঘ্যাঁচড়া মাছ, বারবার মুখে চুন-কালি মেখে এটা সে টের পেয়েছে হাড়ে হাড়ে। এখন দীনুর কাছে যেতেও তার হৃৎকম্প হয়! কর্তব্যপালনের জন্যে প্রাণ দিতেও সে রাজি, কিন্তু আবার যদি তেমনই লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হতে হয় সেই ভয়েই তার মন করতে লাগল খুঁত-খুঁত।

বড়োসাহেব শুধোলেন, 'কি প্রশান্ত, তোমার সাহস হচ্ছে না নাকি?'

—'না স্যার, তা নয়।'

—'তবে?'

—'আমার একটি নিবেদন আছে।'

—'বলো।'

—'এবারে দায়িত্বের খানিকটা যদি আপনি নিজে নেন, তাহলে বেঁচে যাই।'

—'তার অর্থ?'

—'আমি আপনারও সাহায্য চাই।'

—'কি সাহায্য?'

—'বলছি স্যার। ....দেখুন, দীনু বড়োই আট ঘাট বেঁধে কাজ করে। পাটনা থেকে কলকাতা—মাঝে অনেক স্টেশন। দীনুর চর চারিদিকে। পুলিসের গন্ধ পেয়ে দীনু যদি মাঝের কোনও স্টেশনে নেমে সরে পড়ে?'

—'অসম্ভব নয়।'

—'তার চেয়ে আর এক কাজ করলে হয় না?'

—'কি?'

—'আমি আজই পাটনায় যাই জনকয় লোক নিয়ে। কালকের ট্রেনে পাটনা থেকে বেরিয়ে দীনুর সঙ্গেই পরশুদিন কলকাতায় এসে পৌঁছব।'

—'মন্দ কথা নয়।'

—'সেই সময়ে আপনি যদি দয়া করে লোকজন নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হই!'

বড়োসাহেব হেসে বললেন, 'কে বলে প্রশান্তের বুদ্ধি নেই? আমাদের প্রশান্ত অতিশয় বুদ্ধিমান! আবার যদি তাকে একলা হাস্যাস্পদ হতে হয়, সেই ভয়ে সে উপরওয়ালাকেও দলে টানছে! সাধু প্রশান্ত, সাধু! বেশ, আমি রাজি।'

দশম পরিচ্ছেদ

দীনদা

প্রশান্ত পাটনা স্টেশনে পায়চারি করছে। তার আশেপাশে ঘুরছে কলকাতা

পুলিসের সাত-আটজন লোক। কারুর ইউনিফর্ম নেই। কারুকে পুলিসের লোক বলেও চেনা যায়না।

পাঞ্জাব মেল এল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তের চোখ আর কান সজাগ হয়ে উঠল।

স্টেশনে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি! কেউ গাড়িতে উঠছে, কেউ গাড়ি থেকে নামছে।

প্রশান্ত যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই ট্রেনের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা—রিজার্ভ করা। কামরার ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে একাধিক স্ত্রীকণ্ঠের কান্না।

প্রশান্ত কামরার ভিতরে একবার উঁকি মেরে দেখলে।

গাড়ির একদিকে একখানা খাটিয়া। তার উপরে একটা মৃতদেহ—তার গায়ে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা নূতুন কাপড় জড়ানো। খাটের এপাশে ওপাশে জন-চারেক মাড়োয়ারি স্ত্রীলোক কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এবং কেউবা চিৎকার করে কাঁদছে।

জন-ছয়েক মাড়োয়ারি পুরুষও চুপ করে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

পুলিসের মন, সব বিষয়েই কৌতূহল! একজন মাড়োয়ারিকে জিজ্ঞাসা করে প্রশান্ত এই খবরটুকু সংগ্রহ করলে।

কলকাতার বিখ্যাত ধনী অর্জুনদাস আগরওয়ালা ব্যবসায়সূত্রে মোগলসরাইয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে মারা পড়েছে। দেহ কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শুনতে শুনতে প্রশান্ত বরাবর স্টেশনে প্লাটফর্মের উপরে রেখেছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু দীনুডাকাত বলে মনে হয়, এমন কারুকেই দেখা গেল না।

পায়ে পায়ে প্রশান্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে এল। একটা সন্দেহজনক মূর্তি পর্যন্ত চোখে পড়ল না। মনে মনে ভাবলে, না জানি দীনু আজ কী নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে!

কিন্তু প্রথম ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই একদল হিন্দুস্থানি হল্লা করতে করতে গাড়ির একটা কামরায় এসে উঠল এবং প্রশান্তের চোখ সেই দলে আবিষ্কার করলে কলকাতার তিনজন পুরাতন পাপীকে। সেও সেই কামরায় উঠে পড়ল।

কিন্তু কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে তখনও সে প্লাটফর্মের উপরে নজর রাখতে ভুললে না।

শেষ ঘণ্টা দিলে। গার্ডের বাঁশি বাজল।

এমন সময়ে একটি লোক বেগে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ি ধরলে।

মুহূর্তে প্রশান্তের চোখ চমকে উঠল। মানিকচাঁদের বর্ণনা তার মনের মধ্যে জেগে উঠল বিদ্যুৎ-চিত্রের মতো!

নিজেকে বোধ হল বন্দী বলে। তার পাদুটো তখন ও-কামরার দিকে ছোটবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে, কিন্তু ট্রেন তখন চলছে। সন্দেহজনক হিন্দুস্থানিদের ভালো করে দেখবার ইচ্ছাও তার হল না—প্রশান্তের মন ছটফট করে খালি বলতে লাগল, কখন গাড়ি থামবে, কখন গাড়ি থামবে!

পরের স্টেশন এল। প্রশান্ত এক লাফে নিচে নেমে খানিকটা এগিয়ে যেতেই একখানা ইন্টার ক্লাস কামরায় দেখতে পেলে সেই লোকটাকে।

বিনাবাক্যব্যয়ে কামরায় উঠে সে একেবারে একপ্রান্তে গিয়ে নিজের জন্যে একটুখানিক জায়গা করে নিলে। লোকটা তখন ওদিককার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল, তাকে দেখতে পায়নি। প্রশান্ত টাইম-টেবল খানা নিজের মুখের সামনে তুলে ধরলে এবং তারই আড়াল থেকে লোকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

আবার মানিকচাঁদের বর্ণনা স্মরণ করলে ঃ

'মাঝবয়সী। মাথায় সাদা-পাকা চুল। চোখে নীলরঙের চশমা। গোঁফ আছে, আর আছে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। গালে একটা বড়ো আঁচিল। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় বোধহয় সাড়ে ছ-ফুট উঁচু। বেজায় চওড়া বুক।'

বর্ণনার সঙ্গে এই লোকটার চেহারার অধিকাংশই যে মিলে যায়! প্রশান্ত পরম উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কিন্তু—হ্যাঁ, একটু আধটু অমিলও আছে। এর রং শ্যাম, উজ্জ্বল শ্যাম নয়। আর এ বোধকরি সাড়ে পাঁচফুটের চেয়ে বেশি উঁচু হবে না।

কিন্তু এমন একটু আধটু আমিল ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মানিকচাঁদ যে-অবস্থায় দীনুকে দেখেছিল, তখন তার মাথার ঠিক ছিল না। চোখের ভ্রম না-হওয়াই আশ্চর্য!

বাকি সব চমৎকার মিলে যাচ্ছে। 'মাঝবয়সী। মাথায় সাদা-পাকা চুল। নীলরঙের—'

না, এর চোখে নীলরঙের চশমা নেই। তাতে কি হয়েছে? চশমা তো আর দেহের অঙ্গ নয়, এখন খুলে রেখেছে।

এরও গোঁফ আছে, আর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। এমনকি গালে একটা বড়ো আঁচিলেরও অভাব নেই—যদিও আঁচিলটা কোন গালের মানিকচাঁদের কাছ থেকে আমার তা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। ....এরও বুক বেজায় চওড়া।

আরে, আরে—এ কি?

লোকটা পকেট থেকে একখানা চশমা বার করে পরলে। কিন্তু তার কাচ নীলরঙের নয়—কালো রঙের ঠুলি-চশমা, ট্রেনে অনেকেই যা ব্যবহার করে।

লোকটার পাশে বসেছিল দুজন ছোকরা। একজন তাকে শুধোলে, 'হ্যাঁ মশাই, আপনি তো পাটনা থেকে উঠলেন! ওখানে নাকি একটা বিষম ডাকাতি হয়ে গিয়েছে?'

লোকটা সংক্ষিপ্ত স্বরে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ।'

দ্বিতীয় ছোকরা জিজ্ঞাসা করলে, 'শুনছি নাকি ডাকাতরা একলাখেরও বেশি টাকা নিয়ে সরে পড়েছে?'

—'না, বিশ হাজার।'

—'মোটে বিশ হাজার? ওরে হরি, দীনুডাকাত এবারে তাহলে বেশি টাকা পায়নি! আরে ছিঃ, বিশ হাজার টাকার জন্যে দীনু শেষটা খুন-জখম করলে!'

লোকটা এইবারে জাগ্রত হয়ে উঠল। রুক্ষকণ্ঠে বললে, 'দীনবন্ধুর সঙ্গে এ ডাকাতির সম্পর্ক কি?'

—'সম্পর্ক কি জানি না, তবে সবাই তো তাই বলছে।'

—'সবাই বলছে না, বলছে খালি পুলিস।'

হরি নামধেয় যুবকটি বললে, 'ঠিক ধরেছেন স্যার! সুরেন যে পুলিস ইনস্পেক্টারের ছেলে!'

সুরেন প্রতিবাদ করে বললে, 'আমি এ কথা বাবার মুখ থেকে শুনিনি।'

লোকটা বললে, 'দীনবন্ধু যে এ ডাকাতি করেনি তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, এখানে দুজন লোক খুন হয়েছে। দীনবন্ধু মানুষ খুন করে না—বুঝেছ? সে খুনি নয়। সে ডাকাতি করে মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে—প্রাণবধ করবার জন্যে নয়।'

উৎকর্ণ হয়ে প্রশান্ত টাইম-টেবল-এর আড়াল থেকে প্রত্যেক কথা শ্রবণ করছিল। মনে-মনে বললে, 'হুঁ, দীনুর জন্যে ভারি প্রাণের টান—তার হয়ে আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে! আচ্ছা, সবুর করো!'

গাড়ি ছুটছে—যেন জয়যাত্রার হট্টগোল তুলে। বাইরেকার রূপোলী জ্যোৎস্নায় ডোবানো বন-মাঠ-নদী আসছে-যাচ্ছে যেন চলচ্চিত্রের মতো।

কতক্ষণ আর টাইম-টেবলের আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকা যায়? সে বইখানা নামিয়ে রেখে উড়ানি দিয়ে মুখের খানিকটা ঢাকা দিলে। কিন্তু যার জন্যে এত সাবধানতা, সেই লোকটা তার দিকে একবারও ফিরে তাকালে না।

একটু পরেই সে কোনোরকমে হেলে পড়ে বোধহয় যেন ঘুমোতে লাগল।.........

গাড়ি যখন আসানসোলে, লোকটা হঠাৎ উঠে বসল। জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তারপর কামরা থেকে নেমে গেল।

বলাবাহুল্য, প্রশান্ত তাকে চোখের আড়ালে যেতে দিলে না, সেও নেমে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। লোকটা খানিকক্ষণ প্লাটফর্মের এদিকে ওদিকে পায়চারি করে আবার কামরায় এসে ঢুকল।

বর্ধমানেও লোকটা আবার নামল। সে যেখানে যায়, প্রশান্তও পিছু নেয়। সে সীতাভোগ মিহিদানা কিনলে, দরকার না থাকলেও প্রশান্তও কিছু মিষ্টি ক্রয় করলে।

এবারে কামরায় উঠে লোকটা খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে প্রশান্তের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখের ভাব অপ্রসন্ন।

প্রশান্ত বুঝলে সে ধরা পড়ে গেছে, আর লুকোচুরি মিছে। সেও সপ্রতিভ ভাবে তার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলে।

লোকটা হঠাৎ কি ভেবে একটুখানি হাসলে। চশমাখানা খুলে রেখেছিল, আবার পরে নিলে। তারপর চুপ করে বসে রইল জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

প্রশান্ত মনে মনে বললে, 'ভায়া, কালো চশমা পরে আবার চোখ ঢাকতে চাও? ঢাকো, কিন্তু আর ঢাকাঢাকি করে বিশেষ সুবিধে হবে কি?'

এমন সময়ে কামরায় এসে উঠল অরুণ! প্রথমেই লোকটার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই সে বললে, 'আরে দীনদা যে! পাটনা থেকে আজ লম্বা দৌড় মেরেছেন দেখছি!'

দীনদা বললে, 'এই যে, এসো এসো! বর্ধমানে কি করতে এসেছ?'

—'নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।'

প্রশান্তের দেহের মধ্যে তার আত্মা তখন নৃত্য করছে! যেখানে অরুণ, সেখানেই দীনুডাকাত এবং যেখানে দীনু, সেখানেই অরুণ! এখানে অরুণের আকস্মিক আবির্ভাবের আর কোনও মানে হয় না! হুঁ, এইবারে অরুণও যেন তার জালের ভিতরে ঢুকি-ঢুকি করছে! তা করবেই তো, যতই চতুর-চূড়ামণি হও, ফাঁকের ঘরে পা ফেলে-ফেলে চিরদিন কি কাটানো যায়?

লোকটার সম্বন্ধে যা-কিছু সন্দেহ ছিল, অরুণের আবির্ভাবে প্রায় তার সবটাই পাৎলা হয়ে গেল রোদের ছোঁয়ায় কুয়াশার মতো। প্রথমত, এই লোকটা আর অরুণ পরস্পরের সঙ্গে সুপরিচিত। দ্বিতীয়ত, এর নাম দীনদা—যা দীনবন্ধুরই সংক্ষিপ্ত রূপ ছাড়া আর কি হতে পারে? দৈবগতিকে কখনও এমন যোগাযোগ সম্ভবপর নয়! নিশ্চয় অরুণের সঙ্গে আগে থাকতেই একটা কিছু বন্দোবস্ত ছিল!

প্রশান্ত একসঙ্গে সব প্রমাণ ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। ১নং—ওই লোকটার চেহারার সঙ্গে মানিকচাঁদের বর্ণনা প্রায় হুবহু মিলে যায়।

২নং—দীনুর যেদিনে যে ট্রেনে পাটনা থেকে কলকাতায় ফেরবার কথা, ওই লোকটাও ঠিক সেই দিনে আর সেই ট্রেনে কলকাতায় আসছে।

৩নং—কামরায় বসে দীনুর পক্ষসমর্থন করবার জন্যে লোকটা যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে। অবশ্য প্রশান্ত যে সেই কামরাতেই বিদ্যমান, এটা টের পেলে সে বোধহয় কোনও উৎসাহই দেখাতো না!

৪নং—অরুণেরও ঠিক এই ট্রেনেরই এই কামরায় আগমন।

৫নং—এরা দু'জনেই দু'জনের বন্ধু—কারণ অরুণ একে 'দাদা' সম্বোধন করলে।

৬নং—অরুণ একে ডাকলে দীনদা বলে—যা দীনবন্ধুরই অপভ্রংশ। এ একটা মস্ত প্রমাণ!

প্রমাণগুলোকে একে একে সে মনের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছে, এমন সময়ে অরুণও তাকে দেখতে পেলে!

সে বলে উঠল—'হ্যাঁ! এ কামরার ভেতরে দেখছি আমার বন্ধুসভা বসেছে! এদিকে দীনদা, ওদিকে প্রশান্তবাবু, ব্যাপার কি?'

প্রশান্ত অরুণের এই আত্মীয়তাস্থাপনের চেষ্টাটা পছন্দ করলে না। ভারিক্কে চালে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, 'কলকাতায় ফিরছি।'

অরুণ ফিক করে হেসে বললে, 'আহা, সে তো ফিরবেনই! আমরা হচ্ছি শহুরে পতঙ্গ, আর আমাদের কাছে কলকাতা হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিপ্রাসাদ! ওখানে না ছুটলে, আমাদের যে অগ্নিমান্দ্য হয়! ও-কথা জানতে চাইছি না!'

—'তবে?'

—'বলি, আজ আবার কার পিছনে?'

—'মানে?'

—'নতুন কোনও হরিণের সন্ধান পেয়েছেন নাকি?'

—'হরিণ?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হরিণ! আপনারা হচ্ছেন ব্যাঘ্রজাতীয় বন্য জীব, হরিণের মাংস না হলে তো চলে না!'

কাষ্ঠহাসি হেসে ঠাট্টার ছলে প্রশ্নটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে প্রশান্ত বললে, 'আপনি দেখছি উপমাসম্রাট—দুই হাতে ছড়িয়ে যান খালি উপমার ঐশ্বর্য!' বলেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

সেই অবস্থাতেই তার সতর্ক কান শুনতে পেলে হরি নামক যুবকটি চাপা গলায় অরুণকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও ভদ্রলোকটি কে মশাই?'

অরুণ বললে, 'ডিটেকটিভ।'

দীনদা নিম্নস্বরে বললে, 'আজ উনি আমার পিছনে আঠার মতন লেপ্টে আছেন।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমি উঠলে উনি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান, আমি বসলে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়েন, আমি বাইরে বেরুলে উনি পশ্চাদ্ধাবন করেন, আমি সীতাভোগ কিনলে উনিও নগদ দামে সীতাভোগ কেনেন। এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি, তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমি খাবি খেলে উনিও খাবি খেতে বাধ্য হবেন!'

হরি খিলখিল করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল, কিন্তু নিম্নস্বরে বললে, 'পুলিসরা কি ফুলিস!'

সুরেন নামক যুবকটি জিজ্ঞাসা করলে, 'ওঁর নাম কি?'

অরুণ বললে, 'প্রশান্ত মজুমদার।'

হরি বললে, 'ও, উনিই সেই সুবিখ্যাত দীনুডাকাতের বন্ধু কুবিখ্যাত অশান্ত মজুমদার?'

চারিদিকে জাগল কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্গে চাপাগলায় টিটকিরির গিটকিরি!

রুদ্ধ ক্রোধে ও আক্রোশে প্রশান্তের বুকটা টনটন করে উঠল। হরি নামক যুবকটির কর্ণযুগল আচ্ছা করে মর্দ্দন করে দেবার জন্যে তার হাত দুটো যেন নিস-পিস করতে লাগল। কিন্তু এখানে একটা প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা করে সব পণ্ড করবার ভরসা তার হল না। সেই গোলে-হরিবোলে দুই ডানা মেলে পাখি যদি ফাঁকি দেয়? দীনুর পিছনে ছুটে বরাবরই ঘাটের কাছে এসে ডুবেছে তার নৌকা। বারংবারই দীনু এসেছে তার নাগালের মধ্যে, কিন্তু শেষ-ছোঁ মারতে গিয়ে তাকে আর ছুঁতে পারেনি। দীনু আলেয়ার চেয়ে কাছে আসে, কিন্তু হাত বাড়ালেই আলেয়ার চেয়ে দূরে পালায়!

আজ আর সে অনুতাপ বা আত্মভর্ৎসনা করবার কোনও পথই খোলা রাখবে

না। আজ তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ওই লোকটিকে চোখে-চোখে রাখা। আজ প্রশান্তকে ধর, মারো, গালি দাও, ঠাট্টা করো—সে কিন্তু এখানেই বৈদ্যনাথের পাথুরে ষাঁড়ের মতন 'নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু' হয়ে থাকবে।

তারপর? তারপর হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামলেই তার সমস্ত কর্তব্য খতম! সেখানে আছেন বড়োসাহেব, সেখানে আছে পুলিস পাহারা—সব দায়িত্ব উপরওয়ালার ঘাড়ে চাপিয়ে সে হবে একেবারে নিশ্চিন্ত!

অরুণ বললে, 'প্রশান্তবাবু, আপনার মুখখানা আজ অমন মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে কেন?'

প্রশান্ত মিষ্টি হাসি হেসে বললে, 'তাই নাকি? আপনার কবির চোখ, নতুন-রকম কত কি দেখতে পায়!'

অরুণ আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'সেদিনকার সেই মুচিটার কোনও পাত্তা পেলেন নাকি?'

—'না, এখনও তাকে দরকার হয়নি। যেদিন জুতো শেলাই করাব সেদিন তার খোঁজ নেব।'

কিন্তু কামরার অনেক লোক তখন মুখ টিপে-টিপে হাসতে শুরু করেছে। খবরের কাগজে বোধহয় তারা পাঠ করেছে 'মুচি ও অদৃশ্য মানুষের কাহিনী!'

হাওড়া স্টেশন, হাওড়া স্টেশন!

প্রশান্তের মনে হল, এতক্ষণ নরকভোগের পর এইবার সে এল স্বর্গে! সেই লোকটা বা দীনদা গাড়ি থেকে নেমে কুলি ডাকলে।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎবর্তী অনুগত ছায়ার মতো নামল প্রশান্ত। এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল যে, হাত বাড়ালেই শিকার হবে হস্তগত।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে প্রশান্তকে দেখলে। বিরক্ত স্বরে বললে, 'মশাই যদি আর-একটু কম-ঘনিষ্ঠ হন তাহলে খুশি হব।'

প্রশান্ত দাঁত বার করে নির্লজ্জ হাসি হাসলে, মুখে কিছু বললে না।

পিছনে রোল উঠল, 'রাম নাম সত্য হায়'—সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েগলায় কান্না! অর্জুনদাস আগরওয়ালার শবদেহ নিয়ে মাড়োয়ারিরা চলে গেল।

এমন সময়ে বড়োসাহেব এসে হাজির—সঙ্গে একদল পুলিসের লোক।

দীনদার দৃষ্টি হল সচকিত। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে গেল।

প্রশান্ত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দীনদা বললে, 'পথ ছাড়ুন। আপনার মতন অসভ্য লোক আমি আর দেখি নি।'

—'আপনার নাম কি?'

দীনদা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'বলব না!'

প্রশান্ত বললে, 'নাম বলুন আর নাইই বলুন, আপাতত আমার সঙ্গে আপনাকে একটু বেড়িয়ে আসতে হবে।'

—'কেন? আমাকে কি গ্রেপ্তার করতে চান? পরোয়ানা কই?'

—'আপাতত আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। খালি আমাদের সঙ্গে আসতে বলা হচ্ছে।'

—'আমি যদি না যাই?'

—'আপনাকে যেতেই হবে।'

—'একি অত্যাচার!'

এমন সময় একদল হিন্দুস্থানি সেইখানে এসে দাঁড়াল। তারা হচ্ছে, পাটনা স্টেশনের সেই দল—প্রশান্ত যাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিল কলকাতার তিনজন পুরাতন পাপীকে। তাদের ভিতর থেকে একজন পালোয়ানের মতন লোক বেরিয়ে এসে শুধোলে, 'কি হয়েছে দীনবাবু?'

—'পুলিসের পাল্লায় পড়েছি।'

প্রশান্ত বড়োসাহেবের কানে কানে বললে, 'স্যার, নাম শুনলেন তো? দীনুবাবু! ও লোকগুলো হচ্ছে গুণ্ডা—দীনুর দলের লোক!'

বড়োসাহেব ভিড় সরাবার হুকুম দিলেন।

প্রশান্ত বললে, 'দীনুবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে অপদস্থ হবেন, না আমার সঙ্গে আসবেন?'

—'বেশ, চলুন।'

অরুণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভয়ানক হতভম্বের মতন দৃশ্যটা দেখছিল।

প্রশান্ত আবার বড়োসাহেবের কানে কানে বললে, 'স্যার, ওই হচ্ছে দীনুর বন্ধু অরুণ! ওকেও কি এইসঙ্গে নিয়ে যাব?'

বড়োসাহেব চোখ ফিরিয়ে অরুণকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'ওর বিরুদ্ধে নতুন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?'

—'না স্যার!'

বড়োসাহেব বললেন, 'তবে থাক। ওর কথা পরে ভাবা যাবে।'

অরুণ বুঝলে এবারে শনির দৃষ্টি পড়েছে তারই উপরে। সে কেমন অস্বস্তি বোধ করলে। আস্তে আস্তে পা চালিয়ে দিলে অন্যদিকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দীনবন্ধুর পত্র

পরদিন বৈকালে এই পত্রখানি প্রশান্তের হস্তগত হল ঃ

'শ্রীমান প্রশান্ত মজুমদার

সমীপেষু

ভায়া, পাটনার ডাক্তার দীনদয়াল দত্তকে তুমি দীনবন্ধু বলে চালিয়ে দিতে ও ধরে রাখতে পারলে না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।

মানিকচাঁদের মুখে তুমি আমার চেহারার বর্ণনা পেয়েছ? তাহলে তোমার ভ্রম-সংশোধনের জন্যে শুনে রাখো, দীনবন্ধুর আসল চেহারার বর্ণনা দুর্লভ। কারণ আমি এক-এক অভিযানে বহির্গত হই এক-এক নূতন ছদ্মবেশে।

আমি পাটনায় ছিলুম না, ছিলুম মোগলসরাইয়ে। তবে চিঠিখানা ডাকে দেওয়া হয়েছিল পাটনা থেকেই। এ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল তোমাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে অব্যাহতিলাভের জন্যেই। আর আমার প্রেরিত পত্রখানা যে তোমাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি, যথাসময়ে টেলিগ্রামে সে গুপ্তকথাও আমি জানতে পেরেছিলুম।

কিন্তু তোমরা বোধহয় এখনও আবিষ্কার করতে পারোনি যে, আমি তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছি?

অর্জুনদাস আগরওয়ালা বলে কলকাতায় কেউ আছে কিনা জানি না।

কিন্তু তারই নামধারণ করে খাটিয়ার উপরে মৃতদেহের মতন শুয়ে আমার জীবন্ত দেহ কলকাতা শহরে প্রবেশ করেছে।

পুলিসের চীনের প্রাচীর কখন, কোথায়, কেমন করে ভেদ করতে হয়, তোমাদের চেয়ে সে জ্ঞান আছে আমার বেশিমাত্রায়।

হাওড়া স্টেশনে খাটে শুয়ে আমি যখন তোমাদের পাশ দিয়ে আসছিলুম, তখন তোমার শ্রীমুখের বচনামৃত পর্যন্ত আমার কর্ণগোচর হয়েছে।

চেষ্টা করো, চেষ্টা করো,—আরও চেষ্টা কর! চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ভগবানও ধরা দেন। আমিই বা তোমার হাতে ধরা দেবনা কেন? চাঙ্গা হও, চেষ্টা কর!

দীনবন্ধু'

নীলপত্রের রক্তলেখা

প্রথম

নীলপত্রের প্রথম আবির্ভাব

যবনিকা ওঠবার আগে 'প্রোগ্রামে' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের চিনিয়ে দেবার নিয়ম আছে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বোধ করি ও-নিয়ম না মানলেও অনিয়ম হবে না।

কারণ, এবারে আমরা বলতে বসেছি দীনুডাকাতের তৃতীয় কীর্তির কথা। যাঁরা 'মায়ামৃগের মৃগয়া'য় এবং 'বজ্র আর ভূমিকম্পে' দীনুডাকাত ওরফে বরুণ, তার বন্ধু অরুণ, তাদের বিশ্বস্ত অনুচর শ্রীধর এবং দীনু বা বরুণের কাছে বারবার পরাজিত গোয়েন্দা প্রশান্ত চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে ও-লোকগুলির আর নূতন পরিচয়ের দরকার কি?

—'দীনুডাকাতের কীর্তি' হচ্ছে চীনে-নাটকের অভিনয়ের মতো। সাধারণত চীনে-নাটকের আকার হয় প্রকাণ্ড। এত প্রকাণ্ড যে, একদিনে তার সমগ্র অভিনয় সম্ভবপর হয় না। তাই চীনে-নাটকের অভিনয় হয় ক্রমশ। প্রথম দিনে এক অংশের অভিনয়ের পর যবনিকা পড়ে। দ্বিতীয় দিনে দেখানো হয় আর এক অংশ। তারপর দিনে-দিনে তার অন্যান্য অংশের অভিনয় চলতে থাকে—পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এবং দর্শকদের কাছে প্রথম দিনের পর নাটকের প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রীগণকে বারবার পরিচিত করবার আবশ্যক হয় না। কারণ, দর্শকরা সকলকেই চেনে।

আমরাও আশা করি, দীনুডাকাতের এই কীর্তিকাহিনী জানবার জন্যে যাঁরা আজ উৎসুক হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় তার প্রথম ও দ্বিতীয় কীর্তির সঙ্গে অপরিচিত নন। অতএব চেনা বামুনের পইতের দরকার কি?

গোয়েন্দা প্রশান্তের সঙ্গে দীনু বা দীনবন্ধু ওরফে বরুণের শেষ দেখা—তমলুকে। সেখানে দীনবন্ধু কি ভাবে প্রশান্তের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেছিল, 'বজ্র আর ভূমিকম্পে'র পাঠকরা নিশ্চয়ই সে কথা এরই মধ্যে ভুলে যাননি? এও বোধহয় সকলের মনে আছে যে, নীল কাগজে, লাল কালিতে চিঠি লিখে সে প্রশান্তকে জানিয়েছিল—এইবারে আমি আবার ঘটনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব?

তারপর থেকে প্রশান্ত প্রতিদিন দেখতে আরম্ভ করেছে সেই ভয়াবহ সম্ভাবনার দুঃস্বপ্ন!

সর্বদাই তার সন্দেহ হয়, জনসমাজে আবার তাকে অপদস্থ করবার জন্যে দীনু না-জানি কোন অভিনব ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে বসেছে।

দীনুডাকাত কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রশান্ত উঠে-পড়ে কোমর বেঁধে লেগে গেল।

কিন্তু দীনু যেন জলাভূমির আলেয়া! দীনু যেন মেঘলা আকাশের বিদ্যুৎ! দীনু যেন মরু প্রান্তরের মরীচিকা! আচম্বিতে স্বেচ্ছায় দেখা দেয়, ধরা দেয় না!

সর্বক্ষণই তার মনে হয়, দীনু তার চোখের আড়ালে আছে বটে, সে কিন্তু দীনুর চোখের আড়ালে নেই! সে কি করছে না-করছে সমস্তই দীনুর নখদর্পণে! দীনু তার পিছনে-

পিছনে আছে অদৃশ্য ছায়ার মতো! গোয়েন্দার পক্ষে এমন অনুভূতি কেবল অস্বস্তিকর নয়, অপমানকরও বটে! সে যেন একান্ত অসহায়!

প্রশান্ত দিকে দিকে চর পাঠিয়ে দিলে, দীনুকে আবিষ্কার করবার জন্যে। কিন্তু দিনের পর দিন তারা একই খবর নিয়ে ফিরে আসে—উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে কোথাও দীনুর টিকি দেখবার জো নেই। অথচ প্রশান্তের দৃঢ়বিশ্বাস, দীনু আছে এই কলকাতার মধ্যেই।

অরুণের কথা প্রশান্ত ভোলেনি। সে নিশ্চিতরূপেই জানে যে, দীনু ওরফে বরুণ তার বন্ধু ও সাহিত্যিক অরুণকে কোনোদিনই ত্যাগ করতে পারবে না। কলকাতায় থাকলে সে অরুণের বাড়িতে পদার্পণ করবেই।

অতএব অরুণের বাড়ির চারিদিকে বসল পুলিসের কড়া পাহারা।

ছদ্মবেশধারণে দীনু যে কি-রকম কৌশলী শিল্পী, সেটাও প্রশান্তের অজানা নেই। দীনু যে কতবার কতরকম আশ্চর্য ছদ্মবেশের মধ্যে নিজের আসল চেহারা লুকিয়ে তার সুমুখে এসে তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, এ কথা কি প্রশান্ত কোনোদিন ভুলতে পারবে? দীনুর প্রকৃত স্বরূপ কি, তাও দেখবার সুযোগ সে কোনোদিনই পায়নি। কাজেই অরুণের বাড়িতে যারা আনাগোনা করে তাদের মধ্যে কে যে দীনু আর কে যে দীনু নয়, সেটা বোঝবার কোনোই উপায় নেই। তাই যে কোনও লোক অরুণের বাড়িতে ঢোকে, পুলিসের সন্দেহ তারই উপরে গিয়ে পড়ে। গুপ্তচররা পিছনে পিছনে আঠার মতন লেপটে থাকে, এবং যতদিন না তাদের সমস্ত পরিচয় ভালো করে জানা না যায় ততদিন তারা অব্যাহতি পায় না পুলিসের অশুভদৃষ্টি থেকে।

সেদিন প্রশান্ত রাস্তা দিয়ে আসছে, হঠাৎ অরুণের সঙ্গে দেখা।

অরুণ তাকে দেখেও যেন চিনতে পারলে না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে।

অরুণের এমন ব্যবহারের কারণ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতির রাখতে গেলে, গোয়েন্দাগিরি চলে না। অতএব প্রশান্ত হনহন করে এগিয়ে গিয়ে অরুণের পথরোধ করলে। হাসিমুখে বললে, 'এই যে অরুণবাবু, নমস্কার!'

—'নমস্কার।'

—'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

—'দুনিয়ায় এমন সব জীবও আছে, যাদের চিনতে পারা নিরাপদ নয়।'

—'আমার ওপরে বড্ডই রেগেছেন দেখছি।'

—'সেটা কি অস্বাভাবিক?'

—'আমি তো তাই ব'লি।'

—'আপনি যা বলেন, আমার কাছে তা বেদবাক্য নয়।'

—'কেন?'

—'আবার জিজ্ঞাসা করছেন! আপনার অত্যাচারে আমার আর আমার আত্মীয়স্বজন

বন্ধুবান্ধবদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এখন সকলেই আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে ভয় পায়। আমি কি ক্রিমিন্যাল, যে পুলিসপাহারার মধ্যে আমাকে জীবনযাপন করতে হবে?'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়! রাম রাম, আপনাকে নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। যারা পদ্য লেখে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।'

—'তাহলে দয়া করে নির্দয় হয়ে আমার মতন তুচ্ছ ব্যক্তিকে ত্যাগ করলেই বাধিত হব।'

—'তাও সম্ভব নয়।'

—'কেন মশাই?'

—'কেন, তাও বলতে হবে? দীনুডাকাত যে প্রায়ই আপনার এখানে হাওয়া খেতে আসে, একথা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না?'

—'ওই অছিলায় আপনি কি আমার বাড়ির মশা-মাছিকেও দীনু বলে সন্দেহ করবেন?'

—'অরুণবাবু, বহুরূপীবিদ্যায় দীনু যে কতবড়ো ওস্তাদ, এ পরিচয় কি আমি পাইনি? কবে, কখন, কোন বেশে দীনু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে, কেমন করে আমি জানতে পারব বলুন?'

—'প্রশান্তবাবু, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করবেন?

—'কেন করব না?'

—'তাহলে শুনে রাখুন, বরুণ আজকাল আর আমার বাড়িতে আসে না।'

—'কেন? আপনার সঙ্গে কি তার ঝগড়া হয়েছে?'

—'না।'

—'তবে?'

—'আমি তাকে আমার বাড়িতে আসতে মানা করে দিয়েছি।'

—'কারণ?'

—'পুলিসের টিকটিকিদের কবল থেকে মুক্তি পাব বলে।'

—'দীনু আপনার কথা রাখবে?'

—'আমার বিশ্বাস, রাখবে।'

—'শুনে সুখী হলুম। আচ্ছা মশাই, নমস্কার!'

অরুণ প্রতিনমস্কার করে চলে গেল।

প্রশান্ত চলতে চলতে ভাবতে লাগল, অরুণ সত্য কথা বললে কি না? যদি সত্যকথা বলে থাকে, তাহলে এ এক দুঃসংবাদ! অরুণের বাড়িতেই একদিন-না-একদিন দীনুকে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ মিলবে ভেবে সে কতকটা আশ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু এখানেও যদি তার পাত্তা পাওয়া না যায়—

ধাঁ-করে তার মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল এক দারুণ সন্দেহ!

দীনু অরুণের বাড়িতে আসবে না, মানলুম। কিন্তু অরুণ তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে অনায়াসেই বন্ধু-সম্ভাষণ করে আসতে পারে!

হয়তো আজই সে বেরিয়েছে দীনুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে!

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি ফিরে দেখলে, অরুণ বিডন বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে। সেও পায়ে পায়ে অগ্রসর হল। বাগানের ভিতরে ঢুকল। প্রথমে অরুণের সন্ধান মিলল না। খানিক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, একখানা বেঞ্চির উপরে বসে অরুণ একটি প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছে।

প্রশান্ত আরও কয়েক পা এগিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। ভদ্রলোকের বয়স পঁইষট্টির কম হবে না। মাথায় বড়ো-বড়ো সাদা চুল, সাদা দাড়ি-গোঁফ, চোখে কালো কাচের চশমা।

প্রশান্তের মন হয়ে উঠল চাঙ্গা। পাকা চুল, পাকা গোঁফ-দাড়ি, রঙিন চশমা—এ-সব হচ্ছে সন্দেহজনক বস্তু। ছদ্মবেশধারীরা প্রায়ই এইসব জিনিসের সাহায্যগ্রহণ করে! তদন্ত করা দরকার।

হঠাৎ অরুণ মাথা তুলে তাকে দেখতে পেলে। প্রথমে তার মুখে-চোখে ফুটল বিরক্তির ভাব, তারপরেই সে হো হো করে হেসে বলে উঠল, 'আরে, প্রশান্তবাবু যে! এখনও আমার মায়া কাটাতে পারেননি?'

প্রশান্ত অপ্রস্তুত হবার ছেলে নয়। এগুতে এগুতে হাস্যমুখে বললে, 'আপনার মায়ার টানে এখানে আসিনি অরুণবাবু! সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু বায়ুসেবন করতে এসেছি।'

—'বেশ করেছেন, খুব ভালো করেছেন। পবিত্র বায়ুর মতন জিনিস আর নেই। করুন—প্রাণপণে বায়ুসেবন করুন!'

অরুণের কণ্ঠস্বরে চাপা ব্যঙ্গের ইঙ্গিত। সে নিশ্চয় তার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে। কিন্তু সেসব গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে প্রশান্ত বেঞ্চির উপরে বসে পড়ল।

প্রাচীন ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অরুণ, তুমি বন্ধুর সঙ্গে কথা কও। আমি এখন উঠি।'

কী মুশকিল, শিকার পালায় যে! মুহূর্তে মৌখিক ভদ্রতার মুখোস ত্যাগ করে প্রশান্ত বললে, 'সে কি মশাই, এখনই উঠবেন? আর একটু বসুন না! খাসা হাওয়া বইছে!'

সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির মুখে এ রকম ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণ শুনে ভদ্রলোক অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে নীরবে প্রশান্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

প্রশান্ত নির্লজ্জের মতন হাসতে হাসতে বললে, 'মশাই কি রাগ করলেন?'

—'রাগ করিনি, বিস্মিত হয়েছি।'

—'কেন?'

—'আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই, অথচ—'

—'অরুণবাবু ইচ্ছা করলেই আমাদের পরিচিত করে দিতে পারেন।'

—'কিন্তু আপনার পরিচয় জানবার ইচ্ছা আমার নেই।'

রীতিমতো অপমানকর উক্তি। প্রশান্ত তবু দমল না, বললে, 'কিন্তু আমি মশাইয়ের পরিচয় জানতে পারি কি?'

অরুণ হাসির উচ্ছ্বাস দমন করতে করতে বললে, 'ওঁর পরিচয় আমি দিতে পারি প্রশান্তবাবু!'

—'ভালো কথা।'

—'প্রথমত, উনি দীনুডাকাত নন।'

—'আমিও কি তা বলছি?'

—'দ্বিতীয়ত, ওঁর নাম সুরেন্দ্রমোহন সেন।'

—'নমস্কার, সুরেনবাবু!'

—'তৃতীয়ত, উনি হচ্ছেন আমার পিসেমশাই।'

—'ও!'

—'চতুর্থত, উনি আপনারই শ্রেণীভুক্ত।'

—'অর্থাৎ?'

—'পুলিসের লোক।'

—'পুলিসের লোক?' প্রশান্তের স্বর সচকিত।

—'হ্যাঁ, একসময়ে উনি পুলিসের লোকই ছিলেন। উনি ছিলেন ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট। এখন অবসর গ্রহণ করেছেন।'

প্রশান্ত ঘাড় হেঁট করে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল।

সুরেনবাবু বললেন, 'অরুণ, তোমার এই বন্ধুটি পুলিসের কোন বিভাগে কাজ করেন?'

—'গোয়েন্দা-বিভাগে। ওঁর নাম প্রশান্ত চৌধুরী। আসলে উনি নির্বোধ নন, কিন্তু দীনুডাকাতের গন্ধ পেলেই ওঁর সব বুদ্ধিসুদ্ধি কর্পূরের মতন উপে যায়। উনি আপনাকে ভেবেছিলেন ছদ্মবেশী দীনুডাকাত।'

সুরেনবাবু অট্টহাস্য করে বললেন, 'প্রশান্তবাবু, আমাকে দেখলে—ডাকাত বলে মনে হয় নাকি?'

প্রশান্ত নতমুখে হাত জোড় করে বললে, 'আমাকে মাপ করবেন।'

—'মাপ করবার কথা নয় মশাই, হাসবার কথা। আজ আপনি যে হাসির খোরাক জোগালেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ! অতঃপর আমাকে বিদায় হবার হুকুম দিন!'

—'হুকুম? আর লজ্জা দেবেন না।'

সুরেনবাবু হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

প্রশান্ত করুণ স্বরে বললে, 'অরুণবাবু, এই কি আপনার উচিত হল?'

—'কি?'

—'আমাকে এমন ভাবে অপদস্থ করা?'

—'আমি আপনাকে অপদস্থ করলুম!'

—'তা নয়তো কি? প্রথমেই আপনি সুরেনবাবুর পরিচয় দিতে পারতেন!'

—'সে সময় আপনি দিয়েছিলেন কি? আপনি যে এসেই রক্ত নিশান দেখে ক্ষিপ্ত ষণ্ডের মতন আমার পিসেমশাইকে আক্রমণ করলেন!'

—'আপনার পিসেমশাই? মিথ্যাবাদী!'—এই বলে হঠাৎ চীৎকার করে প্রশান্ত লাফিয়ে উঠল এবং জনতাপূর্ণ উদ্যানের চারিদিকে উদ্ভ্রান্তের মতন তাকাতে লাগল।

—'কি ব্যাপার প্রশান্তবাবু? সত্যি-সত্যিই ক্ষেপে গেলেন নাকি?'

—'ক্ষেপিনি, এইবারে ক্ষেপব!' প্রশান্ত বেঞ্চির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

অরুণ বিস্ফারিত চক্ষে দেখলে, বেঞ্চির একপ্রান্তে পড়ে রয়েছে একখানা নীলরঙের খাম!

হতভম্বের মতন বললে, 'ওখানে ওখানা কেমন করে এল?'

—'আপনার সাজানো পিসেমশাই রেখে গিয়েছেন!' এই বলে প্রশান্ত তাড়াতাড়ি খামখানা তুলে নিয়ে দ্রুত পদচালনা করবার উপক্রম করলে।

তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে অরুণ তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'কোথা যান?'

—'আপনার পিসেমশাইকে ধরতে! এখনও সে বাগান থেকে বেরুতে পারে নি।'

—'প্রশান্তবাবু, যেচে নিজের অপমানকে ডেকে আনবেন না।'

—'পথ ছাড়ুন আপনি!'

—'উনি সত্যিই আমার পিসেমশাই! এবারে ওঁকে বিরক্ত করলে উনি নিশ্চয়ই আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আপনি বিপদে পড়বেন!'

—'তাহলে এই নীল চিঠি এখানে কেমন করে এল?'

—'এতক্ষণে একটা কথা মনে পড়ছে। সুরেনবাবুর পরিচয় পেয়ে আপনি যখন স্তম্ভিত, সেইসময়ে একজন লোক বেঞ্চির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল।'

—'সেদিকে তখনই আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেননি কেন?'

—'সরকারি বাগান, কত লোক আসছে যাচ্ছে উঠছে বসছে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কে সকলের দিলে লক্ষ্য রাখে?'

অরুণের কথা প্রশান্তের মনে লাগল। খামের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে বললে, 'সেই নীল কাগজ, লাল কালিতে আমার নাম লেখা। দীনুর মার্কামারা চিঠি! আশ্চর্য! সে কেমন করে জানলে, আমি এখানে থাকব?'

অরুণ বললে, 'মশাই, আপনি যেমন দীনুর জন্যে চারিদিকে চর পাঠিয়েছেন, দীনুও তেমনি আপনার গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রাখবার জন্যে চর নিযুক্ত করতে পারে, এত-বড়ো সহজ কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

প্রশান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এমন ধড়িবাজ আর দেখিনি, আমাকে জ্বালিয়ে মারলে! আমি তাকে খুঁজে পাই না, সে কিন্তু আমাকে ঠিক খুঁজে পায়!...... আবার নীল চিঠি! নিশ্চয় আবার কোনও নতুন বিপদের বার্তা!'

অরুণ বললে, 'চিঠিতে কি আছে তা জানবার আগ্রহ হচ্ছে।'

—'মাপ করতে হল, আপনার আগ্রহ নিবারণ করব না। এ চিঠি আমি বাড়িতে গিয়ে একলা পড়ে দেখব। নমস্কার!'

দ্বিতীয়

নীলপত্রের আত্মকাহিনী

বাড়িতে ফিরে প্রশান্ত নীলপত্র খুলে পাঠ করলে ঃ

'অশান্তভায়া (রাগ কোরো না; জানো তো তোমাকে অশান্ত বলেই ডাকতে ভালোবাসি?)'

আমি তোমার দেবতা, আর তুমি আমার ভক্ত সাধক,—কেমন, তাই নয় কি? আমাকে দেখবার আর লাভ করবার জন্যে তুমি যে কি কঠোর সাধনাই করছ, আমার তা অজানা নেই। বৎস, তোমার সাধনায় আমি প্রীত হয়েছি। এইবারে তোমাকে দেখা দেব।

দেবকীচরণ পালের নাম শুনেছ তো? যুদ্ধের বাজারে গরিবদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে সে কোটিপতি হয়েছে। ব্ল্যাক মার্কেটেও তার মতন অসাধু ব্যবসায়ী খুব কমই আছে। তোমরাও অনেকবার চেষ্টা করে তাকে আইনের পাকে বাঁধতে পারোনি।

দু-বছর আগেও দেবকীচরণের সম্বলের মধ্যে ছিল একখানা ছোটো মুদির দোকান। তার গা থাকত আদুড়, পায়ে ছিল না জুতো, আর ময়লা বা আধ ময়লা কাপড় হাঁটুর নিচে নামত না।

এই দেবকীচরণ আজ কলকাতায় পাঁচখানা প্রাসাদের মতন মস্ত বাড়ির মালিক, তার মোটর আছে চারখানা আর বড়ো বড়ো কারবার আছে কত রকম তার সঠিক হিসাব দেবার সময় নেই। আসল কথা, সে এখন অনেক রাজা-মহারাজার চেয়ে ধনী লোক।

এই সেদিন সে ছিল দরিদ্র। কিন্তু টাকার কাঁড়ির উপরে আসন পেতে এর মধ্যেই দরিদ্রদের ভুলে গিয়েছে। কলকাতার রাজপথের ধূলিশয্যায় আজ অনাহারে মৃত দরিদ্রদের রাশি রাশি শবদেহ এবং অনাহারে মৃতকল্প হাজার হাজার চলন্ত কঙ্কালের হাহাকার, কিন্তু বাবু দেবকীচরণ সাজানো বৈঠকখানায় পুরু গদির উপরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নির্বিকার ভাবে বসে, সুখে স্তিমিত চোখে রূপোর নলে তাম্রকূট সেবন করেন। কোনও গরিবই তার কাছ থেকে মুড়ি কেনবার জন্যে একটি আধলাও চেয়ে পায়নি। বুভুক্ষু জ্যান্তো মড়ারা তাঁর ফটকের সামনে গিয়ে যদি সক্রন্দনে আবেদন জানায়—'ওগো, একটু ফেন খেতে দাও'—অমনি আমাদের হঠাৎ-বাবুজির গালপাট্টাওয়ালা ডাল-রুটি-চোট্টা দ্বারবানরা হই-হই রবে তেড়ে গিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করে!

এই দেবকীচরণকে আমি কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে চাই। অবশ্য, তাকে একেবারে ফতুর করবার সুযোগ ও ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের ছিন্ন বস্ত্রের গ্রন্থি খুলে যে সোনা-রূপোর পাহাড় সে তৈরি করেছে, আমি তারই কতক অংশ কেড়ে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে আবার বস্ত্রহীন অন্নহীন আশ্রয়হীন হতভাগ্যদের মাঝখানে ছড়িয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ, আইনের সাহায্যেও তোমরা যাকে স্পর্শ করতেও পারো নি, বেআইনির দ্বারা আমি তাকে যতটা পারি শাস্তি দেবার চেষ্টা করব।

হে অসাধুর শত্রু! বুঝতেই পারছ, আমি অসাধু নই। কিন্তু তোমাদের তথাকথিত

আইনের ধারায় সাধুতার যেসব লক্ষণ আছে, আমার ব্যবহারের সঙ্গে সেগুলো মিলবে না বলে তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। অন্তত মনে মনে আমাকে সমর্থন করলেও দাসত্বের মানরক্ষার জন্যে তোমরা দীনবন্ধু দীনুডাকাতকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করবার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠবে! কেমন, তাই নয় কি?

উত্তম! তোমাদের পতঙ্গবুদ্ধিকে ব্যর্থ করবার জন্যে মাতঙ্গদীনবন্ধু চিরদিনই প্রস্তুত।

আগামী কল্য রাত্রি একটার পর আমি শ্রীমান দেবকীচরণের বসতবাড়িতে আবির্ভূত হব। আপাতত এর বেশি আর কিছু বলতে রাজি নই।

তুমি তোমার দেবতাদীনবন্ধুর দেখা পাবার আশায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছ। তোমার এই উন্মত্ততার জন্যে আমার একমাত্র বন্ধু অরুণের জীবন ভারবহ হয়ে উঠেছে—এও আমি জানি।

অতএব তোমাকে দেখা দেবার তারিখ ও সময় আগে থাকতেই জানিয়ে রাখলুম। কিন্তু যদিও তোমার সাহায্যের জন্যে রাজশক্তি ও বিপুল পুলিসবাহিনী প্রস্তুত হয়েই আছে, তবু তোমাদের কাছে তুচ্ছ এই দীনবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি? দেখা যাক।

ইতি
দীনবন্ধু

চিঠিখানা হাতে করে প্রশান্ত গভীর চিন্তায় মিমগ্ন হল।

এই ট্রেন-ট্যাক্সি ফোন-টেলিগ্রাফ-বেতার-এরোপ্লেন-ইলেকট্রিকের যুগে দীনু ডাকাতি করতে চায় সেকালের বিশুডাকাতের মতন! সে খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করে! না, এক হিসাবে সে বিশুরও চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বিশু খবর পাঠাত যার বাড়িতে হানা দেবে তাকেই। কিন্তু দীনু খবর পাঠায় খোদ পুলিসের কাছে!

কিন্তু এ খবরে মন আমার আহ্লাদে নেচে উঠছে না! এর মধ্যে কোনও গভীর অর্থ আছে বলেই সন্দেহ হচ্ছে। হয়তো আমাকে কোনও নতুন প্যাঁচে ফেলবার ফিকির!

আর একবারও সে আমাকে ডাকাতির সঠিক তারিখ জানিয়েছিল।* ফলে আমাকে পরিণত হতে হয়েছিল একটি আস্ত গর্দভে! সে প্রায় আমার চোখের উপরই ডাকাতিও করলে—সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দিলে ফাঁকি!

আমাকে খবর পাঠিয়ে আবার উদারতা প্রকাশ করা হয়েছে! শঠ, ধূর্ত, শয়তান! নিশ্চয় এ হচ্ছে দেশ ও দশের মাঝখানে আমার গালে চুনকালি মাখাবার নূতন চেষ্টা! যে ইঁদুর একবার ফাঁদে পড়ে, সে কি আর কখনও ফাঁদের দিকে ফিরে তাকায়? আমি তো ইঁদুরের চেয়ে অধম জীব নই! আর কি আমি ভুলি বাবা?

যথাসময়ে যথাস্থানে যথাযথ আয়োজন করে আমি যে উপস্থিত থাকব সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। দীনু যখন মুখশাবাশি করে খবর পাঠিয়েছে, তখন নিজের মুখরক্ষার জন্যে ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হবেই। তার কোনও প্যাঁচেই আমি আর অন্যমনস্ক হব না। দেখি, বাঘের ঘরে ঢুকে এবারে হরিণ কেমন করে পালায়?

---

* 'মায়ামৃগের মৃগয়া' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে কেন? বাঁ চোখটাইবা এত নাচছে কেন? আবার কি দীনু আমার উপরে টেক্কা মারবে?

ধেৎ, অসম্ভব! চোর নাকি নিজে যেচে আমার নাগালের ভিতরে এসে দাঁড়াবে, আর এত লোকজন নিয়ে আমি তাকে ধরতে পারব না? তাও কখনও হয়? এবারকার বাজি আমি মারব, মারব, মারবই! হে মা কালী, আর আমাকে ছলনা কোরো না, আমি জোড়া পাঁঠা মানছি!

তৃতীয়

দেবুমুদি

প্রশান্ত সত্যি সত্যিই কালীঘাটে গিয়ে মা কালীকে পুজো দিলে।

ভক্তিভরে মায়ের চরণামৃত পান করে এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরে মনের ভিতরে যেন একটা দৈবশক্তি অর্জন করলে।

মা কালীর লকলকে সোনার জিভের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে, 'মাগো, তোমার আশীর্বাদ নিয়ে চললুম। এবারে এসপার কি ওসপার! এবারেও যদি চরণে ঠেলো মা, জোড়াপাঁঠাতেও তোমার পেট না ভরে, তাহলে কালীনামের নিন্দে হবে মা, নিন্দে হবে!'

মন্দিরের বাইরে আসবার পর হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল।

আচ্ছা, শুনি তো ডাকাতদের বড়ো দেবতা হচ্ছেন কালীঠাকরুণ! দীনুও যদি আজ কালীপুজো করে থাকে, আর একজোড়ার বদলে দিয়ে থাকে দুজোড়া পাঁঠা বলি, মা কালী কি তাহলে তার প্রতিই হবেন বেশি সদয়?

যদিও আমি হচ্ছি সাধু, আর পামর দীনু হচ্ছে ছার চোর, তবু বলা তো যায় না! পৌরাণিক দেব-দেবীগুলি হচ্ছেন বড়োই খামখেয়ালি, তাঁদের বরে পাপিষ্ঠ অসুররা কতবার স্বর্গ থেকে অন্যান্য দেবতাদেরই গলাধাক্কা দিয়েছিল, সেসব ইতিহাস কে না জানে?

দোহাই মা কালী, অন্তত এবারে আর দীনুর দিকে ঢোলো না, কার্যসিদ্ধি হলে আমার কাছ থেকে আরও দু-জোড়া পাঁঠা উপহার পাবে!

মা কালীকে নূতন লোভ দেখিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশান্ত গেল দেবকীচরণের বাড়িতে।

দেবকীচরণের ছোটোখাটো গোলগাল দেহখানি যেন ফুটবলের বৃহত্তর সংস্করণ। মাথার আধখানায় টাক, আধখানায় খোঁচা খোঁচা চুল—যেন মরুভূমির সীমান্তে জন্মেছে কন্টকঅরণ্য!

সম্প্রতি তার কুচকুচে কালো রঙের উপরে বিপুল বিক্রমে ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ সাবানের আনাগোনা শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু তবু সেই বহুবর্ষব্যাপী তৈলপক্ক চামড়ার তেলচকচকে ভাবটা কিছুতেই আর ঘুচতে চায় না!

এত তাড়াতাড়ি বড়োলোক হয়ে এখনও নিয়মিত ক্ষৌরকার্য সমাধা করবার অভ্যাস

হয়নি, তাই তার গালে ও দাড়িতে ছড়ানো রয়েছে কাঁচা-পাকা কেশের অঙ্কুর। চোখদুটি ছোটো-ছোটো, কিন্তু চটুল চড়াইপাখির মতন চঞ্চল এবং তাতে মাখানো রয়েছে যেন কাকচক্ষুর চালাকির ভাব। অধিকাংশ জীবন কেটে গিয়েছে তার মুদির দোকানের খরিদ্দারদের মন রাখতে রাখতে, কাজেই মুখের উপর থেকে এখনও পরম অনুগত দ্যাখন-হাসির ভাবটুকু লুপ্ত হবার সময় পায়নি।

হাতের কব্জিতে তার সোনার হাতঘড়ি, দুই হাতের আঙুলে গোটাপাঁচেক হীরা ও অন্যান্য দামি পাথর বসানো আংটি, পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবিতে মুক্তোর বোতাম, পরনে জরিপাড় কোঁচানো মিহি কাপড়, পায়ে ইয়ং কোম্পানীর শৌখিন চটি।

টাকা অত্যন্ত সুলভ হলে যতটা মূল্যবান ও জমকালো সাজসজ্জা করা সম্ভব, তার কিছুরই ক্রটি হয়নি, কিন্তু ভগবানের এমনি মার যে, তবু ময়ূরপুচ্ছের ভিতর থেকে প্রকাশ্য ভাবে উঁকি মারছে দাঁড়কাকের স্বরূপটি।

অকস্মাৎ অর্থ দিয়ে কেউ আভিজাত্য ক্রয় করতে পারে না, আভিজাত্যকে আনে কতকটা জন্ম ও আবহ এবং প্রধানত শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি।

প্রশান্ত সকৌতুকে দেবকীচরণের এই বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করতে লাগল। মনে মনে বললে, দেবকীর সর্ব্বস্ব চুরি গেলেও আমার মনে কিছুমাত্র সহানুভূতির সঞ্চার হবে না। দীনু যদি আগে এর লোহার সিন্দুক সরিয়ে ফেলে আমার হাতে ধরা দিত, তাহলেই আমি হতুম বেশি খুশি!

কিন্তু কোনও পুলিসকর্মচারিরই মুখ ফুটে এমন কথা বলবার অধিকার নেই, তাই বাইরের ভদ্রতার ও নিজের কর্তব্যের খাতিরেই সেদিনকার দেবুমুদিকে আজ সে 'দেবকীবাবু' বলেই ডাকতে বাধ্য হল।

দেবকী প্রথমটা ধনীসুলভ গর্বিত গাম্ভীর্যের ভাবটা বজায় রাখবার চেষ্টা করলে। মস্ত বড়ো কেওকেটার মতন ভালো করে প্রশান্তের দিকে নজরই দিলে না। জিজ্ঞাসার জবাবও দিতে লাগল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তারপরেই কুবিখ্যাত দীনুডাকাতের নাম ও তার সাংঘাতিক অভিপ্রায়ের কথা শুনেই ধনীর ভূমিকায় অভিনয় করবার সকল শক্তিই তার বিলুপ্ত হয়ে গেল। খসে পড়ল সিংহের চামড়া—বেরিয়ে পড়ল গর্দভমূর্তি।

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সোফা থেকে নেমে একেবারে প্রশান্তের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'হুজুর মা-বাপ! আমাকে রক্ষে করুন!'

দেবুমুদি নিজের মূর্তি ধরেছে দেখে প্রশান্তও মনে-মনে হেসে দেবকীনাথের সঙ্গে এতক্ষণ যে সম্ভ্রমসূচক 'বাবু' উপাধিটি ব্যবহার করছিল, সেটিকে তুলে নিয়ে করলে অত্যন্ত আরাম বোধ!

বললে, 'ওঠো দেবকী, ওঠো! এখন খোকার মতন আকুল হবার সময় নয়!'

দেবকী দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বললে, 'বলেন কি হুজুর! আকুল হব না? দীনুডাকাতের নাম শুনেই আমার হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে!'

—'মূর্খ! হাত-পা তোমার পেটের বাইরেই আছে। উঠে বোসো।'

দেবকী সক্রন্দনে বললে, 'ওরে বাবা, দীনুডাকাত! সে যে সর্বনেশে লোক গো!'

—'দীনুকে তুমি তো যেচেই নিজের বাড়িতে ডেকে আনতে চাও!'

—'আমি?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই!'

—'ওরে বাবা, এ আবার কি কথা!'

—'দীনু গুণী, দানী ধনীদের ওপরে অত্যাচার করে না। আমরা পুলিসের লোক, আমরা কি জানি না, কতটা অসৎ উপায়ে দুঃখীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আজ তুমি হঠাৎ-ধনী হয়ে উঠেছ? দেবকী, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই দুর্ভিক্ষের দিনে ক-জন সর্বহারার মুখে তুমি একটুখানি হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেছ?'

দেবকী মাথা নিচু করে বোকার মতন বসে রইল।

—'বুঝেছ বাপু? এই অপরাধেই দীনু তোমাকে শাস্তি দিতে আসবে।'

—'কসুর হয়ে গেছে হুজুর, বড্ড কসুর হয়ে গেছে! কিন্তু দীনুর সঙ্গে কি আমার একটা চুক্তি হয় না?'

প্রশান্ত বিস্মিত হয়ে বললে,—'চুক্তি! কিসের চুক্তি?'

—'দীনু যদি আমার বাড়িতে আজ না আসে, তাহলে কাল থেকে রোজ আমি পঞ্চাশজন করে গরিবকে পাতা পেতে খাওয়াব। আর এই হপ্তার মধ্যেই দুঃখীদের জন্যে পাঁচ হাজার টাকার বস্ত্রদান করব!'

—'ও, মরণকালে তুমি হরিনাম করতে চাও? কিন্তু বাপু, চোরে-কামারে দেখা নেই, চুক্তি হবে কেমন করে? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কে?'

—'হুজুরের কথা বুঝতে পারছি না।'

—'বলি, দীনু তো আজ একেবারে আসবে 'যুদ্ধং দেহি' বলে, তার আগে তোমার চুক্তির কথা শোনাতে যাবে কে?'

দেবকীর মুদিবুদ্ধি এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। খানিকক্ষণ হতাশভাবে মাথা চুলকে বললে,—'হুজুর কি কোনোরকমে কথাটা দীনুডাকাতের কানে তুলে দিতে পারেন না?'

—'আমি?' প্রশান্ত হেসেই অস্থির! 'গাড়ল কোথাকার! আমি যদি দীনুর ঠিকানা জানতুম, তাহলে সে কি আজ এখানে আসতে পারত?'

—'তবে আমার কি হবে হুজুর?'

—'ওসব বাজে কথা যেতে দাও। শোনো। তোমার বাড়িতে টাকাকড়ি কি আছে?'

—'আজই ব্যাঙ্ক থেকে নগদ তিন লক্ষ টাকা তুলে এনেছি।'

—'কেন?'

—'কাল একটা জরুরি কাজের জন্যে দরকার।'

—'টাকা কোথায় রেখেছ?'

—'শোবার ঘরে লোহার সিন্দুকে!'

—'হুঁ। দীনু তোমার সব খবর রাখে দেখছি।'

—'কি করে হুজুর, কি করে?'

—'খুব সম্ভব তোমার চাকর-বাকরদের দলে দীনুর চর আছে।'

—'ও বাবা, বলেন কি? এখুনি আমি সব ব্যাটাকে দূর করে দেব!'

—'এখন তাতে আর বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। দীনু যা জানবার তা জেনেছে।'

—'তাহলে টাকাকড়ি সব নিয়ে এখুনি আমি পালিয়ে যাব।'

—'আমি তোমাকে পালাতে দেব না।'

—'দেবেন না হুজুর?'

—'উঁহু, কিছুতেই না। আমি চাই তোমার টাকার লোভে দীনু আজ এখানে আসুক!'

দেবকী হতভম্ব বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে লাগল।

—'আমি চাই দীনু আসুক, আর আমি তাকে গ্রেপ্তার করি।'

—'হায় হুজুর, রাজায় রাজায় যুদ্ধু হয় আর উলুখড়ের প্রাণ যায়!'

—'এখানে পুলিসপাহারায় থাকলে প্রাণ তোমার যাবে না। বরং পালাতে গেলেই মরবে।'

—'অ্যাঁঃ!'

—'দীনুর নজর সব দিকে। পালিয়েও বাঁচতে পারবে না। সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।'

—'সঙ্গে সঙ্গে যাবে হুজুর?'

—'আলবত!'

—'ইস, তবে আমি পালাব না।'

—'এই হল সুবুদ্ধির কথা।'

—'মরতে যদি হয়, বাড়িতেই মরা ভালো।'

—'মরবে কেন? দীনু কারুকে প্রাণে মারে না। বড়োজোর তোমার তিনলাখ টাকা লোপাট হবে।'

—'তাহলেও আমি মারা পড়ব। অত টাকার শোক সামলাতে পারব না।'

—'ভয় নেই, বাড়ির ভিতরে-বাইরে থাকবে দলে দলে পুলিস।'

—'হুজুর, দীনুকে যে ধরতে পারবে, আমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।'

—'সে কথা পরে হবে। তোমার বাড়িতে ফোন আছে?'

—'আছে হুজুর।'

—'কোথায় আছে দেখিয়ে দাও। এখনই আমাকে থানায় ফোন করতে হবে।'

চতুর্থ

দীনুডাকাতের কণ্ঠস্বর

গভীর রাত্রি। নিবিড় তিমিরের অতল কোলে শুয়ে নগরী পড়েছে ঘুমিয়ে।

নিষ্প্রদীপ কলিকাতা, জাপানি বোমাকে ফাঁকি দেবার জন্যে খুলে রেখেছে হাজার-নরী আলোর হার।

আলোকের অভাবে বাদলের পতঙ্গরা যেমন অদৃশ্য হয়, শহুরে মানুষরাও তেমনি করেছে অন্ধকার রাজপথকে পরিত্যাগ।

অনেক উপরে তারকার চিকে-ঘেরা নিশ্চন্দ্র আকাশ নিঃশব্দ-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে নিস্তব্ধ ধরিত্রীর দিকে।

উপরওয়ালাদের দৃষ্টি আজ অন্ধ জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে রাতের পাহারাওয়ালারা রোয়াকে-রোয়াকে লম্বমান হয়ে স্বপ্নদেবীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে নাসিকার ভেঁপু বাজাতে শুরু করে দিয়েছে।

দেবকীর মস্ত বাড়ির অন্যান্য ঘরে এখন কি হচ্ছে জানি না, কিন্তু একটি ঘরের দৃশ্য বেশ দেখতে পাচ্ছি!

মাঝখানে একটি বড়ো টেবিল। তার একপাশে রয়েছে টেলিফোনযন্ত্র এবং তার সামনে রয়েছে একখানা চেয়ার। সেই চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট প্রশান্ত। উপর থেকে একটি ঘোমটাপরা আলোর রেখা এসে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে।

প্রশান্ত আজ অত্যন্ত জাগ্রত। ঘুমকে করেছে দস্তুরমত বয়কট। এমনকি, তন্দ্রার একটু ঢুলুনি পর্যন্ত আমলে আনতে রাজি নয়।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালে। একটা বাজতে দশ মিনিট। দীনু বলেছে, একটার পর ডাকাতি করতে আসবে। একটার পর কখন? বলা তার উচিত ছিল! একটার পরে আছে দুটো—না দুটোর পরে সে আসবে না নিশ্চয়! তাহলে বলত, 'দুটোর পরে আসব!'

অতএব বোঝা যাচ্ছে, দীনু আসবে একটা থেকে দুটোর মধ্যেই। তবে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না! শেষরাতে একটু গড়াবার সময় পাওয়া যাবে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সে আসবে কি?

প্রশান্তের সন্দেহ হতে লাগল। প্রথমত, দীনু হচ্ছে চোর, গুণ্ডা, ডাকাত। তার কথায় বিশ্বাস কি? দ্বিতীয়ত, প্রশান্তকে হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা হচ্ছে তার মজ্জাগত! কেবলমাত্র তাকে হয়রান কররার জন্যেই সে হয়তো চিঠিখানা লিখেছে।

এই কথা ভেবেই প্রশান্ত বড়োই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। দীনুর সবচেয়ে বদ স্বভাব হচ্ছে, পুলিসকে নাকাল করবার পর গাঁটের কড়ি খরচ করে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে সেই খবর হাড়-জ্বালানো ভাষায় সবাইকে জানিয়ে দেয়। আর তাই শুনে সারা বাংলা—খালি বাংলা কেন—গোটা ভারতবর্ষ—হয়তো ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত—বিপুল কৌতুকে অট্টহাস্য করতে থাকে!

আধুনিক যুগের ডাকাত স্থান-কাল-পাত্র আগে থাকতে পুলিসকে জানিয়ে ডাকাতি করতে চায়, আর পুলিসও সেই খবর বিশ্বাস করে সাত ঘাটের জল খেয়ে ও সর্বাঙ্গে কাদা মেখে 'গর্দভত্বে'র পরিচয় দেয়! এর চেয়ে হাসির ব্যাপার আর কি থাকতে পারে?

দীনু আজ আসবে না—এই বিশ্বাস প্রশান্তের মনে যখন রীতিমতো সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে, হঠাৎ টেলিফোনযন্ত্র বেজে উঠল ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং!

এত রাত্রে কে ফোন করে? থানার কেউ নাকি? প্রশান্ত রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে, 'হ্যালো।'

—'হ্যালো, অশান্তবাবু আছেন?'

প্রশান্তের চোখ-মুখ চমকে উঠল। 'অশান্ত' বলে তাকে ডাকে কেবল এক ব্যক্তি! হয়তো কানের ভুল হয়েছে ভেবে বললে, 'কাকে খুঁজছেন?'

—'অশান্তকে। অশান্ত চৌধুরীকে।'

অপ্রসন্ন কণ্ঠে প্রশান্ত বললে, 'এখানে অশান্ত চৌধুরী বলে কেউ নেই।'

—'আপনার নাম কি?'

—'প্রশান্ত চৌধুরী।'

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হাস্য-গুঞ্জন ভেসে এল।

—'আরে বাঃ! আমি যে আপনাকেই খুঁজছি।'

ক্রুদ্ধস্বরে প্রশান্ত বললে, 'আমার নাম অশান্ত নয়।'

—'কিন্তু বন্ধু, আমি যে ওই নামেই তোমাকে ডাকতে ভালোবাসি! অশান্ত, অশান্ত, অশান্ত,—আহা, কি মিষ্টি নাম রে!'

প্রশান্ত বহুকষ্টে নিজের কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা দমন করে বললে, 'কে তুমি?'

—'দীনু। অর্থাৎ দীনবন্ধু। অর্থাৎ বরুণ।'

প্রশান্তের হৃৎপিণ্ডের তাল হয়ে উঠল দ্রুত। বললে, 'তুমি দীনুডাকাত?'

—'গোলাম হাজির।'

—'বটে? তুমি কি ফোনে আমার কাছে হাজিরা দিতে চাও?'

—'উঁহু!'

—'তবে এর মানে কি?'

—'অত্যন্ত স্পষ্ট।'

—'স্পষ্টই বটে!'

—'নয়? তুমি কি ঝাপসা দেখছ? রাত জাগার ফলে চোখের সামনে নাচছে সর্ষেফুল?'

—'মোটেই নয়। ব্যাপারটা বুঝেছি।'

—'ছাই বুঝেছ।'

—'ঠিক বুঝেছি।'

—'কি বুঝেছ?'

—'বুঝেছি, চিঠি লিখে তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছ! নেহাৎ বাজে ধাপ্পা! দস্তুরমতো অভদ্র ধাপ্পা!'

—'ওঃ, তাই নাকি?'

—'তা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বেশ জানতুম, এখানে আসবার সাহস তোমার হবে না।'

—'তবে জড় ভরতের মতো, একচক্ষু হরিণের মতো ওখানে স্থির হয়ে বসে আছ কেন?'

—'ভুলেও তুমি সত্য কথা বলো কিনা দেখবার জন্যে।'

আবার কৌতুকহাসির সাড়া! সে হাসি যেন আর থামতেই চায় না!

রাগে প্রশান্তের শরীর করতে লাগল রি রি! মনে তার প্রচণ্ড বাসনা জাগল, যাদুমন্ত্রবলে এখনই শব্দতরঙ্গে পরিণত হয়ে ফোনের তারের ভিতর দিয়ে উল্কাগতিতে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে দুরাত্মা দীনুর কণ্ঠদেশকে।

আবার প্রশ্ন ঃ 'অশান্ত, তুমি নিজেকে কি বলে মনে কর?'

—'তুমি আমাকে যা মনে কর, তাই।'

—'অর্থাৎ?'

—'নিরেট গাধা বলে।'

—'স্বীকার করছ তাহলে?'

—'উপায় কি? গাধা না হলে কেউ চোর-জোচ্চোর ডাকাতের কথায় বিশ্বাস করে?'

—'তাহলে তুমি বুঝেছ ঘোড়ার ডিম।'

—'ঠিক! অসাধুর মুখের 'সত্যকথা' আর ঘোড়ার ডিম দুইই যে সমান অলীক, আজ আমি এইটেই বুঝলুম। তবে আর এ প্রহসনের দরকার কি? তুমি তো আসবে না?'

—'ও কথার জবাব দেবার আগে আমি তোমাকে আর একটা শুভ-সংবাদ দিতে চাই।'

—'এর পরেও শুভ-সংবাদ?'

—'হ্যাঁ, এর পরেও। নিয়তিচক্র সর্ব্বদাই ঘুরে যাচ্ছে—কখনও আনে অশুভ, কখনও শুভ।'

—'দার্শনিক হবার চেষ্টা ছেড়ে দাও। সোজা কথায় বলো, ব্যাপারটা কি?'

—'মতিলাল আগরওয়ালার নাম শুনেছ?'

—'সেদিন ওই-নামধারী এক ব্যক্তি পুলিস কোর্টে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হয়েছে।'

—'হ্যাঁ, সেই মতিলাল।'

—'তারপর?'

—'জানো তো, শ্রীমান দেবকীচরণের মতন মতিলালও চোরা-বাজারের আর-এক মস্ত ব্যবসাদার? রাজপুতানা থেকে তিনি এসেছেন বাংলার ক্ষুধিতদের অন্ন হরণ করতে।'

—'জানি।'

—'আর খানিকক্ষণ পরেই যাতে মতিলালবাবু কাবু হন, আমি এখন সেই চেষ্টাতেই নিযুক্ত আছি।'

—'মানে?'

—'আজ মতিলালই আমার প্রধান শিকার।'

—'তুমি ওখানে ডাকাতি—'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাকাতি—অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় ডাকাতি! আমার ভাষা—অসাধুর টাকা নিয়ে দীনদরিদ্র নারায়ণদের সেবায় ব্যয় করাকে ডাকাতি বলে স্বীকার করে না। দেবকীচরণ তো হাতের মুঠোতেই আছে, আর তুমি কিছু হাওয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবার ছেলে নও—আজ আমার প্রথম লক্ষ্য মতিলাল আগরওয়ালা!'

প্রশান্ত রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কখন ওখানে যাবে?'

—'সময় সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে।'

—'তাহলে তুমি আজ আমার সামনে আসবে না?'

—'তোমার মাথায় গাধায় বুদ্ধি না থাকলে আজকেই অনায়াসে আমার দেখা পেতে পারো। মনে রেখ, মতিলাল আগরওয়ালা—বাড়ি তার বালিগঞ্জে!'

—'ধূর্ত, শয়তান! তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়ে এইখানে ব্যস্ত রেখে, বালিগঞ্জে গিয়ে কাজ হাসিল করতে চাও? এতক্ষণে বুঝলুম আসল ব্যাপারটা!'

আবার কৌতুকহাসির ধ্বনি! এক-একটা হাসির টুকরো যেন আগুনের টুকরোর মতন প্রশান্তের কানের ভিতরে ঢুকতে লাগল। সে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে বললে, 'যদি সাহস থাকে তাহলে বলো, কখন তুমি মতিলালের বাড়িতে যাবে?'

—'তোমার বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি!'

—'বলবে না?'

—'না। তুমি কি আমার প্রাণের বন্ধু?'

—'আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি মতিলালের ওখানে। দেখি, তোমার কত সাধ্য!"

—'এসো। আমি তোমাকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।'

—'ভারি যে স্পর্দ্ধা! মতিলালের বাড়িতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আর-একবার ওই কথা বলতে পারবে?'

টেলিফোনে আর জবাব এল না।

প্রশান্ত দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বললে, 'দীনু!'

টেলিফোন নীরব। দীনুডাকাত ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

প্রশান্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দীনু তাহলে তাকে ভয় করে! তাকে বিপথে বাজে কাজে ব্যস্ত রেখে তার চোখের আড়ালে নিরাপদে বসে কেল্লা ফতে করে আবার অন্ধকারে ডুব মারতে চায়! হ্যাঁ, দীনু তাকে ভয় করে! এও একটা আত্মপ্রসাদ!

কিন্তু এ আত্মপ্রসাদের মূল্য কতটুকু? লোকে তো বলবে, কৌশলে তাকে বোকা বানিয়ে দীনু নিজের কার্যোদ্ধার করেছে! দীনু পাবে বাহাদুরি, আর তার ভাগ্যে লাভ শুধু অপযশ!

মতিলালের বাড়ি বালিগঞ্জে। এখান থেকে নিশুত রাতের জনশূন্য শকটহীন পথে জোরে মোটর চালিয়ে গেলে সেখানে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগবে না। খুব সম্ভব, দীনুর আগেই বা তার সঙ্গে-সঙ্গেই সে মতিলালের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে। হয়তো দীনু এখনও তার হাতের নাগালের মধ্যেই আছে!

প্রশান্ত চিৎকার করে ডাকলে, 'দেবকী? দেবকী?'

ক্ষীণ সাড়া এল, 'যাই হুজুর!'

—'শীগগির এসো! দৌড়ে!'

দেবকী দৌড়ে এল না, এল রীতিমতো মন্থর চরণে। তার দৌড়োবার ক্ষমতা নেই। তার মুখ ফ্যাকাসে। তার চোখের চঞ্চলতা ও চাতুর্য লুপ্ত হয়েছে। ভয়ে সে আধমরা। তার ধারণা, দীনুডাকাতের আবির্ভাব হয়েছে।

প্রশান্ত অধীর কণ্ঠে বললে, 'আরে গেল, চলতে পারছ না কেন? তোমার হল কী?'

—'হুজুর!'

—'রাখো তোমার হুজুর-হুজুর! শোনো যা বলি। আমরা এখন চললুম।'

—'বলেন কি হুজুর? হাড়িকাঠে আমাকে বেঁধে রেখে আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন?'

—'না হে মুখ্যু, না। আমরা চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু পালাচ্ছি না।'

—'পালানো আর কাকে বলে হুজুর?'

—'আর জ্বালিয়ো না দেবকী, আমাদের বিশেষ তাড়া আছে। দীনুডাকাত আজ আর আসবে না।'

এতবড়ো খবর শুনেও দেবকী কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয়েছে বলে বোধ হল না। অবিশ্বাসের স্বরে বললে, 'কেমন করে জানলেন?'

—'যেমন করে হোক জেনেছি। তোমাকে অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। দীনুডাকাত আজ আর আসবে না, আমরা চললুম। এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে—যদিও তোমার মরাই উচিত ছিল!'

প্রশান্ত একরকম দৌড়েই ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ল।

দেবকী ঊর্ধ্বমুখে ফ্যালফেলে চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

অনেকক্ষণ পরে সে ক্ষীণ স্বরে বললে, 'পুলিস হচ্ছে ঘুষখোর। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দীনুর কাছে মোটা ঘুষ পেয়ে ওরা পথ ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল! আমি এখন কি করি রে বাবা? ওমা রক্ষেকালী, বলে দাও মা, আমি এখন কি করি?'

কিন্তু রক্ষেকালীর কাছ থেকে কোনও ভরসাই পাওয়া গেল না।

পঞ্চম

প্রশান্ত থ

প্রশান্ত সদলবলে চলল মোটর ছুটিয়ে! পথে বাধা পাবার মতন কিছুই ছিল না, কারণ নিদ্রা, নীরবতা এবং নির্জনতা এখন নগরব্যাপী। চারিদিক করছে খাঁ খাঁ।

বালিগঞ্জের মতিলাল আগরওয়ালার বাড়ি আজকাল কলকাতা পুলিসের কাছে সুপরিচিত। এই বাড়ির মালিক সম্বন্ধে নানা কানাঘুসা শোনা যায়। ইতিমধ্যেই তাকে

বারকয়েক আসামিরূপে পুলিসকোর্টে হাজির হতে হয়েছে। টাকার জোরে প্রত্যেক বারেই সে আইনের কোনও না কোনও ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে—যদিও শেষ বারে তাকে দিতে হয়েছে মোটা অর্থদণ্ড। কিন্তু পুলিস আশা করে, মতিলালের সামনে জেলখানার ফটক খুলতে আর বেশি দেরি নেই।

মতিলালকে বলির পশুরূপে নির্বাচন করে দীনু কিছুমাত্র ভুল করেনি। এজন্যে তার উপরে প্রশান্ত রাগ করতে চায় না। তার রাগের আসল কারণ হচ্ছে, দীনু কেন আজ দেবকীর বাড়িতে এসে তার সঙ্গে দেখা করলে না? ধাপ্পা মেরে কেন তাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলে?

মানুষ স্বার্থপর। যেখানে স্বার্থের গন্ধ, সেখানে সে অন্ধ। সেখানে তার চোখ আসল যুক্তিকে দেখতে পায় না। নইলে প্রশান্ত বুঝতে পারত, ডাঙার মানুষের পক্ষে জলের কুমীরের আমন্ত্রণ রক্ষা করা স্বাভাবিক নয়। মানুষের এই অনিচ্ছার জন্যে কুমির মুখভার করলেও উপায় নেই। আত্মরক্ষাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য।

মতিলালের ফটকের ভিতরে প্রবেশ করেই প্রশান্ত সবিস্ময়ে দেখলে, সেখানে পুলিসের লোকদের ভিড়। তার চিত্ত হল সচকিত। এখানে এমন সময়ে তার আগেই স্থানীয় পুলিস এসেছে কেন? তবে কি এর মধ্যেই হয়েছে দীনুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান? হা অদৃষ্ট!

প্রশান্ত গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ল। কে জিজ্ঞাসা করলে, 'প্রশান্তবাবু নাকি?'

—'হ্যাঁ অসিতবাবু। ব্যাপার কি?'

—'এখানে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা নগদে আর গহনায় প্রায় দুই লাখ টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।'

—'দীনুডাকাত এসেছিল?'

—'তাইতো শুনছি। লোকটা আশ্চর্য চটপটে। ঠিক যেন ঘড়ি ধরে দশ মিনিটের মধ্যেই কাজ সেরে সরে পড়েছে। কিন্তু আপনাকে কে খবর দিলে?'

—'দীনুডাকাত।'

—'কি বললেন?'

—'আমাকে খবর দিয়েছে দীনু নিজে।'

—'দীনু নিজে আপনার কাছে খবর নিতে গিয়েছিল?'

—'সশরীরে নয়, টেলিফোনে।'

—'ওঃ, তাই বলুন! আপনার কথা শুনে আমি চমকে গিয়েছিলুম।'

—'কথা শুনেই চমকে যাচ্ছেন অসিতবাবু, কিন্তু দীনুর ভার যদি আপনার কাঁধে পড়ত, তাহলে আপনাকে আজ ডাক ছেড়ে কেঁদে বলতে হত—'হে ধরণী, দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি!' আর নয়, এইবারে আমাকে হাল ছাড়তে হবে দেখছি!'

—'সবুরে মেওয়া ফলে প্রশান্তবাবু, চোরের দশদিন—সাধুর একদিন!'

—'ওসব সেকেলে প্রবাদবাক্য আমার ভাগ্যে বোধহয় ফলবে না। দীনু খবর দিয়ে ডাকাতি করেও যখন বারবার পালাতে পারছে, তখন আর কোনও আশাই নেই।'

—'আশ্চর্য কথা বটে। খালি আশ্চর্য নয়, অসম্ভবও বলা যায়।'
—'হ্যাঁ। আশ্চর্য আর অসম্ভব—দুইই।'
—'দীনু আপনাকে কি খবর দিয়েছিল?'
—'আজ এখানে হানা দেবে।'
—'তবু আপনি তাকে ধরতে পারলেন না? এটাও আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে।'
—'যেখানে দীনু আছে সেখানে হয়তো আশ্চর্য বলে কিছুই নেই।'
—'কেন? সে তো অশরীরী নয়!'
—'তা নয়। তবে এই দেখুন না কেন, যে মুহূর্তে খবর পেয়েছি, তখনই বায়ুবেগে ছুটে এসেছি, তবু সে চম্পট দিয়েছে।'
—'আপনি খবর পেয়েছেন কখন?'
—'রাত একটার সময়ে।'
অসতি হো হো করে হেসে উঠল।
প্রশান্ত খাপ্পা হয়ে বললে, 'আপনার হাসি ভালো লাগছে না।'
—'মজার কথায় কে না হাসে?'
—'এটা মজার কথা হল বুঝি? দিব্যি মজায় আছেন দেখছি!'
—'মজার কথা নয়?'
প্রশান্ত আরও খাপ্পা হয়ে বললে, 'মজলুম আমি, আর আপনি দেখছেন মজা!'
—'দীনু আপনাকে খবর দিয়েছে একটার সময়ে। কিন্তু সে মতিলালের বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়েছে রাত বারোটা বাজবার আগেই।'
দারুণ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে প্রশান্ত বললে, 'কি বললেন?'
—'ডাকাতির পালা সাঙ্গ করবার পরই দীনু হয়েছে খবরদার। তবু আপনি তাকে পাবার আশায় এতটা পথ ছুটে এসেছেন!'
প্রশান্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উদ্ভ্রান্তের মতো। তারপরেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, দুটো বাজে-বাজে।
তারপর স্প্রিং-টেপা পুতুলে মতো হঠাৎ একলাফে মোটরে উঠে চিৎকার করে বললে, 'দেবকীর বাড়িতে! সবাই দেবকীর বাড়িতে চলো! জোরে চলো, উড়ে চলো, বুলেট-বেগে চলো!'
গাড়ি বোঁ করে বেরিয়ে গেল।
অসিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, প্রশান্তের মস্তিষ্ক হঠাৎ বিকৃত হয়ে গেছে কিনা?
গাড়ির অন্ধকারে প্রশান্তের মাথার ভিতর দিয়ে তখন খেলে যাচ্ছে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত! দীনুর নীলপত্র, টেলিফোনের কথা সবই ক্রমে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠছে! দীনু চিঠি লেখে, তার সঙ্গে কথা কয়,—এ কেবল তাকে বিপথে চালনা করবার জন্য। যেন প্রভুর মতন দীনু হুকুম দিচ্ছে, আর সে অনুগত ভৃত্যের মতন করে যাচ্ছে তার আদেশ পালন—না, তার অবস্থা

আরও খারাপ। ভৃত্যের তবু কিছু নিজস্ব ইচ্ছা আছে, তার যেন তাও নেই। সে যেন দীনুর হাতের দাবাখেলার বোড়ে। দীনু যেদিকে নিয়ে যাবে, তাকে যেতে হবে সেই দিকেই। দীনুকে ধরবে কি, সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তারই ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

না, এ ভাবে কাজ করলে তার গোয়েন্দাজীবনের উপর যবনিকা পড়তে দেরি হবে না। তাকে নিজের কার্যপদ্ধতি বদলাতে হবে।

নীলপত্রের ও ফোনের কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করে প্রশান্ত বুঝলে, দীনু সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেনি। সে যা বলে হয়তো তাইই করে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব কথা উহ্য রেখে যায়, যার সাহায্যে পুলিসের চক্ষে করে নিশ্চিত ভাবে ধূলিনিক্ষেপ।

ভবিষ্যতে প্রশান্ত সাবধান হবে। দীনুর প্রকাশ্য কথাগুলোকে অবিশ্বাস করবে না বটে, কিন্তু অনুমানের দ্বারা আবিষ্কারের চেষ্টা করবে, তার উক্তির কোথায় কোথায় উহ্য বা গোপন কথা আছে বা থাকতে পারে। এই লুকনো অকথিত উক্তিগুলোকে ধরতে পারলেই দীনুকে ধরা শক্ত হবে না।

কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা, এখন বর্তমানকে নিয়েই যে প্রশান্তের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সে যা ভয় করছে তা যদি সত্য হয়, তবে এই বর্তমানের ঠেলা সামলাতেই তার হবে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ

বিনা রিহার্সালে নাট্যাভিনয়

গাড়ি যথাস্থানে এসে দাঁড়াল। প্রশান্ত নেমে দুরুদুরু বুকে অগ্রসর হল, কিন্তু চলতে যেন তার পা আর সরছে না।

দেবকীর বাড়ির ভিতরে ঢুকেই সে উত্তেজনার সাড়া পেলে। উপরে-নিচে লোকজনের চিৎকার, ব্যস্ত পদে আনাগোনা। উঠানের উপরকার দালানে বসে কে কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে কাঁদছে, 'ওরে আমার কী হল রে, ওরে আমার সর্বনাশ হল রে, ওরে আমি আর বাঁচব না রে!'

প্রশান্ত এগিয়ে গিয়ে লোকটার মুখ দেখে বললে, 'দেবকী, কাঁদো কেন?'

দেবকী হাউমাউ করে বলে উঠল, 'অন্তিমকালে আর কি দেখতে এলেন হুজুর,—ওরে বাবা রে, মা রে, কীর হল রে!'

—'কি মুশকিল, হয়েছে কি তাই বলো না!'

—'হবে আর কি, আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে!'

—'তোমার টাকা চুরি গেছে?'

—'তিন-তিন লাখ টাকা গো, তিন-তিন লাখ টাকা! হায় হায় হায় হায়—ও হো হো হো, বুক বুঝি ফাটল গো!'

—'তাহলে দীনুডাকাত এসেছিল?'

—'দীনু এসেছে কি আমার যম এসেছে, কিছুই জানিনে রে বাবা! আমি দেখেছি কেবল হুজুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের!'

—'আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের!'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পুলিস—লালপাগড়ি—জমাদার—দারোগা!'

—'তোমার বাড়িতে আমি যাবার পর পুলিস এসেছিল?'

—'হ্যাঁ গো হুজুর!'

প্রশান্ত হতভম্বের মতন মাথা চুলকোতে এবং দেবকী আবার মড়াকান্না কাঁদতে শুরু করলে।

অনেক মাথা চুলকেও হদিস না পেয়ে প্রশান্ত বললে, 'দেবকী, আমার যাবার পর তুমি কি ভয়ে আবার থানায় খবর দিয়েছিলে?'

কান্না না থামিয়েই দেবকী মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালে, না, সে থানায় খবর দেয়নি।

—'পুলিস চলে গেল কখন?'

—'জানি না।'

—'যাবার সময়ে তারা জানিয়ে যায়নি?'

—'না।'

—'পুলিস এসে তোমায় কি বললে?'

দেবকী জবাব দেয় না, তখন দ্বিগুণ উৎসাহে কান্নায় নিযুক্ত।

এইবারে প্রশান্ত ধৈর্য হারালে। 'তোর নিকুচি করেছে' বলে দেবকীর দুই কাঁধ ধরে খুব জোরে বারকয়েক ঝাঁকানি দিলে।

দেবকী ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'আর নাড়া দেবেন না হুজুর গো! তাহলে প্রাণের যেটুকু এখনও ভেতরে আছে তাও ফুড়ুক করে বেরিয়ে যাবে!'

প্রশান্ত গর্জন করে বললে, 'কান্না থামাও! সব কথা খুলে বলো!'

দেবকী কোঁচার প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, 'হুজুর তো আমাকে অভয় দিয়ে চলে গেলেন। আমি কিন্তু মনের ভেতর থেকে কোনোই জোর পেলুম না। আজ ভোরে উঠেই একটা অপয়া কাকের মুখ দেখেছিলুম, ঠিক জানতুম একটা কিছু অমঙ্গল হবেই! বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, হঠাৎ অনেকগুলো জুতোর গটগট শব্দে চমকে উঠে দেখি, একদল লালপাগড়ির সঙ্গে একজন দারোগাবাবু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন—'

প্রশান্ত বাধা দিয়ে বললে, 'আমি যাবার কতক্ষণ পরে?'

—'মিনিট দশেক হবে।'

—'তারপর কি হল বলো।'

—'দারোগাবাবু আমাকে ডেকে বললেন, 'কি হে, তোমার নাম দেবকী'?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর!'

তিনি বললেন, 'দীনুডাকাত একটু পরেই আসবে!'

আমি তো প্রথমটা হকচকিয়ে গেলুম! তারপর আপনার কথা বললুম।

দারোগা হেসে বললেন, 'ও, অশান্ত চৌধুরীর কথা বলছ? সে বেটা নিরেট গাধা, বড়োসাহেব তাইতো আমাকে পাঠিয়ে দিলেন'—'

প্রশান্ত বাধা দিয়ে মারমুখো হয়ে চিৎকার করে বললে, 'কী! আমি 'বেটা'? আমি—'

দেবকী ভয়ে আঁতকে তাড়াতাড়ি জোড়হাতে বললে, 'আমি বলিনি হুজুর, সেই দারোগাবাবু—'

—'দারোগা, না ছাই! সেই রাসকেলই দীনুডাকাত! এতক্ষণে সব বুঝেছি!'

—'কি বললেন হুজুর? দারোগা দীনুডাকাত!'

—'হ্যাঁ! তোমার বাড়িতে পুলিস সেজে দীনু আর তার দলবল এসেছিল! বুঝতে পারলে হনুমান?'

এইবারে দেবকী দাঁত খিঁচিয়ে মূর্ছা যাবার চেষ্টা করলে। তার মুখ-চোখের ভাব দেখে প্রশান্ত পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জল আনিয়ে খানিকক্ষণ তার মাথায় ও মুখে ঝাপটা দিয়ে তবে তাকে কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করে তুলতে পারলে।

দেবকী আবার কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ওগো বাবা গো, দীনুডাকাত দারোগা কি গো! তবে কি আমি যমের সঙ্গে কথা কয়েছি নাকি গো!'

প্রশান্ত বললে, 'বাজে কান্না থামাও! এখন যা বলছিলে বলো।''

—'গলা যে শুকিয়ে যাচ্ছে হুজুর!'

—'তুমি যদি সব কথা না বলো দেবকী, তাহলে তোমার গলা শুকোবার আগেই আমি তোমার গলা টিপে ধরব।'

দু-তিনটে ঢোঁক গিলে দেবকী নাচার ভাবে আবার বলতে শুরু করলে ঃ

'দারোগাবাবু বললেন 'দেবকী, কোন ঘরে তোমার লোহার সিন্দুক আছে?'

আমি কিছু সন্দেহ করলুম না, দেখিয়ে দিলুম। ডাকাত যে পুলিস সাজবে, কেমন করে জানব হুজুর?

দারোগা বললেন, 'দেবকী, এইবারে তোমার বাড়ির সব লোকজন নিয়ে নিচের কোন ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে চুপটি করে বসে থাকো গে যাও। খবরদার, একটি টুঁ শব্দ কোরো না, কি বাইরে উঁকিঝুঁকি মেরো না।'

আমি বললুম, 'কেন হুজুর?'

দারোগা বললেন, 'দীনুডাকাতটা আস্ত খুনে। তোমাদের দেখতে পেলেই আগে কচুর মতন কুচিকুচি করে কেটে ফেলবে।'

আমি ভয়ে কাঠ হয়ে বললুম, 'কিন্তু আমার লোহার সিন্দুকে যে তিন লাখ টাকা আছে?'

দারোগা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা তবে এসেছি কেন? ও সিন্দুক রক্ষা করব আমরাই। এই দেখ আমার রিভলবার! দীনুডাকাত এলে গুলি মেরে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব! যাও যাও, দেরি কোরো না!'

আমাতে তখন আর আমি ছিলুম না, দারোগার কথামতো বাড়ির সবাইকে নিয়ে নিচের একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে রইলুম। মনে মনে ইষ্টদেবতাকে ডাকি আর ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপি। সে যে কী কাঁপুনি হুজুর, দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়ে খালি গায়ে বসে থাকলেও লোকে তেমনভাবে কাঁপতে পারে না।

এইভাবে খানিকক্ষণ যায়। কোথাও কারুর সাড়া কি শব্দ নেই! না দীনুর, না পুলিসের।

হঠাৎ ঘরের দরজায় ধাক্কা! ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই আর কি!

তারপরেই একটা চাকরের সাড়া পেলুম। সে বলছে, 'বাবু, পুলিস চলে গিয়েছে, বাইরের ফটক কি খোলা থাকবে?'

বিশ্বাস হল না। শুধোলুম, 'পুলিস চলে গিয়েছে কি রে?'

—'হ্যাঁ বাবু, গিয়েছে।'

—'নিজের চোখে দেখেছিস?'

—'হ্যাঁ বাবু।'

—'ডাকাতরা আসেনি?'

—'না বাবু, কোথায় ডাকাত?'

—'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি ফটক বন্ধ করে দে।'

অবাক হয়ে সাহসে ভর করে বাইরে এলুম। মনে কেমন সন্দেহ হল। ডাকাতরাই যে পুলিস সেজে এসেছে যদিও এটা আন্দাজ করতে পারলুম না, তবু ছুটে উপরের শোবার ঘরে ঢুকলুম।

—তারপর? ও হো হো হো! তারপর আর বেশি কি বলব হুজুর, সবই তো বুঝতে পারছেন! গিয়ে দেখলুম সিন্দুক খোলা, ভেতরে ছিল গহনাগাঁটির সঙ্গে তিনলাখ টাকা, স্বপ্নের মতো সব কোথায় উড়ে গিয়েছে, সিন্দুকের ভেতরে পড়ে আছে খালি একখানা খাম—'

প্রশান্ত প্রায় রুদ্ধস্বরে বললে, 'খাম?'

—'হ্যাঁ, একখানা নীলপত্রের খাম, তার ওপরে লাল কালিতে অশান্ত চৌধুরীর নাম লেখা।'

—'সে খাম তুমি খুলেছ?'

—'খাম খোলবার মতন মনের অবস্থাই আমার বটে! আমার তিন-তিন লাখ—'

—'কোথায় সে খাম? এখনই নিয়ে এসো।'

দেবকীর হুকুমে একটা বেয়ারা উপরে গিয়ে খামখানা নিয়ে এল।

প্রশান্ত খামখানা ছিঁড়ে বিস্ফারিতচক্ষে চিঠি পড়লে ঃ

'অশান্তভায়া হে,

মনের ভাবগতিক এখন কেমন? আমার পক্ষে নিশ্চয় আশাপ্রদ নয়? হয়তো এই মুহূর্তে আমাকে হস্তগত করতে পারলে তুমি হত্যাকারী হতেও নারাজ হবে না?

সন্দেহ হচ্ছে, আমাকে তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলে ভাবছ না। কিন্তু স্মরণ করো

সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সেই অমর উক্তি—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'! যুদ্ধক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সত্যকথা বলা অসম্ভব।

তবে আমার আগেকার পত্রে এবং টেলিফোনে আমি তোমাকে যুধিষ্ঠিরের চেয়েও সত্যকথা বলেছি। কেবল মাঝে মাঝে তোমাকে দু-একটা মনের কথা বলিনি এই মাত্র! হাঁদারাম, এটাও বুঝতে পারোনি, সব গোপন কথা কি পুলিসের টিকটিকিদের কাছে খুলে বলা যায়? তোমার পক্ষে না হলেও—আমার পক্ষে সেটা যথাসময়, ঠিক তখনই আমি মতিলাল এবং দেবকীর বাড়িতে গিয়েছি। বিশেষ, দেবকীর বাড়িতে আমি গিয়েছি ঘড়ি ধরে—ঠিক একটার পরে, অর্থাৎ যে সময় আমি যাব বলেছিলুম! তুমি যদি জেনেশুনেও যথাস্থানে হাজির না থাকো, সেটা আমার দোষ নয়! মূর্খ, গাধা, গোরু! কেন তুমি মতিলালের বাড়িতে আমাকে খুঁজতে গেলে? আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলুম, আজ রাত একটার পরে দেবকীর বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেন তুমি 'বুড়ি ছুঁয়ে' বসে রইলে না? কেন তুমি নতুন টোপ খেতে ছুটে গেলে?

তবে একটা কথা মানি। জানতুম, মতিলালের বাড়িতে আমি যাব শুনলে, তুমি কখনোই দেবকীর বাড়িতে আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। পাগলের মতন আলেয়ার আলোক ধরবার জন্যে লম্বা দৌড় মারবে বালিগঞ্জের দিকে।

দেখ অশান্ত, মনোবিজ্ঞানের অগুন্তি পুঁথি আমি খুব মন দিয়েই পড়ে দেখেছি। নর-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টাও করেছি যথেষ্ট। কি কৌশলে তুমি ভুলবে, আর কি কৌশলে ভুলবে অশিক্ষিত দেবকী, এসব জানতে আমার বাকি নেই।

একদিন নয়, দুইদিন নয়,—উপর-উপরি কয়েক দিন ধরে ধীরে ধীরে আমি এক অভিনব নাটকের পরিকল্পনা মনে মনে নিখুঁত করে গড়ে তুলেছি। স্থান কাল পাত্র—কিছুই ভুলে যাইনি। আমি আগে থাকতেই জানতুম, আমার পত্র নির্বোধের মনের উপরে কী ভাবে কাজ করবে এবং যথাসময়ে ফোনে কথা কইলে জনৈক গোয়েন্দা কি ভাবে উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠবে এবং তারপর কোনও হঠাৎ-বাবু ও একদামুদিকে অভিভূত করবার জন্যে কিরকম কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে!

এখন সগর্বে বলতে পারি, আমার পরিকল্পিত নাট্যাভিনয় হয়েছে ঠিক আমারই মনের মতন। নাট্যমঞ্চের প্রত্যেক অভিনেতা প্রবেশ ও প্রস্থান করেছে একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে, পার্ট না দেখেও কেউ তার পার্ট ভুলে যায়নি! তারা অভিনয়ও করেছে আমার নির্দেশ অনুসারে—যদিও আমি স্বশরীরে উপস্থিত থেকে একদিনও এই নাটকের রিহার্সাল দিইনি। আসলে এ-নাট্যাভিনয়ের রিহার্সালই হয়নি! অথচ কোনও নটই নিজের ভূমিকায় করেনি ভুল অভিনয়! এজন্যে তোমার কাছ থেকে আমি এক অভিনব অভিনন্দন দাবি করতে পারি। আমার সফলতা দেখে আমি নিজেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি। তুমি এত বোকা! ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন—যদিও ভগবানের উচিত নয় এতবড়ো গণ্ডমূর্খকে রক্ষা করা। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার জন্যে মানুষকে তিনি একটি অমূল্য নিধি দান করেছেন। তার নাম কি জানো? মস্তিষ্ক!......

যারা এই মস্তিষ্কের যথাব্যবহার করতে শেখে না, তাদের জন্যে তিনি দায়ি নন। তারা ভগবানের পরিত্যক্ত জীব। মানুষ নামের অযোগ্য তারা।

আর একটা কথা শুনলে তুমি বিস্মিত হবে। তোমাকে কোত্থেকে ফোন করেছিলুম সে ঠিকানা দেব না বটে, কিন্তু জেনে রেখো, আমি ফোন করেছিলুম দেবকীর পাড়াতেই বসে। তখন আমার এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে ছিল পুলিসের ইউনিফর্ম! (চেষ্টা করে দেখো, যদি সেই বাড়িটা আবিষ্কার করতে পারো।) কারণ আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতুম, ফোনে খবর পেয়েই তুমি পাগলা কুকুরের মতো কিভাবে কোথায় দ্রুত পদচালনা করবে!

ভয় অসাধুকেও করে সাধু। আমার ভয়ে হঠাৎ-ধনী দেবুমুদি আজ দাতা হবার সংকল্প করেছে। সে নাকি অন্ন এবং বস্ত্র বিতরণ করতে চায়! এ খবর আমি উপস্থিত না থেকেও কেমন করে পেলুম, সেকথা জিজ্ঞাসা কোরো না। কারণ আমি উত্তর দেব না। তবে দেবুমুদিকে অনায়াসে এইটুকু জানিয়ে রাখতে পারো, সে যদি অদূর-ভবিষ্যতে নিজের বাক্য রক্ষা করে, তাহলে আর কখনও তার প্রতি আমার নির্দয় 'দয়া' বৃষ্টি করব না। আমি জানি, এখনও সে বহু লক্ষ টাকার মালিক। কিন্তু সে যদি কথা না রাখে, তাহলে আবার তার সঙ্গে আমার দেখা হবে এবং তারপর হবে তার টাকার গর্ব একেবারেই চূর্ণ!

পত্র দীর্ঘ হয়ে গেল, আর নয়। তোমার পরাজয় তুমি তুষ্ট মনে গ্রহণ কোরো—কারণ তুমি শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছ। পরে হয়তো আবার দেখা হবে। ইতি

দীনবন্ধু'

সপ্তম

প্রশান্ত খুনি নন, খুনিদের যম

নিষ্প্রদীপ নিশীথিনীর বুকচাপা অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতা এখন সদ্যজাগ্রত আলোকের ঝর্নাধারায় স্নান করছে।

এই মরুর মতন শুষ্ক বিরাট ইষ্টকস্তূপের মুল্লুকে নিরালা বনভূমির শ্যামল আশীর্বাদ নেই, কিন্তু তবু এখানেও হয় বিহঙ্গদের সঙ্গীতছন্দে নির্মল প্রভাতের অভ্যর্থনা এবং নীলাম্বরের পূর্বতোরণ খুলে দেয় নিত্য নূতন রংমহলের ইন্দ্রধনুস্বপ্ন। এবং যাদের রসিক চোখ আর মন আছে, তারা এই বিশ্রী হট্টশালাতেই বসে ষড়ঋতুর আকাশব্যাপী নাট্যশালার দিকে দিকে দেখতে পায় কত নব-নব চিত্রকাব্যের বিচিত্র মহোৎসব!

কিন্তু এদিক দিয়ে দেখলে আমাদের প্রশান্তগোয়েন্দার কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছুই আশা করা যাবে না। তার চোখ আর মন কোনোকালেই 'রসিক' উপাধিলাভের লোভে ব্যস্ত হয়নি। রামা-শ্যামাদের মতন সেও চাঁদকে কেবল 'চাঁদ' এবং আকাশকে কেবল 'আকাশ' বলে ডেকেই তুষ্ট হয়, তাদের মধ্যে যে আরও কিছু ভাববার বোঝবার দেখবার আর উপভোগ করবার বস্তু থাকতে পারে, এটা কোনোদিনই খেয়ালে আনবার সময় পায় না।

যাক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। লোকে কবির কাছ থেকেই আশা করে কবিতা এবং পুলিসের কাছ থেকে আশা করে বড়োজোর চোখরাঙানি, হুমকি এবং রুলের গুঁতো।

সুতরাং আজ সকালে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে প্রশান্ত যে সোনালী সূর্যকরের স্বচ্ছ সৌন্দর্যের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করলে না, এজন্যে আমাদের বিস্মিত হবার দরকার নেই।

বিশেষত এখন তার মনের অবস্থাও কাব্যাহত হবার উপযোগী নয়। কারণ মাত্র তিন দিন আগেই দুষ্ট দীনুডাকাত তাকে কেবল নাকে দড়ি দিয়ে টানাটানি করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু তাকে দস্তুরমতো ঠকিয়ে একই রাত্রে মতিলালের ও দেবকীর বাড়িতে দুটো বড়ো বড়ো ডাকাতি করে তার মাথা লুটিয়ে দিয়ে গিয়েছে পথের ধুলোয়।

শুধু কি তাই? আজ ভোরে উঠে প্রশান্ত খবরের কাগজ পড়তে বসে স্থিরচক্ষে দেখলে, তার সে রাত্রের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী ছাপার হরফের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল ভাবে ও ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ....আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে বসে সে শুনতে পেলে দেশব্যাপী হো হো হাসির হররা!

কাগজখানা তখনই ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে রাস্তায় এসে হাঁক দিলে—'রিক্সা! রিক্সা!'

ঠুন ঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে এক রিক্সাওয়ালা তার সামনে ছুটে এল। লোকটা আধাবয়সী, জোয়ান; কিন্তু তার একটা চোখ নেই!

—'আইয়ে বাবুজি!'

—'যা ব্যাটা, পালা! তোর ডান চোখ কানা—যদি ওপাশ থেকে মোটর-টোটর ঘাড়ে এসে পড়ে, কিছুই দেখতে পাবি নে!'

—'কুছ ডর নেহি বাবুজি, উঠিয়ে!'

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় রিক্সার দেখা না পেয়ে অগত্যা সে এই একচক্ষু সারথিকেই অবলম্বন করতে বাধ্য হল। কিন্তু সারথির ডান চক্ষুর অভাবটা যথাসম্ভব পূরণ করতে করতে চলল নিজের সতর্ক দক্ষিণ চক্ষুর সাহায্যে; সুতরাং কোনও মোটরই তার অজ্ঞাতসারে এসে তাকে চাপা দেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে না।

অরুণের বাড়ির সুমুখে এসে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। রিক্সাকে অপেক্ষা করতে বলে প্রবেশ করল বাড়ির ভিতরে।

বৈঠকখানায় বসে অরুণ খবরের কাগজ পড়ছিল। তাকে দেখেই ফিক করে হেসে ফেললে।

প্রশান্ত মুখ ভার করে বললে, 'বুঝেছি—বুঝেছি! ছিঃ অরুণবাবু!'

—'এসেই ধিক্কার দিতে শুরু করলেন যে!'

—'অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও আমার সামনে আজ আপনার গম্ভীর হয়ে থাকা উচিত ছিল।'

—'হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু কি করব বলুন, আমার গাম্ভীর্যও আজ আমার হাসিকে দমন করতে পারলে না।'

আসন গ্রহণ করে প্রশান্ত বললে, 'কাগজের রিপোর্টে আমার যে ছবি দেখেছেন, ওটা কি আমার ফোটো বলে মনে হয়?'

—'হয় না নাকি?'

—'না। ও হচ্ছে আমার ক্যারিকেচার। রীতিমতো আপত্তিকর ক্যারিকেচার। মানহানির মামলা আনলে আমি জিতে যাব।'

—'তা হয়তো যাবেন, কিন্তু লোকে আরও জোরে হাসবে। হেসে হেসে লোকের গলা ভেঙে যাবে।'

—'জানি। তাই মামলা আনবার লোভ আমাকে সংবরণ করতে হবে।'

—'শ্রীধর, প্রশান্তবাবুকে চা খাওয়াও।'

—'আমি চা খেতে আসিনি।'

—'তবে কি আদেশ বলুন।'

—'আমি এসেছি অভিযোগ করতে।'

—'অভিযোগ! কার বিরুদ্ধে?'

—'দীনুর বিরুদ্ধে।'

—'দীনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছেন আমার কাছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি আশ্চর্য! আমি কি দীনুর অভিভাবক?'

—'না। কিন্তু আপনি হচ্ছেন দীনুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আমি বেশ জানি, আপনার কাছে যা বলব তা দীনুর কানে উঠবে।'

—'আপনার কথা আমি স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করছি না। কিন্তু আপনার কথা শুনতে আমি রাজি আছি।'

—'কথা হচ্ছে, দীনু আর আমি হচ্ছি প্রতিদ্বন্দ্বী। মানি। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি আর-একটু ভদ্রভাবে করা যায় না? আমার তরফ থেকে নয়, দীনুর তরফ থেকে?'

—'ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলুন।'

—'দীনুর কাজ—ডাকাতি করা, আমার কর্তব্য তাকে ধরা। সে ডাকাতি করে চলে গেল। তারপর খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গেলুম। তদন্তের পর আমি চেষ্টা করে দেখব, তাকে ধরতে পারব কিনা। সোজাসুজি ব্যাপারটা এই ছাড়া আর কিছু নয় তো?'

—'ওই বটে।'

—'কিন্তু দীনু কি করছে? প্রায়ই চিঠি লিখে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে—অমুক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে অমুক সময়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব! এর অর্থ কি? সে কি আত্মসমর্পণ করতে চায়?'

—'বিড়ালের কাছে ইঁদুর কোনোদিন আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে বলে শুনিনি।'

—'হুঁ। তবে এই চিঠির চালাকির অর্থ কি?'

—'ওই যা বললেন, তাই।'

—'কি বললুম?'

—'ওই যে বললেন, চালাকি। হ্যাঁ, ওটা দীনুর চালাকিই বটে।'

—'আহা, এই চালাকির মানে কি বলুন না!'

—'দীনু আপনাকে একটু খ্যাপাতে চায় আর কি!'

—'খালি খ্যাপাতে নয় মশাই, দীনু চায় আমাকে নাচাতে আর আমাকে দিয়ে লোক হাসাতে।'

—'হয়তো তাই।'

—'তাতে তার লাভ?'

—'শত্রুকে হাস্যাস্পদ করতে চায় না কে?'

—'এর ফলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে।'

—'আপনার মতন শত্রু পথ থেকে সরে গেলে দীনুর লাভ হবে না কি?'

—'অথচ ওই দীনুই একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন রক্ষা করেছে!'*

—'সে হয়তো আপনাকে হাতে না মেরে, ভাতে মারতে চায়!'

—'আর ঠিক এই উদ্দেশ্যেই দীনুর প্ররোচনায় বা সাহায্যে কাগজওয়ালারা আমার দুর্দশার অতিরঞ্জিত কাহিনী যখন তখন প্রকাশ করে দিচ্ছে।'

—'আধুনিক যুদ্ধের একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হচ্ছে প্রপাগাণ্ডা। এর দ্বারা শত্রুকে কেবল বিপথেই চালনা করা যায় না, তার বুদ্ধি-বিবেচনাকেও বিশৃঙ্খল করে দেওয়া যায়। প্রশান্তবাবু, এসব হচ্ছে দীনুর প্রপাগাণ্ডা। আপনি তার চিঠি বা খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়েন কেন?'

—'হ্যাঁ অরুণবাবু, আমিও স্থির করেছি ওসব পড়ে আর মাথা খারাপ করব না। অন্তত নীলপত্র পড়ে যে দীনুকে ধরা যাবে না, এ সম্বন্ধে আর কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু আপনি দীনুর কাছে আমার এই বিশেষ অনুরোধ জানাবেন যে, সে যেন আর আমার কাছে নীলপত্র না পাঠায়। ওই নীল খাম দেখে দেখে শেষটা আমার বুকের ব্যামো হবে দেখছি। প্রত্যেক খাম বহন করে আনে নূতন নূতন দুর্ভাগ্যের বীজ!' প্রশান্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হল।

তারপরেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে শ্রীধর—তার হাতে একখানা নীলরঙের খাম!

মুহূর্তে প্রশান্ত ও অরুণ দুজনেই সচমকে জাগ্রত হয়ে উঠল!

প্রশান্ত দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র স্বরে বললে, 'তুমি কি করে এ চিঠি পেলে?'

শ্রীধর বোকার মতন ভাবহীন মুখে বললে, 'রিক্সার কুলি এখানা আমার হাতে দিলে।'

—'ডেকে আনো কুলিকে!'

—'আজ্ঞে, সে রিক্সা নিয়ে চলে গেছে।'

—'চলে গেছে মানে? আমি তো তাকে দাঁড়াতে বলেছি!'

---

* 'বজ্র আর ভূমিকম্প' দ্রষ্টব্য।

—'জানি না হুজুর।'

—'নিশ্চয় দীনুর চর! কুলিটা কতক্ষণ চলে গেছে?'

—'তা সাত-আট মিনিট হবে।'

—'চিঠি এতক্ষণ আমাকে দাওনি কেন?'

—'আজ্ঞে প্রথমে ভেবেছিলুম ওখানা আমার বাবুর চিঠি। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ দেখলুম, চিঠির ওপরে আপনারই নাম লেখা রয়েছে।'

প্রশান্ত দেখলে, খামের উপরে লাল কালিতে লেখা রয়েছে—শ্রীমান অশান্ত চৌধুরী। রাগে লাল হয়ে বললে, 'কে তোমাকে বললে আমার নাম অশান্ত?'

শ্রীধর নির্বিকার ভাবে বললে, 'কেউ বলেনি হুজুর, আমি আন্দাজ করেছি।'

—'আন্দাজ করেছ! ভারি আন্দাজ করেছ তো! অশান্ত আর প্রশান্ত বুঝি এক নাম হল?'

—'শুনতে আর দেখতে কি কতকটা একরকম নয় হুজুর?'

—'কিন্তু দুটো নামের মানে একেবারে আলাদা।'

—'মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, জানব কেমন করে? ও দুটো নামের মানে কি হুজুর?'

—'যাও আমি বলব না! বেরোও, এখনই আমার সুমুখ থেকে বিদেয় হয়ে যাও!'

শ্রীধর হাবলার মতন মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঘরের বাইরে চলে গেল।

প্রশান্ত বললে, 'রত্নটিকে কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন অরুণবাবু?'

—'ও আমার পুরানো চাকর।'

—'হতে পারে। কিন্তু ওর ওপরে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কি সন্দেহ?'

—'লোকটা ধূর্ত। অশান্ত মানে কি, বোঝে।'

—'জানি না। কিন্তু বাজে কথা থাক। চিঠিখানা আমায় দিন।'

—'আপনাকে দেব কেন?'

—'পড়ে দেখব।'

—'আমার নামে চিঠি, আপনি পড়ে দেখবেন মানে?'

—'এই যে বললেন, আপনি স্থির করেছেন নীলপত্র আর পাঠ করবেন না?'

—'ভবিষ্যতে সে কথা ভেবে দেখা যাবে। আপাতত চিঠিখানা আমি পড়ে দেখতে চাই। জানিনা, দীনু আবার আমাকে জ্বালাবার কি আয়োজন করেছে।'

আসনে বসে প্রশান্ত পত্র পাঠ করতে লাগল। অরুণ লক্ষ্য করলে, পড়তে পড়তে তার মুখের উপর দিয়ে পরে-পরে এই তিনটি ভাবের স্পষ্ট প্রভাব ফুটে উঠল—প্রথমে বিষম কৌতূহল, তারপর অসীম বিস্ময়, তারপর দারুণ ক্রোধ!

চিঠিখানা টেবিলের উপরে সশব্দে নিক্ষেপ করে প্রশান্ত তেরিয়ার মতো বললে, 'অরুণবাবু!'

—'কি সংবাদ?'

—'আপনার বন্ধু দীনু আমাকে কী ভাবে?'
—'কেমন করে জানব?'
—'সে কি ভেবেছে আমি গুণ্ডা—আমি খুনি?'
—'না ভাবাই তো উচিত। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'
—'চিঠিখানা পড়ে দেখুন।'
অরুণ পত্র নিয়ে পড়লে :

'অশান্ত চৌধুরী,
তুমি কি রূপান্তর গ্রহণ করতে চাও? তোমার কি দুরাত্মার ভূমিকায় অভিনয় করবার সাধ হয়েছে?
এতদিন আমাদের একমাত্র অস্ত্র ছিল বুদ্ধি এবং বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে পরাস্ত করবার চেষ্টায় ছিলুম ব্যস্ত। এবং এ চেষ্টায় কে বেশি সফল হয়েছে, সেটা তোমাকে বলাবাহুল্য।
কিন্তু এতদিন পরে তুমি বোধহয় আবিষ্কার করতে পেরেছ যে, তোমার ঘটে বুদ্ধি নামক পদার্থের অস্তিত্ব নেই, কিংবা যেটুক আছে তা একেবারে অকেজো, ভোঁতা, মরচে-পড়া।
তাই তুমি কি রূপান্তর গ্রহণ করে অস্ত্রান্তর গ্রহণ করতে চাও? ধারণ করতে চাও এমন কোনও অস্ত্র, যার জন্যে দরকার নেই বুদ্ধির, দরকার শুধু পশুশক্তির।
কিন্তু ও শক্তিটা হচ্ছে অত্যন্ত সেকেলে। মনে রেখো, দুর্দান্ত মহাবলিষ্ঠ পশুরাজ সিংহও পরাজিত হয়ে বন্দী হয় নখদন্তহীন দুর্বল ক্ষুদ্র মানুষের কাছে।
শোনো :
কাল সন্ধ্যার সময়ে একলা বসেছিলুম জানলার ধারে, নিজের বাড়িতে। ঘরে আলো জ্বলছিল, বাইরে অন্ধকার।
আচমকা বাহির থেকে বন্দুকের শব্দ হল। পরমুহূর্তে জানলার সামনেকার দেওয়ালের উপরে একখানা ছবির কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গুলিটা দয়া করে উপহার দেওয়া হয়েছিল আমাকেই, কিন্তু বন্দুকধারীর দুর্ভাগ্যক্রমে তার বাসনা পূর্ণ হয়নি।
এর অর্থ কি প্রশান্ত? তুমি কি আমার পিছনে কোনও হত্যাকারী গুণ্ডা নিযুক্ত করেছ? কিছুতেই আমাকে আর এঁটে উঠতে পারলে না বলে শেষটা নিজের মানরক্ষার জন্যে আমাকে দুনিয়ার থিয়েটার থেকে একেবারে গলাধাক্কা দিতে চাও?
সত্য বলছি, তোমার সম্বন্ধে এখনও এতটা কুধারণা আমি পোষণ করতে পারছি না। কারণ বোকা হওয়া এক, আর খুনে হওয়া এক। যদিও শেষপর্যন্ত খুনে হয়ে দাঁড়ায় বোকারাই।
কিন্তু আমাকে বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করতে পারে, এমন কোনও শত্রুকেই আমি চিনি না। কলকাতার সাধারণ কোনও বদমাইশের দলের সঙ্গে আমার সামান্য সম্পর্কও নেই। সুতরাং কোনোরকম স্বার্থহানির সম্ভাবনায় তাদের কেউ আমার প্রাণপক্ষীকে শিকার

করতে আসবে না। এ সম্প্রদায়ে আমার একমাত্র শত্রু ছিল মহাদেও মিশির। কিন্তু তাকে তো আমি স্বহস্তে তুলে দিয়েছি তোমার হাতে এবং তুমি তাকে তুলে দিয়েছ ফাঁসিকাঠের দোলমঞ্চে।*

তবে এমন ব্যাপার কেন হল?

না বললেও চলবে যে, আমি সে বাড়ি ছেড়ে নতুন বাসায় উঠে এসেছি। আমার শত্রুরা এখন সে বাড়ির উপরে যতখুশি গুলিবৃষ্টি করতে পারে।

হ্যাঁ, একটা কারণে আমার সন্দেহ তোমার দরজা থেকে ফিরে আসতে চাইছে। আমার বাড়ির ঠিকানা জানলে তুমি হয়তো পুলিসবাহিনী নিয়েই আমাকে সরাসরি আক্রমণ করতে আসতে, গুপ্তঘাতকের সাহায্য গ্রহণ করতে না।

কিন্তু এও তো হতে পারে যে, বারবার আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও হারিয়েছ বলে তুমি আজ মরিয়া হয়ে উঠেছ। সম্মুখযুদ্ধে, বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় জয়লাভের আশা ত্যাগ করেছ! তাই কি?

কিন্তু উপায় কি বল দেখি? আমি তো কতবার তোমার সামনে গেলুম, পাশে গেলুম, তোমার সঙ্গে কথা—এমনকি গল্পও করলুম, তবু তুমি আমার হাতে তোমার বড়ো সাধের লোহার বালা পরাতে পারলে না! হায় অশান্ত, কবে তুমি সাবালক হবে?

বলব কি ছাই, এই আজকের ব্যাপারটাই দেখ না! আমি সাজলুম রিক্সার কুলি, তুমি ভাড়া করলে আমার গাড়ি, এমনকি আমার 'কাণা' ডানচোখটা তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে কিনা ভেবে সন্দেহ প্রকাশ করতেও ছাড়লে না, তবু একবারও তোমার সূক্ষ্ম গোয়েন্দাদৃষ্টি দেখতে পেলে না, যে দ্বিপদ জীবটি তোমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তার নাম হচ্ছে—

'দীনবন্ধু'

চিঠি পড়ে অরুণ অবাক হয়ে বসে রইল।

প্রশান্ত রাগে গসগস করতে করতে বললে, 'এ চিঠি পড়ে কি মনে হয়?'

—'বাস্তবিক, আশ্চর্য কথা! বরুণের এমন মারাত্মক শত্রু কে আছে যে—'

—'আমি সে কথা ভাবছি না। আমি হলুম গিয়ে খুনিদের যম, আর আমাকেই কিনা—'

—'হ্যাঁ। বোধহয় বরুণের এ অভিযোগ সত্য নয়।'

—'বোধহয়? বোধহয় কি মশাই?'

—'আচ্ছা, 'বোধহয়' কথা দুটিকে ত্যাগ করছি। আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয়ই বরুণকে খুন করবার জন্যে লোক লাগাননি।'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। আপনার বন্ধুকে বলবেন যে, তার কাছে লক্ষ বার অপদস্থ হলেও লোক লাগিয়ে তাকে আমি যমের বাড়ি পাঠাতে চাই না! দীনু আমাকে আর যাইই বলুক, তার এ কথা আমি কিছুতেই সহ্য করব না! আরে গেল যা! আমাকে খুনি বলা? উঃ, কী রাগ যে হচ্ছে!'

---

* 'বজ্র আর ভূমিকম্প' দ্রষ্টব্য।

—'ঠাণ্ডা হোন প্রশান্তবাবু, ঠাণ্ডা হোন।'

—'আরে মশাই, ঠাণ্ডা হই কি করে? বুকে আগুন জ্বেলে দিলে কেউ ঠাণ্ডা হতে পারে? এই আপনার বন্ধুর বুদ্ধি? আমি নাকি নাবালক!'

—'কিন্তু কে এই গুপ্ত শত্রু?'

—'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে? আমি জানব কেমন করে? আমি কি গণৎকার?'

—'মহাদেও মিশিরের ফাঁসি হবার পর আমিও তো বরুণের এমন কোনও শত্রুর কথা ভাবতে পারছি না!'

—'মশাই, আপনার বন্ধুটি তো আদর্শ সাধু-সজ্জন নন! তার উপাধি 'ডাকাত'। জানি, সে কেবল দুষ্ট লোকের টাকা কেড়ে নেয়। কিন্তু সেইজন্যেই তো তার বেশি ভয়! হয়তো সেই দুষ্টদেরই কারুর প্রতিশোধ নেবার বাসনা হয়েছে।'

—'খুব সম্ভব, তাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত বললে, 'দেখুন অরুণবাবু, আর আপনার কাছে আসবার ইচ্ছে আমার নেই।'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আপনার কাছে এলেই প্রায় নীল পত্র পাই। এ রহস্যের কারণ কি জানি না, কিন্তু এটা ভালো করে ভেবে দেখবার কথা!'

অষ্টম

ঘুগনিদানার মালিক

রাত দশটা।

কাল রাত নটা সাড়ে-নটার সময়ে খ্যাঁদা জাপানিদের উড়োজাহাজরা কলকাতার উপরে কালীপুজোর বাজির মতন কতগুলো বোমা ছুড়ে সরে পড়েছিল। আজ তাই এর মধ্যেই শহরের রাস্তাগুলোর উপর থেকে পথিকরা হয়েছে অদৃশ্য।

এমনকি, দোকানিরাও ঝাঁপ তুলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি! কে জানে বাবা, বলা তো যায় না—

কিন্তু জনবহুল পথে পথে না ঘুরলে যাদের পোড়া পেট চলে না, আজ সেই গরিব-বেচারীদের বড়োই দুর্দশা! ঘুগনিদানা, কাবলিমটর ও আলুসিদ্ধ এবং কুলফি বরফ প্রভৃতির বিক্রেতারা পথে পথে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা করে মরছে, তাদের মাল সাবাড় করবার লোকের একান্ত অভাব!

এক বুড়ো ঘুগনিদানাওয়ালা প্রায় পূর্ণ ঘুগনির হাঁড়ি কাঁধে করে শ্রান্ত পদে যেন ধুঁকতে-ধুঁকতে পথ চলছে। তবু গলার আওয়াজকে নানারকমে অধিকতর লোভনীয় করে তোলবার জন্যে তার প্রাণপণ চেষ্টার অভাব নেই। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বারবার সে ছড়া কাটছে—

'আলু-নারকেল-ঘুগনিদানা!
না খেলে ভাই যায় না জানা!
গরমা-গরম, ঝাল-মিঠে-টক,—
যাও খেয়ে যাও, যার আছে শখ!
সঙ্গে আছে মামলেট আর
ডিম, আলুর দম—শখের আহার!'

তবু কারুর দেখা নেই—বোমাভীতু খরিদ্দাররা আজ তাকে বয়কট করেছে!

কিন্তু সে হতাশ হয় না, তার তারস্বরে চিৎকার থামে না, সে যেন অনন্ত দম-দেওয়া কলের পুতুল, জনশূন্য মরুভূমিতে ছেড়ে দিলেও তার কণ্ঠের মুখরতা স্তব্ধ হবার নাম করবে না।

হঠাৎ অভাবিত ভাবে বুঝি তার অদৃষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হল। একটা গলির মোড়ের বাড়ির তলায় লম্বা রোয়াকে বসে কয়েকজন লোক গুলতানি করছিল। খুব সম্ভব পাড়ার ডানপিটে বেকার ছোকরার দল—রাস্তার ধারের রোয়াকে রোয়াকেই হয় যাদের আলোচনা-সমিতির নিয়মিত অধিবেশন! তারা গুরুজনদেরও মানে না, বোমার ভয়ও রাখে না। তারা হচ্ছে সেই শ্রেণীর ছেলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—ভূতের ভয় দেখালেও যারা ভূত দেখতে চায়!

রোয়াকের উপর থেকে আহ্বান এল—'ও ঘুগনিদানাঅলা!'

ফিরিওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শুধোলে, 'আজ্ঞে বাবু!'

—'কি কি আছে?'

ফিরিওয়ালা আবার তার স্বরচিত ছড়াটির আবৃত্তি শুনিয়ে দিলে।

—'মামলেটের দাম কত?'

—'আজ্ঞে বাবু, দু-আনা।'

—'দু-আনা? বলো কি?'

—'আজ্ঞে বাবু, আজকাল ডিমের দাম জানেন তো?'

—'কেন বলো দেখি? হাঁসরা আজকাল কি ডিম দিতে রাজি নয়? তারা ডিমের মায়া ত্যাগ করেছে?'

—'না বাবু, হাঁসেদের দোষ নেই। তারা গণ্ডায় গণ্ডায় অ্যাণ্ডা ছাড়ে, কিন্তু সেগুলো আজকাল পাচার হচ্ছে লড়ায়ে-গোরাদের জন্যে।'

—'তুমি তো খুব খলিফা ঘুগনিদানাঅলা দেখছি। দিব্যি ছড়া কাটো, এত খবর রাখো!'

—'আজ্ঞে বাবু, যে পুজোর যে মন্ত্র! নইলে পেট চলবে কেন?'

—'বেশ, বেশ! তোমার কথায় খুশি হলুম। রোয়াকে উঠে বোসো তো চাঁদ। আগে আনা-চারেকের ঘুগনি দাও দেখি!'

ফিরিওয়ালা রোয়াকের উপরে উঠে বসে নিজের পসরার ভিতরে হস্তার্পণ করলে—

এবং সঙ্গে সঙ্গে রোয়াকে যারা বসেছিল তারা সকলে মিলে তার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ল দলবদ্ধ বাঘের মতো! ঘুগনিওয়ালা কিছু জানবার বা কোনোরকম বাধা দেবার আগেই তারা তাকে রোয়াকের উপরে নির্জীব পদার্থের মতন পেড়ে ফেললে এবং মিনিট তিন পরেই দেখা গেল, তার মুখ-হাত-পা সব বাঁধা!

একটা লোক বললে, 'জানি স্যাঙাত, তুমি এই পথেই ফিরবে। আমরা তোমার জন্যেই বসেছিলুম!'

আর-একটা লোক তীব্র স্বরে শীষ দিলে!

কোথা থেকে দুখানা বড়ো-বড়ো মোটরগাড়ি ছুটে এসে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকগুলো ঘুগনিওয়ালাকে ধরাধরি করে তুলে ধরে একখানা গাড়ির আসনের তলদেশে স্থাপন করলে। তার দেহের উপরে নিক্ষেপ করলে চটের মতন কি একটা জিনিস—তখন বাহির থেকে কারুর কৌতূহলী দৃষ্টি যে তাকে দেখবে, এমন কোনও উপায়ই রইল না। যদিও এতটা সাবধানতার দরকার ছিল না, কারণ কলকাতার রাত্রি এখন নিষ্প্রদীপ—দুই হাত দূরেও মানুষের দেহ হয় প্রায়-অদৃশ্য।

লোকগুলো মিনিট পাঁচ-ছয় রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কি পরামর্শ করলে। তারপর একে একে সকলে দুইখানা গাড়ির ভিতরে উঠে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিলে।

গাড়ি ছুটছে কলকাতার ভীত, মৃত অন্ধকারকে মথিত ও শব্দিত করে। একে একে এ-পথ ও-পথ পার হয়ে গাড়ি দুখানা ক্রমে শহরের প্রান্তে এসে পড়ল। দেখতে দেখতে শহর পড়ে রইল পিছনে।

অন্ধকার আরও ঘনীভূত। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই—শোনা যাচ্ছে শুধু শীতল ঝোড়ো বাতাসের দীর্ঘশ্বাস এবং বনে বনে উচ্ছ্বসিত পত্রমর্মর। আকাশের ক্ষীণ চাঁদের আলো ভেদ করতে পারছে না পৃথিবীর তিমিরাবগুণ্ঠন।

গাড়ি দুখানা আরও বেগে ছুটতে আরম্ভ করলে। যেন তারা হচ্ছে দুটো বন্য ও হিংস্র জন্তু—অন্ধকারের গর্ভে পেয়েছে কোনও পলাতক শিকারের সন্ধান। শিকার পালাচ্ছে, তারাও পশ্চাদ্ধাবন করছে!

যন্ত্রযুগের দুই যন্ত্রদানব—প্রচণ্ড গতির আবেগে ক্রমেই বেশি আত্মহারা হয়ে উঠছে। মানুষ তাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে, আবার তাদের তলাতেও পড়ে জীবন সমর্পণ করতে বাধ্য হয়! মানুষ প্রভু, না যন্ত্র প্রভু, বোঝা যায় না!

এতক্ষণ গাড়ির আরোহীরা একটাও কথা কয়নি।

এইবারে একটা হেঁড়েগলা শুধোলে, 'আলগু!'

—'বাবুজি!'

—'শখের ঘুগনিঅলার সঙ্গে দুটো গল্প করবার সাধ হচ্ছে। ওর মুখের বাঁধন খুলে দে।'

—'যদি চ্যাঁচায়?'

—'এই বন বাদাড়ে অন্ধকারে শুনবে কে? তা ছাড়া আমাদের হাতের রিভলবারগুলো কি করতে আছে? ও চ্যাঁচালে, রিভলবার ঘুমোবে না।'

আলগু বন্দীর মুখের বাঁধন খুলে দিলে।

হেঁড়েগলা মনের খুশিতে আগে খানিকটা হুড়হুড় করে হাসির বন্যার সৃষ্টি করলে। তারপর বললে, 'কেমন লাগছে হে দীনুবাবু?'

বরুণ বললে, 'ভালো লাগছে বলব না। সেটা হবে মিছে কথা।'

—'তুমি সত্যবাদী ডাকাত?'

—'মাঝে মাঝে সত্যকথা বলার চেষ্টা করি।'

—'আজ কত ঘুগনি বেচলে?'

—'চার আনার।'

—'এ ব্যবসা কতদিন ধরেছ?'

—'আমি কবে কোন ব্যবসা ধরি কিছুরই ঠিক নেই।'

—'পোষায়?'

—'না পোষালে চলবে কেন?'

—'আমি কে বলো দেখি?'

—'অন্ধকারে তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মধুর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, এর আগে তোমাকে চোখেও চেখিনি।'

—'তা দেখনি।'

—'তুমি কে?'

—'শঙ্করলাল।'

—'তুমি বিখ্যাত ব্যক্তি নও। নাম শুনেও চিনলুম না।'

—'না, আমি চোর ডাকাত গুণ্ডা নই—তুমি যাদের চেনো।'

—'তবে তুমি কি বুদ্ধ আর খ্রীষ্টের মামাতো ভাই?'

হা হা-রবে হেসে শঙ্করলাল বললে, 'তুমি বেটা রসিক আছ দেখছি। কিন্তু আমি হচ্ছি মহাদেও মিশিরের নিজের ভাই।'

বরুণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

—'কি হে, চিনলে?'

—'খানিকটা পরিচয় পেলুম বটে।'

—'ভয় হচ্ছে না?'

—'আমার ভয় নেই।'

—'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

—'কি রকম?'

শঙ্কললাল ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'তোমাকে যে আদর করব তেমন আদর কখনও কল্পনাও করনি!'

—'আমি আদর পেলে খুশি হই।'

শঙ্করলাল আরও ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র কণ্ঠে বললে, 'তোমাকে কি রকম আদর করব জানো?'

—'জানতে আগ্রহ হচ্ছে বইকি।'

—'তবে শোন। শহর গ্রাম থেকে দূরে এমন এক গভীর জঙ্গলে যাব, যেখানে মানুষ ঢোকে না—যেখানে সূর্যের আলোও আসে না! তারপর মাটির ভেতরে খুঁড়ব একটা গর্ত। তারপর হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় তোর সমস্ত দেহটা রাখব সেই গর্তের মধ্যে—উপরে

জেগে থাকবে কেবল তোর বাঁদরের মতন মুখটা। গর্তের সব ফাঁক ভরিয়ে দেব আবার মাটি ঢেলে। তারপর তোর মুখের কাছ থেকে একহাত তফাতে রাখব এক কুঁজো জল, আর একথালা খাবার। তারপর আমরা সবাই সেখান থেকে চলে আসব!'

বরুণ সহজ স্বরেই বললে, 'রীতিমতো মাথা খাটিয়েছ দেখছি। এতটা মেলো-ড্রামাটিক না হলে প্ল্যানটিকে হয়তো ভালো বলেই স্বীকার করতুম।'

মানসচক্ষে যেন একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে উৎফুল্ল কণ্ঠে শঙ্করলাল বললে, 'তারপর কি হবে জানো? মাটির ভিতরকার হাজার হাজার কীটপতঙ্গ তোমার সর্বাঙ্গে দংশন করতে থাকবে। রাতের পর দিন আসবে, দিনের পর রাত—এমনি তিন-চার দিন আর রাত। হয়তো আরও দু-একটা দিন-রাত। তোমার তেষ্টা পাবে—সামনে দেখবে ঠাণ্ডা জল, কিন্তু পান করতে পারবে না। তোমার ক্ষুধা পাবে—সামনে দেখবে রকম-বেরকম খাবার, কিন্তু খেতে পারবে না। কীটের দংশনে, অনাহারে তোমাকে মরতে হবে তিলে তিলে, কেঁদে-কঁকিয়ে, আর যদি কোনও শিয়াল-কুকুর সন্ধান পায়, তাহলে তোমার জ্যান্ত মাথাটা ধীরে-সুস্থে বসে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। কি গো দীনুবাবু, এমন আদর তোমার পছন্দ হবে তো?'

—'আমার পছন্দে-অপছন্দে কিছু আসে-যায় কি?'

—'কিছু না!'

—'শুনেছি তোমার ভাই মহাদেও, নূতন নূতন উপায়ে যন্ত্রণা দিয়ে নরহত্যা করতে ভালোবাসত। দেখছি তুমিও তার যোগ্য ভাই।'

—'তোমাকে সহজ ভাবে মারলে আমার দাদার আত্মা পরিতৃপ্ত হবে না।'

—'তোমার কথা সত্য।'

—'তোমাকে এত আদর করব কেন জানো?'

—'না।'

—'তুমি আমার দাদার হত্যাকারী।'

—'মহাদেওয়ের ফাঁসি হয়েছে বিচারকের সুবিচারে।'

—'কিন্তু দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছ তুমি।'

—'তাই এই প্রতিশোধ?'

—'হ্যাঁ রে শয়তান! তুই লক্ষ টাকা দিলেও তোকে আমি ছেড়ে দেব না।'

—'মাপ করতে হল। আমি তোমাকে এক আধলাও দিতে চাইব না।'

—'একটু পরেই মরবার ভয়ে তোর মুখ দিয়ে নতুন কোন সুর বেরোয়, তাও আমরা শুনতে পাব।'

বরুণ সকৌতুকে হেসে উঠল।

—'হাসছিস!' শঙ্করলালের স্বর বিস্মিত।

—'কেন হাসব না?'

—'এখনও তোর ভয় হচ্ছে না?'

—'দেখ শঙ্করলাল, যে পথে পা দিয়েছি এ তো সাক্ষাৎ মৃত্যুর পথ! কাপুরুষ হলে আমি কি এ পথের পথিক হতুম? তবে মৃত্যুকে ভয় করব কেন?'

—'বাঙালিবাবুদের বীরত্ব আমি অনেক দেখেছি।'

—'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি কিছুই দেখনি। থাক সে কথা। আমি একটা কথা জানতে চাই।'

—'কি?'

—'আমাকে গুলি করে মারবার চেষ্টা করেছিল কে?'

—'আমি।'

—'যাক, সন্দেহ মিটল।'

—'সন্দেহ?'

—'হ্যাঁ! আমি ভেবেছিলুম, প্রশান্ত চৌধুরী আমাকে পথ থেকে সরাতে চায়!'

—'গোয়েন্দা প্রশান্ত চৌধুরীর কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তারও শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে।'

—'এসেছে নাকি?'

—'তোমার পরেই তার পালা।'

—'কেন?'

—'যে যে আমার দাদার ফাঁসির মূলে আছে, আমি তাদের কারুকেই রেহাই দেব না।'

—'তুমি যে দেখছি পরশুরামের মতন একরোখা লোক। মাতৃহত্যা করনি তো?'

শঙ্করলাল সে কথার জবাব না দিয়ে গর্জন করে ডাকলে, 'আলগু!'

—'বাবুজি!'

—'দীনুর সঙ্গে আর কথা কইতে ভালো লাগছে না। ফের ওর মুখ বাঁধো। ভালো করে বাধো। দুনিয়ায় ওর এই বাঁধন আর খুলবে না।'

বরুণ আবার তরল স্বরে হাসি শুরু করে দিলে।

শঙ্করলাল বললে, 'দীনু, ভেবেছ আজ হেসেই জিতে যাবে?'

বরুণ বললে, 'পাগল! যার হাত পা বাঁধা, সে কখনও জিততে পারে?'

—'হাত পা খোলা থাকলে জিততে পারতে?'

—'একবার খুলে দিয়েই দেখ না!'

এইবারে শঙ্করলালের হেঁড়েগলায় জাগল অট্টহাস্য! তেমনি হাসতে হাসতেই সে বললে, 'হাত পা খুলে দিলে তুমি কি করবে শুনি?'

—'একবার খুলে দিয়েই দেখ না!'

—'ওরে বাঙালিবাবু, খবর রাখিস কি, দেশ-বিদেশের বড়ো বড়ো পালোয়ানও আমার সঙ্গে লড়তে সাহস করে না?'

—'না, ও খবর রাখি না শঙ্করলাল। কারণ কুস্তি আমার ব্যবসা নয়।'

—'হ্যাঁ, তোর ব্যবসা ডাকাতি, তা আমি জানি। কুস্তির খবর তুই কি রাখবি? এই আলগু! আমি কি বললুম, শুনেছিস? এই বাঙালি কুত্তাটার মুখ আবার ভালো করে বেঁধে দে।'

আলগু হুকুম তামিল করলে।

গাড়ি ছুটছে। পাণ্ডু চাঁদের অতিম্লান আলোতে চতুর্দিক দেখাচ্ছিল পরলোকের রহস্যময় দৃশ্যের মতো। দেখার চেয়ে না-দেখাই যাচ্ছিল বেশি। আকাশপটে অরণ্যশ্রেণীকে মনে হচ্ছিল প্রকাণ্ড ধ্যাবড়াকালির মতো।

শঙ্করলাল বললে, 'গাড়ি থামাও।'

গাড়ি থামল মস্তবড়ো এক ঝুপসি জঙ্গলের পাশে।

শঙ্করলাল বললে, 'জায়গাটা যুৎসই বলে বোধ হচ্ছে। শ্যামলাল, তুমি রিভলবার নিয়ে দীনুবাবুকে পাহারা দাও।'

শ্যামলাল ড্রাইভার। বললে, 'আচ্ছা, হুজুর।'

শঙ্করলাল বলল, 'আলগু আর বৃন্দা আমার সঙ্গে আসুক। জঙ্গলে ঢুকে একটা মনের মতো জায়গা বেছে নিয়ে গর্ত খুঁড়তে হবে। ও গাড়ি থেকে শাবল আর কোদাল আনো। দেখছ দীনুবাবু, আমরা একেবারে তৈরি হয়ে এসেছি?'

সাড়া এল না, বন্দীর মুখ বন্ধ।

আলগু বললে, 'বাবুজি, দীনু ভারি ধড়িবাজ। মহাদেওবাবুকে ফাঁকি দিয়েছিল আজব কায়দায়। ওকে কি এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে? সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না?'

—'না আলগু, ঢের অসুবিধে আছে। জঙ্গলের ভেতরে হয়তো জায়গা বাছবার জন্যে আমাদের অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে। হয়তো ঠিক জায়গা না পেয়ে আবার হবে ফিরে আসতে। অতবড়ো একটা জোয়ান লোককে তোমরা কতক্ষণ ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াবে? সে যে ভারি ঝঞ্ঝাট!'

—'কিন্তু—'

—'কিন্তু কিসের আলগু? দীনুর হাত পা বাঁধা। এ গাড়িতে রইল রিভলবার হাতে শ্যামলাল। পিছনের গাড়িতে রইল আমাদের দুজন লোক। হাত পা খোলা থাকলেও দীনু পালাতে পারবে না।'

—'তবু বাবুজি, আমার মন সরছে না। দীনু সেবারে পালিয়ে গিয়ে মহাদেওবাবুকেও হতভম্ব করে দিয়েছিল।'

—'আলগু, বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না। এখনও অনেক কাজ বাকি। চল। সাবধান শ্যামলাল!'

শ্যামলাল মনে মনে হেসে ভাবলে, আমার হাতে রিভলবার আর একটা মড়ার মতন আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা মানুষ। তার ওপরে আবার সাবধান হয়ে পাহারা দেব কি?

লণ্ঠন নিয়ে শঙ্করলাল, আলগু ও বৃন্দা বনের ভিতরে প্রবেশ করলে। একটু পরেই নিবিড় জঙ্গলের আড়ালে মিলিয়ে গেল লণ্ঠনের আলোর আভা।

ঝিম ঝিম করছে আঁধার রাত। ঝিঁঝিদের নির্বোধ চিৎকার। গাছের পাতাদের একটানা কানাকানি। বাতাসের কাতরানি। কোথা থেকে হঠাৎ-জাগা বকশিশুদের রোমাঞ্চকর কান্না! আকাশে তারাদের শোকসভায় মৃত্যুন্মুখ চাঁদ।

শ্যামলালের এসব ভালো লাগছিল না। পিছনের গাড়িতে গিয়ে একটু গল্প করে আসবারও জো নেই। —বাবুজি তাকে পাহারায় রেখে গিয়েছেন।

গুনগুন করে গান গাইবার চেষ্টা করলে। তাও ভালো লাগল না। রিভলবারটা কোলের উপরে রেখে পকেট থেকে বিড়ি ও দেশলাই বার করলে। বিড়ি ধরালে।

বিড়ি শেষ করে শ্যামলাল কি করত জানি না, কিন্তু তার বিড়ি আর শেষ হল না।

আচম্বিতে সে কণ্ঠদেশে অনুভব করলে নির্দয়, কঠিন, প্রচণ্ড লৌহবন্ধন! সঙ্গে সঙ্গে দুখানা আশ্চর্য বলিষ্ঠ বাহু তাকে এমন ভাবে আসনের উপর চেপে ধরলে যে তার মনে হল, যেন ত্রিশ-বত্রিশ মণ ওজনের তলায় সে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে! তার হাত থেকে বিড়ি গেল পড়ে, সে উঠতে বা একটু নড়তে বা একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলে না—দুই চক্ষু কপালে তুলে দেখতে দেখতে এলিয়ে পড়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল!............

বরুণ মনে মনে হেসে বললে, 'আমাকে এরা দড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানি মড়ার মতন বেঁধে রাখবে! নির্বোধরা জানে না, কি কৌশলে, কত সহজে এরকম বাঁধন খুলে ফেলা যায়! ভাগ্যে এরা আমার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধেনি—তাহলে পরলোকের টিকিট কেনা ছাড়া হতভাগ্য দীনবন্ধুর কোনও উপায়ই থাকত না!'

তখনও তার শরীরের নিচের দিকটা ছিল দড়ি-জড়ানো—সে বসে—বসেই কাবু করেছে শ্যামলালকে। চটপটে-হাতে সে পায়ের বাঁধন খুলে ফেললে। তারপর উঠে শ্যামলালের দেহটা ঠিক হালকা কোনও খেলার পুতুলের মতোই এদিকে টেনে এনে, দড়ি দিয়ে নিজের মনের মতো কৌশলে বেঁধে ফেললে। তারপর সামনের দিকে গিয়ে ড্রাইভারের আসনে বসে পড়ল এবং শ্যামলালের পরিত্যক্ত রিভলবারটা তুলে নিলে।

মনে মনে বললে, 'আলগু রাসকেল বড়োই হুঁসিয়ার ব্যক্তি দেখছি। শুনেছি ও মহাদেও মিশিরের ডানহাতের মতো ছিল : ভবিষ্যতে ওর ওপরে নজর রাখবার চেষ্টা করব।'...........

...........পিছনের গাড়ির লোকরা দেখলে, সামনের গাড়িখানা হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে ধীরে-ধীরে মোড় ফিরলে।

কে বললে, 'কি রে শ্যামলাল, ব্যাপার কি?'

শ্যামলালের গাড়ি ধীরে ধীরে পিছনের গাড়ির পাশের দিকে এল—

এবং তারপরেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো উপর-উপরি দুই-দুইবার রিভলবারের শব্দ এবং সেইসঙ্গে দ্বিতীয় গাড়ির একদিককার সুমুখ ও পিছনের দুখানা টায়ার ফাটার বিষম আওয়াজ! তারপরেই শ্যামলালের গাড়ি ছুটে চলল উল্কাবেগে!

পিছনের গাড়ির লোকগুলো কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব ও স্তম্ভিতের মতন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তারপর তারা টপাটপ গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু আসল ব্যাপার কিছুই ঠিকমতো বুঝতে পারলে না।

বুঝলেও, উপায় নেই! দুখানা বিদীর্ণ টায়ার! মোটরের যন্ত্র চললেও, গাড়ি আর ছুটবে না!

নবম

দীনের বন্ধুকে দেখেন ভগবান

শ্রীধর বাজারে যাচ্ছিল। হঠাৎ অরুণের মুখের ভাব দেখে দুই ভুরু আন্দোলিত করে শুধোলে, 'কি হয়েছে ছোড়দা? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন একটা গোটা নিমগাছ খেয়ে ফেলে হজম করতে পারোনি।'

অরুণ বিরক্তভাবে বললে, 'ঠাট্টা নয় শ্রীধর! বোধহয় বরুণ কোনও বিপদে পড়েছে!'

—'কে, বড়দা? তা বড়দা বিপদে পড়লেও আমাদের ভাববার দরকার নেই।'

—'মানে?'

—'বড়দা বিপদে পড়লেও বিপদকে ফাঁকি দেবার মতন বুদ্ধি আছে তাঁর লক্ষ-রকম!'

অরুণ আরও বিরক্ত হয়ে বললে, 'দেখ শ্রীধর! 'অতি' জিনিসটাই মন্দ। বড়দার ওপরে তোমার এই অতি বিশ্বাস সব সময়ে আমার ভালো লাগে না। মনে রেখো, বড়দা পৃথিবীর মানুষ, অলৌকিক শক্তিশালী দেবতা নন।''

—'মানি ছোড়দা। কিন্তু কি হয়েছে বল দেখি?'

—'আজ ভোর পাঁচটার সময়ে ছোট্টুলাল এসেছিল।'

—'ছোট্টুলাল? ও, বড়দার সেই পেয়ারের ছোকরা? কই, আমি জানি না তো?'

—'তোমার নাক তখন ভীষণ ডাকাডাকি করছে। বারো-তেরো ঘণ্টা ধরে স্বপ্ন না দেখলে তো তোমার নাকের গান থামে না, কাজেই তোমাকে না ডেকেই আমি নিজে নিচে গিয়ে ছোট্টুলালকে দরজা খুলে দিলুম।'

—'বেশ করেছ ছোড়দা, ভারি বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছ। ভাগ্যিস আমার ঘুম ভাঙাওনি! কিন্তু তারপর?'

—'ছোট্টুলালের মুখে শুনলুম, বরুণ ঘুগনিদানাঅলা সেজে 'রাত বারোটার ভেতরে আসব' বলে বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভোর পাঁচটার সময়েও আর বাসায় ফেরেনি!'

—'তাই তুমি ভাবছ বড়দা কোনও বিপদে পড়েছে?'

—'হ্যাঁ। জানো তো শ্রীধর, বরুণ যা করে—ঘড়ির কাঁটা ধরে করে। বিষম বিপদে না পড়লে তার কথার নড়চড় হওয়া অসম্ভব। সেইজন্যেই ভাবছি।'

শ্রীধর খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাবলে। তারপর বললে, 'হ্যাঁ ছোড়দা, একটু ভাবনার কথা বটে। কিন্তু বেশি ভাববার দরকার নেই। বড়দা আমাদের দীনবন্ধু, গরিবের মা-বাপ। ভগবান নিশ্চয়ই তাঁকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন।' এই বলে পরম নিশ্চিন্ত ভাবেই বাজার করতে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু অরুণের মন প্রবোধ মানলে না। শ্রীধরের মতন বরুণের প্রতি তার অন্ধবিশ্বাস নেই। সে জানে তার বন্ধু বাস করছে অতি-ভঙ্গুর কাচের ঘরে। যে কোনও মুহূর্তেই সেই কাচের ঘর যে কোনও ব্যক্তির এক আঘাতে ভেঙে পড়তে পারে!

নিচে নেমে বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়বার চেষ্টা করলে। সেই সব শুকনো, এক কায়দায় সাজানো বাজে যুদ্ধের খবর। এমন পৃথিবীব্যাপী কল্পনাতীত মহাসমর চলছে—কুরুক্ষেত্রের রূপকথাও যার কাছে হার মেনে যায়, প্রতিদিন এবং রাত্রে যেখানে হাজার হাজার বীর সন্তানের বুকের রক্তে মাতৃভূমি পিতৃভূমি মহাগৌরব অর্জন করছে, তার কোনও সংবাদের মধ্যেই এতটুকু বৈচিত্র্য নেই—প্রতিদিনের খবর যেন পূর্ববর্তী আর একদিনের পুরাতন সংবাদের পুনরাবৃত্তি—সেসব যেন কেরাণীদের একঘেয়ে হিসাবের খাতা! বেশ বোঝা যায়, যেসব খবর পড়ছি তা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছে না—আসছে কেরানিদের আপিসের টেবিল থেকে স্পষ্ট সত্যকে গোপন করে স্পষ্ট মিথ্যার প্রচারের জন্যে!

'ধেৎ' বলে অরুণ খবরের কাগজখানা ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর সোফার একদিকে দুই পা তুলে চুপ করে শুয়ে রইল। অলস ভাবে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অসংখ্যবার দেখা ছবিগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যেও নূতনত্ব নেই।

এমন সময়ে শ্রীধরের পুনরাবির্ভাব। মুখ তার হাসিহাসি।

অরুণ সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, 'এত হাসির বাড়াবাড়ি কেন? গোটা বাজারটা লুট করে নিয়ে এলে নাকি?'

—'তার চেয়ে ভালো খবর। বড়দার চিঠি!'

অরুণের সমস্ত জড়তা ঘুচে গেল। সোফা ত্যাগ করে বললে, 'বরুণের চিঠি?'

—'হ্যাঁ। এই নাও।' শ্রীধর এক টুকরো কাগজ বার করে অরুণের হাতে সমর্পণ করলে।

—'চিঠি কোত্থেকে পেলে?'

—'বাজারে ভিড়ে দাঁড়িয়ে মাছ কিনছি, হঠাৎ একটা লোক পাশ দিয়ে যেতে-যেতে চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।'

—'বড়ো খুশি হলুম শ্রীধর! যা ভাবছিলুম!'

—'আমি তো বললুম ছোড়দা, যাঁর জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তাঁকে নিয়ে আমাদের ভাবনার দরকার নেই।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

'অরুণ, শুনলুম যথাসময়ে বাড়িতে আসিনি বলে ছোট্ট চিন্তিত হয়ে তোমার কাছে গিয়েছে। তুমিও আমার জন্যে ভাবছ বুঝে এই ক-লাইন লিখছি।

কিছু ভেবো না। ছোট্ট একটি বিপদে পড়েছিলুম। ফাঁড়া এখনও কাটেনি বটে, কিন্তু প্রথম ধাক্কা সামলেছি। সব কথা বলবার জন্যে নিজেই তোমার কাছে যেতুম, কিন্তু জানো তো, পুলিসের গুপ্ত দৃষ্টি তোমার বাড়ির উপর থেকে নড়ে না, তাই আমার যাওয়া

অসম্ভব। পারো তো আজ সন্ধ্যার সময়ে আমার এখানেই উঁকি মেরে যেয়ো। চিঠির উপরে আমার নতুন বাসার ঠিকানা দিলুম। ইতি—

'বরুণ'

* * * *

বরুণের মুখে অরুণ কালকের রাত্রের সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করলে।

সমস্ত শুনে অরুণ বললে, "মহাদেওর প্রস্থান এবং শঙ্করলালের প্রবেশ! ওদিকে নিশিদিন জাগ্রত প্রশান্ত চৌধুরী! বরুণ, কিছুদিনের জন্যে তুমি নিরুদ্দেশ হলেই কি ভালো হয় না?'

—'অর্থাৎ দেশ ছেড়ে অজ্ঞাতবাস করব?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপত্তি ছিল না। কারণ তুমি তো জানোই, আমার জীবন হচ্ছে অর্ধেক শ্রমশীলতা আর অর্ধেক বিলাসিতা দিয়ে গড়া। কখনও করি কুলিগিরি, কখনও করি বাবুগিরি। আমার মন্ত্র হচ্ছে, খানিক খাটো—খানিক ঘুমোও। আপাতত কলকাতায় আমার বিশেষ কাজ নেই। অনায়াসেই ছুটি নিতে পারতুম, কিন্তু তা আমি নেব না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ছুটি নেব না।'

—'কেন?'

—'তাহলে শঙ্করলাল ভাববে, আমি তারই ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছি।'

—'শঙ্করলাল যা খুশি ভাবুক গে। তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

—'শঙ্করলাল আমাকে জাত তুলে গালাগাল দিয়েছে। বলে বাঙালিরা ভীরু কাপুরুষ। আমি তাকে কানে ধরে বুঝিয়ে দিতে চাই, বাঙালি কাপুরুষ নয়।'

—'এই আত্মগর্ব হচ্ছে তোমার দুর্বলতা।'

—'না, আমার সবলতা।'

—'বেশ, তুমি কি করতে চাও শুনি।'

—'শঙ্করলাল এখনও পুলিসের কাছে সুপরিচিত নয়। এখনও সে খুন-ডাকাতির ব্যবসা ধরেনি। কিন্তু সে যখন তার দাদা মহাদেওর ভাঙা দল আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে, তখন এ ব্যবসা ধরতে তার বেশি দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে না। একবার আইনের শৃঙ্খল ভাঙলেই আমি তাকে ধরিয়ে দেব।'

—'কি দরকার? তুমি কি গোয়েন্দা?'

—'না। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই—সে আমাকে ভয়াবহ মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। সে বাঙালিকে কাপুরুষ বলেছিল। তার এসব অপরাধ আমি মার্জনা করব না। আমিও তাকে হত্যার চেষ্টা করতে পারতুম। কিন্তু হত্যাকে আমি মহাঅপরাধ বলে মনে করি। তাই তাকে আমি শাস্তি দেব আইনের সাহায্যেই।'

—'বেশ, আমার কথা যখন শুনবে না, নিজে যা ভালো বোঝো, করো। কিন্তু শ্যামলালের কি হল বললে না তো?'

—'শত্রুদের নাগালের বাইরে এসে তাকে পথের উপরে নামিয়ে দিয়েছি।'

—'সে কি, তাকে ধরিয়ে দিলে না কেন?'

—'অরুণ, এইবার তুমি হাসালে। আমি শ্যামলালকে যদি কোনও পুলিসকর্মচারির হাতে সমর্পণ করতুম, তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন হত—'ওর অপরাধ কি?' আমি ভালোমানুষের মতন বলতুম—'একদল লোক আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, ও হচ্ছে তাদেরই একজন।' তারপর প্রশ্ন হত—'আপনি কে মশাই?' (অবশ্য আমি হয়তো মুখ ফুটে আত্মপরিচয় দিতুম না—কিন্তু শ্যামলাল নিশ্চয়ই আমার পরিচয় দিতে দেরি করত না।) কাজেই আমি বলতে বাধ্য হতুম,—'অধীনের নাম দীনুডাকাত।' অমনি প্রচণ্ড উৎসাহে আর বিষম চিৎকারে হুকুম হত—'ওরে, দীনুডাকাতের জন্যে হাতকড়া নিয়ে আয় রে!' ব্যাপারটা কি এইরকমই দাঁড়াত না ভাই? তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি তো তোমাদের মতন আইনভীত শান্তিপ্রিয় লোক নই—রাজদ্বারে আমার স্থান কোথায়? যতই গরিবের উপকার করি, আর পাপীকে শাস্তি দিই,—কিন্তু আমি হচ্ছি সমাজের পরিত্যক্ত জীব, সমাজ মনে মনে আমাকে দয়া করলেও মুখে তা স্বীকার করবে না, সমাজে অতি নিম্নচরিত্র লোকেরও যে অধিকার আছে, আমার তা নেই!'

অরুণ দুঃখিত ভাবে বললে, 'ভাই, তুমি তো অনায়াসেই এই ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন ত্যাগ করতে পারো!'

বরুণ মাথা নেড়ে বললে, 'পারি না বন্ধু, পারি না! বিপদ, রোমাঞ্চ, দুঃসাহসিকতা, ঘটনার পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—এসব আমাকে আকর্ষণ করে মাধ্যাকর্ষণের মতো। সভ্যতার এই সামাজিক যুগে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে একশোবার-পড়া উপন্যাসের মতন একঘেয়ে। এক্ষেত্রে যারা বিপদ, রোমাঞ্চ আর ঘটনা খুঁজতে যায়, সাধারণত তাদের হতে হয় পাপী—অর্থাৎ চোর বা গুণ্ডা বা খুনি। আমি নিজের লাভের লোভে সাধারণ পাপী হতে পারি না—কারণ সে শিক্ষা কখনও পাইনি। কাজেই আমি হয়ে পড়েছি সাধুর শত্রুদের যম, দীনের বন্ধু দীনুডাকাত! আমি বেআইনি কাজ করি বটে, কিন্তু পাপী নই। পৃথিবীর আইন আমাকে দাবি করতে পারে, কিন্তু আমার উপরে নরকের দাবি নেই। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা!'

অরুণ বললে, 'তোমার দিব্যজ্ঞান নিয়ে তুমি থাকো, আমার আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু আর একটা কথা জানবার আছে।'

—'কি কথা?'

—'শঙ্করলালরা তোমাকে তো আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, সে বাঁধন খুললে কোন কৌশলে?'

বরুণ হাসতে হাসতে বললে, 'খুবই সহজ কৌশলে। ওরা আমার দেহকে দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধেছিল, আমার হাত দুখানা সংলগ্ন হয়ে ছিল দেহের দুই পাশে। তুমি জানো, এখনও রোজ আমি গুরুতর ব্যায়াম অভ্যাস করি? শ্বাস নিয়ে বুকের ছাতি বাড়াতে পারি চার ইঞ্চি। সেইভাবে দেহের অন্যান্য মাংসপেশীগুলোকেও ফুলিয়ে কম-বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে পারি। আমি রক্ষা পেয়েছি muscle control কোরে! ওরা

যখন আমাকে দড়ি জড়িয়ে বাঁধতে শুরু করলে, আমিও অন্ধকারে সমস্ত দেহটা যতটা সম্ভব ফুলিয়ে বাড়িয়ে তুললুম। তারপর ওরা যখন আমাকে গাড়ির ওপরে তুলে চট ঢাকা দিয়ে ফেলে রাখলে, তখনই আমার দেহ ফিরে এল স্বাভাবিক অবস্থায়—সঙ্গে-সঙ্গে আলগা হয়ে পড়ল চারিদিকের বাঁধন। সেই আলগা বাঁধনের ভিতর থেকে হাত-দুখানা বার করতে আমার এক মিনিটও লাগেনি। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম—মরবার আগে একবার চরম লড়া লড়বার জন্যে। কিন্তু তখনও আমি ভাবতে পারিনি যে, ওরা একান্ত নির্বোধের মতন আমাকে গাড়িতেই রেখে নেবে যাবে! বোধকরি দীনের বন্ধু দীনবন্ধুর ওপরে দয়া করে ভগবানই ওদের মাথায় দিয়েছিলেন ওই দুর্বুদ্ধি!'

অরুণ হেসে বললে, 'শ্রীধরেরও বিশ্বাস তাই। সে বলে, ভগবানের আশীর্বাদে কোনো বিপদই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

—'ঠিক কথাই বলে। কিন্তু আলগু-হতভাগা আর একটু হলেই ভগবানের আশীর্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছিল আর কি! এই আলগুকে তুমি দেখ নি অরুণ! তার মুখের উপরে শয়তানের হাতের ছাপ যেন স্পষ্ট। মহাদেও যখন আমাকে বন্দী করেছিল, তখন সেইই ছিল আমার কারারক্ষক। মন বলছে, তার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে!'

অরুণ বললে, 'আমার মন কি বলছে জানো?'

—'শুনি তোমার মনের উক্তি!'

—'তুমি ধাপে ধাপে ধ্বংসের দিকে নেমে যাচ্ছ। এ পথের যা নিশ্চিত পরিণাম, তার কবল থেকে তুমি মুক্তি পাবে না।'

—'পাব না?'

—'না।'

—'কারণ?'

—'মৃত্যুকে তুমি পরিহাস করে তাচ্ছিল্য করতে চাও। মৃত্যু পরিহাসের ভক্ত নয়। হয়তো অকালেই নিজের প্রাপ্য আদায় করবার জন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছে।'

—'হয়তো তাইই আমার অদৃষ্টের লিখন।'

—'না, এ লিখন তোমার নিজের হাতের। অদৃষ্টকে মানে নির্বোধরা। ....আমি আজ চললুম বরুণ!'

দশম

বাগানবাড়ি

অরুণ চলে যাবার পর বরুণ বসে বসে কি ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এ বাসায় আগে সে নিয়মিত ভাবে বাস করত না বটে, কিন্তু এ বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছে অনেকদিন। কলকাতার ভিতরে এবং শহরতলীতে এরকম ভাড়া নেওয়া বাড়ি

আছে তার কয়েকখানা। যে অনিশ্চিত জীবন তার, কখন কি হতে পারে পূর্বমুহূর্তেও তা জানা অসম্ভব। কবে কোন আশ্রয়নীড় হঠাৎ ভেঙে যাবে, সেজন্যে বরুণ প্রস্তুত হয়ে থাকত সর্বদা।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের এই বাড়িখানি আগে ছিল এক ধনীর শখের প্রমোদভবন। চারিধারে বড়ো বাগান, একটা মস্ত পুকুর ও একটা সুদীর্ঘ ঝিলও আছে।

ধনীর বংশধররা আজ দরিদ্র। ফলে বাগানবাড়ির অত্যন্ত দুরবস্থা। তার রং বিবর্ণ এবং বাইরের দেওয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো ক্ষতচিহ্নের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কুৎসিত ইষ্টককঙ্কাল। বাগানের একটা ফুলগাছও আর বেঁচে নেই—চারিদিকে কেবল ছোটো-বড়ো জঙ্গলের প্রভাব। ঝিল ও পুকুরের অধিকাংশ জুড়ে বিরাজ করছে সবুজ পানার চাদর।

বরুণ বাড়ির বাহির দিকে এবং বাগানের কোনোখানেই সংস্কারের দিক দিয়েও যায়নি—সে কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নারাজ। কিন্তু বাড়ির ভিতরকার ঘরগুলো বাসের উপযোগী ও নিজের মনের মতো করে নিয়েছিল। ভিতরের ঘরে বসে কেহই আন্দাজ করতে পারবে না যে, বাড়ির বাহিরে আছে এমন বন্য কদর্যতা।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বরুণ দেখলে, বাগানের ওপাশে বৃহৎ রাজপথ দিয়ে তীব্র ও দীপ্ত চক্ষু দানবের মতন মিলিটারি লরিগুলো দলে দলে ছুটে যাচ্ছে সবেগে ও সশব্দে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত চাঁদ উঠবে আজ অনেক রাতে। জঙ্গলভরা বাগানের উপরে নেমে এসেছে কালো যবনিকা। অন্ধকারের শত শত আগুনচোখের মতো জোনাকী-গুলো জ্বলছে আর নিবছে—অন্ধকার যেন চোখ মুদছে আর চোখ খুলছে!

বরুণ ভাবছে! ভিতরে ঘরে এই উজ্জ্বল আলো, বাইরে দেখি ওই নিরন্ধ্র অন্ধকার। আলোক থেকে অন্ধকারে যেতে এক ধাপ। জীবন থেকে মৃত্যুরও ব্যবধান মাত্র এক ধাপ। আমি কি সেই ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি? অরুণ আজ আমার মন খারাপ করে দিয়ে গেল।

অরুণ—আমার একমাত্র বন্ধু অরুণও বলে, এই পথের নিশ্চিত পরিণামের কবল থেকে আমিও মুক্তিলাভ করব না। নিশ্চিত পরিণাম? ভালোর পরিণামে ভালো আর মন্দের পরিণামে আসে মন্দ। এই তো স্বাভাবিক নিয়ম। আমি কি এই নিয়মের বাইরে? কেন? আমি তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য দস্যুতার আশ্রয় নিইনি! আমি তো দুষ্টকেই দমন করবার চেষ্টা করি—আমি তো ভগবানের নিজের হাতের চাবুক! মানুষের তৈরি রাজদণ্ডের চেয়ে কি ভগবানের চাবুকের মর্যাদা বেশি নয়? 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'! ঈশ্বরের তুষ্টিতে নিখিল বিশ্ব তুষ্ট হয়—এই কথাই তো জেনে আর মেনে আসছি! আমি কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্যসাধন করছি না—যার ফলে অসাধু হয় লাঞ্ছিত আর সাধু হয় আনন্দিত? তবে? তবে আমি কেন ঘৃণ্য পাপীর মতন শাস্তির আশা করব?.............

হঠাৎ কতকগুলো কাক কা কা করে চেঁচিয়ে উঠল এবং তারপরেই ডানার শব্দে অন্ধকারকে যেন আন্দোলিত করতে করতে দিকে দিকে উড়ে গেল।

সচকিত বিস্ময়ে বরুণ সোজা হয়ে উঠল এক-মুহূর্তে।

হঠাৎ কাকগুলো ভয় পেয়ে উড়ে পালাল কেন? প্যাঁচার আবির্ভাব হয়েছে? কাকেরা কি প্যাঁচাদের শিকার? না, কোনও ক্ষুধার্ত সর্প ভূমিতল ছেড়ে গাছে চড়েছে খোরাক খোঁজবার জন্যে?

কাকরা যখন অন্ধকারে অন্ধ হয়েও রাত্রির বাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তখন নিশ্চয় তার বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু মনে মনে সন্তোষজনক কারণ খুঁজে না পেয়ে বরুণ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

টপ করে দিলে ঘরের আলোটা নিবিয়ে। তারপর টেবিলের উপর থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কান পেতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করবার চেষ্টা করলে।

গাছের অংশবিশেষ যেন দুলছে! একটু একটু পাতার শব্দও হচ্ছে। কেউ যেন সন্তর্পণে গাছের উপরে উঠছে! সে কে হতে পারে?

ছোট্টুলাল বাগানের ভিতরে পাহারায় নিযুক্ত আছে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে নিশ্চয়ই সে সঙ্কেতধ্বনি করত। তবে কি সেইই কোনও কারণে গাছে উঠছে?

বরুণ ডাকলে, 'ছোট্টু!'

সাড়া নেই!

—'ছোট্টু! ছোট্টু!'

সাড়া নেই। কী হল ছোট্টুর?

বরুণ টর্চ টিপে মুক্ত করলে প্রখর আলোর ধারা।

গাছের পাতার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একখানা মুখ! লোকটা তাকিয়ে আছে বরুণের ঘরের দিকেই। সচমকে সাঁৎ করে সরে গেল সেই চমকিত মুখখানা!

কিন্তু যেটুকু দেখেছিল বরুণের পক্ষে তাইই হল যথেষ্ট! তিনলাফে সে ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হল।

বাগানের ভিতরে বাজল বাঁশির তীক্ষ্ণ সঙ্কেতধ্বনি! পুলিসের বাঁশি! জাগল গোলমাল! শোনা গেল সব ছুটন্ত পায়ের শব্দ!

বরুণ একতলায় নেমে দৌড়ে একটা কোণের ঘরের ভিতরে ঢুকল। ছোট ঘর। বেশি আসবাব নেই। একদিকে একটা দেওয়াল-আলমারি।

বরুণ আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একদিকে হাত দিয়ে হয়তো কোনও স্প্রিং টিপলে।

নিজের মনেই বললে, 'একবার যদি বাইরে যেতে পারি, কে আমাকে ধরতে পারে দেখব!'

সমস্ত আলমারিটা ধীরে ধীরে একখানা কপাটের মতন খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে বাহির থেকে ভেসে এল বায়ু-তরঙ্গ। গুপ্তদ্বার!

বরুণ একবার উঁকি মেরে দেখলে। সামনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে দেখা যায়

বরুণবাবুর একটি মস্ত দুর্বলতা আছে, আর সেই দুর্বলতাই হয়েছে আমার স্বর্গের চাবি। 'ফলে মধুর অভাবে গুড় নয়, গুড়ের প্রভাবে পেলুম মধুকেই।'

—'আমার এই দুর্বলতাটা কি শুনি?'

—'মাঝে মাঝে অরুণবাবুকে না দেখে আপনি থাকতে পারেন না।'

—'সত্যি। ওটা হচ্ছে বন্ধুত্বের দুর্বলতা।'

—'দিনের পর দিন যায়, আমি অরুণবাবুকে এক মিনিটও চোখের আড়াল করি না—আড়ালে আবছায়ায় থেকে সর্বদাই পাহারা দিই। এজন্যে অপদস্থ হয়েছি অনেকবার। তবু আমার জিদ রেখেছি বজায়! অরুণবাবু বাড়ি থেকে বেরুলেই আমার লোক নেয় তাঁর পিছু।'

বরুণ বললে, 'বুঝেছি, আর ব্যাখ্যার দরকার নেই। কাল আপনার চরকে পিছনে নিয়ে অরুণ আমার বাসায় এসেছিল?'

প্রশান্ত গর্বিত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ। আমার জিদেরই জয়!'

—'আচ্ছা, ভবিষ্যতে আরও সাবধান হব।'

—'হতে পারেন—কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে নয়।'

—'তাহলে আপনার বিশ্বাস, আমাকে বহুকাল ধরে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে?'

—'কেন, আপনিও কি এটা বিশ্বাস করেন না?'

—'না।'

—'আপনার বিরুদ্ধে রুজু হবে ডাকাতির মামলা। একটা-দুটো ডাকাতি নয়, অনেকগুলো ডাকাতির জন্যে।'

—'আমি ডাকাত নই। আমি পাপীকে শাস্তি দিই, গরিবের উপকার করি।'

—'আপনি শাস্তি দেবার কে? পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যে আছেন রাজা। রাজার রাজদণ্ড যে নিজের হাতে নেয়, রাজা তাকে ক্ষমা করেন না। শিশুও একথা জানে।'

—'আমিও জানি। আর রাজদণ্ড এড়াবার উপায়ও আমার অজানা নয়।'

—'জেল ভেঙে পালাবেন ভাবছেন? কিন্তু জানেন কি, আপনার জন্যে বিশেষ পাহারার ব্যাবস্থা করবার হুকুম হয়েছে?'

—'সে হুকুম যারা পালন করবে, তারাও আমাকে জেলের ভিতরে ধরে রাখতে পারবে না। আমি পালাবোই পালাবো। এই নিয়ে আমি বাজি রাখতেও রাজি আছি।'

প্রশান্ত বললে, 'বাজি রাখবার দরকার নেই বরুণবাবু। কর্তব্যের খাতিরে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব। আমার সে প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে। আপনার ওপরে আমার আর কোনও রাগ বা আক্রোশ নেই। এর পর আপনি মুক্তি পেলেও আমি দুঃখিত হব না।'

প্রশান্তের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করে বরুণ হাসতে হাসতে বললে, 'ধন্যবাদ।'

ব্যাধের ফাঁদ

প্রথম

বন্দী দীনবন্ধু

দৈনিক 'বিশ্ববন্ধু'র উক্তি ঃ 'দীনুডাকাত ধরা পড়িয়াছে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়েন্দাবিভাগের ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চৌধুরীর নাম আজ কতখানি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদ কাহারও কাছে অবিদিত নাই।

যদিও গ্রেপ্তারের পূর্বমুহূর্তে অজ্ঞাত কোনও আততায়ীর গুলিতে আহত না হইলে দীনু হয়তো আবার পুলিসকে ফাঁকি দিতে পারিত, তবু প্রশান্তবাবুর বিশেষ যোগ্যতার কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

সকলেই জানেন, দীনু সাধারণ দস্যু নয়। যাহারা দীনের শত্রু তাহাদের টাকা কাড়িয়া লইয়া সে দরাজ হাতে বিতরণ করিত গরিব-দুঃখীদের মধ্যে এবং সেইজন্য তাহার এই দুর্দিনে জনসাধারণের সহানুভূতি রীতিমতো জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এবং জনসাধারণের উপরে তাহার প্রভাব যে কতটা অসাধারণ, সম্প্রতি দীনুর বিচার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রতিদিন তাহাকে একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য বিচারালয়ের সম্মুখভাগে বিরাট এক জনতার সৃষ্টি হয়—পুলিস লাঠি চালাইয়াও সে-জনতাকে ঠেকাইতে পারে না! পুলিসের লাঠির কোনও তোয়াক্কা না রাখিয়া অনেকে চিৎকার করিয়া ওঠে—'জয়, দীনবন্ধুর জয়!' জনতার প্রত্যেক লোকের মুখের ভাব দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন দেবদর্শন করিতে আসিয়াছে! যেমন বাহিরে, বিচারালয়ের ভিতরেও তেমনই লোকারণ্য। সময়ে সময়ে জনতার কোলাহলে বিচারকার্যেও বাধা উপস্থিত হয়। কোনও অপরাধীর এমন জনপ্রিয়তা কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু যে দীনুডাকাতের দোর্দণ্ডপ্রতাপে একদিন অসাধু ও অত্যাচারী ধনীরা ছিল ভয়ে থরহরি কম্পমান, আজ তাহার দশা দেখিলে মনে দুঃখের সঞ্চার হয়। আজ দীনুর কেশ বিশৃঙ্খল, দৃষ্টি ভীত ও নিস্তেজ, মুখ কাঁদো-কাঁদো, বর্ণ মলিন এবং দেহ এমনি দুর্বল যে, চলিতে গেলে সে টলিয়া পড়ে! সে কোনোদিকে তাকায় না, জেলখানার গাড়ি থেকে নামিয়া হেঁটমুখে একেবারে বিচারালয়ের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। তাহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য এমন যে বিপুল জনতার সৃষ্টি হইয়াছে, এটা লক্ষ্য করিবার আগ্রহও তাহার নাই! আজ দীনুকে দেখিলে সন্দেহ হয়, এতদিন তাহার সাহস ও বীরত্বের যেসব আশ্চর্য কথা শুনা গিয়াছিল, তাহার মূলে কোনোই সত্য নাই। রাজদণ্ডের ভয়ে সাধারণ কাপুরুষ অপরাধীর মতোই সে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে!..........'

এইটুকু পড়েই অরুণ খবরের কাগজখানা ক্রোধভরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'বরুণের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীর তুলনা! বরুণ কাপুরুষ! হতভাগ্য সম্পাদক আমার বন্ধুকে চেনে না!'

সে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর নিজের মনে-মনেই বললে, 'কিন্তু

খবরের কাগজের এ বর্ণনা কি সত্য? পুলিসের আর বাইরের লোকের কাছে বরুণ দীনু-ডাকাত নামে পরিচিত বটে, কিন্তু সাধারণ ডাকাতের মতো আইনের ভয়ে কাবু হবার ছেলে তো সে নয়! তবে কেন তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, কেন তার দেহে দুর্বলতার লক্ষণ?'

ভেবে কোনও কূল-কিনারা না পেয়ে অরুণ ডাক দিলে, 'শ্রীধর! ও শ্রীধর! এক কাপ চা নিয়ে এসো তো!'

জবাব এল, 'আজ্ঞে, যাই।'

অরুণ খবরের কাগজখানা আবার মাটির উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর গত বিচারের দিনে কে কি সাক্ষ্য দিয়েছে মন দিয়ে তা পাঠ করতে লাগল।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রবেশ করলে শ্রীধর। যাঁরা গোড়া থেকে বরুণ বা দীনবন্ধু বা দীনুডাকাতের জীবনকাহিনী পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রীধরকে ভোলেন নি। সে আগে ছিল সাধারণ ডাকাত, কিন্তু বরুণের প্রভাবে পড়ে ডাকাতি ছেড়ে এখন হয়েছে অরুণের বিশ্বস্ত ভৃত্য।

চায়ের পেয়ালা হস্তগত করে অরুণ বললে, 'শ্রীধর, কাগজওলারা কি বলে জানো?'

—'কি বলে?'

—'বরুণ নাকি কাপুরুষ!'

শ্রীধর তার ঝাঁটাগোঁফের তলায় একটুখানি হাসির রেখা ফুটিয়ে বললে, 'তোমার কথা শুনে, নিধুবাবুর একটা গান মনে পড়ছে।'

—'কি রকম?'

—'ওই গানে আছে—

'মাতঙ্গ পড়িলে দলে,
পতঙ্গতে কি না বলে,'

আজ হাতি পাঁকে পড়েছে বলে ব্যাঙেরা সব লাফালাফি শুরু করেছে। করুকগে—তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি, আর বড়দাদাবাবুরই বা কি?'

—'এতে আমাদের অনেকখানিই আসে-যায় শ্রীধর! বরুণ যে আমাদের সব!'

—'তুমি কিছু ভেবোনা ছোটদাদাবাবু, আমার বড়দাদাবাবু আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।'

—'শ্রীধর, তুমি পাগলের মতন কথা বলছ। বরুণ কখনও নরহত্যা করেনি বটে, কিন্তু তার নামে ডাকাতির মামলা আছে একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো। হয়তো তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হবে—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই।'

—'তবু আমি ভাবি না। বড়দাদাবাবুকে ওরা যদি দ্বীপান্তরে পাঠায়, তাহলে তিনি সাঁতরে কালাপানি পার হয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসবেন!'

—'কী যে বলো শ্রীধর! বরুণ মানুষ, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে না।'

—'আমার কাছে বড়দাদাবাবু মানুষ নন, তিনি সর্বশক্তিমান দেবতা!' বলেই বরুণের উদ্দেশে একটা প্রণাম করে শ্রীধর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে অরুণ মনে মনে বললে, 'বরুণের শক্তির ওপরে শ্রীধরের অসীম বিশ্বাস! এমন বিশ্বাস যদি আমারও থাকত তাহলে বরুণের শোকে আজ আমাকে এমন হতভাগ্য জীবন যাপন করতে হত না।'

তার চা-পান যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বৈঠকখানার বাইরে হঠাৎ পায়ের শব্দ হল। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটি নামিয়ে রেখে অরুণ ফিরে দেখলে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে ইনস্পেক্টার প্রশান্ত চৌধুরী।

অরুণের মুখের উপরে ফুটে উঠল বিরক্তির চিহ্ন।

প্রশান্ত একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'অরুণবাবু কি আমার ওপরে রেগেছেন?'

—'কেন, রাগব কেন?'

—'আপনার বাল্যবন্ধু বরুণ—অর্থাৎ দীনুডাকাতকে আমি গ্রেপ্তার করেছি বলে?'

—'আপনি পুলিসের লোক। নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। রাগ করবার অধিকার আমার নেই।'

—'কিন্তু বিশ্বাস করুন অরুণবাবু, দীনুকে গ্রেপ্তার করেও আমি সুখী নই।'

—'কেন?'

—'দীনু একদিন আমার প্রাণ রক্ষা করছিল। এজন্যে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

—'পুলিসের কৃতজ্ঞতার কোনও মূল্যই নেই, সুতরাং ও-কথা যেতে দিন। এখন বলুন দেখি, এখানে আবার কেন আপনার অশুভ আবির্ভাব? আপনি আমাকেও গ্রেপ্তার করতে চান নাকি?'

—'আপনাকে গ্রেপ্তার করব? কি আশ্চর্য, কেন?'

—'বরুণের বন্ধু বলে?'

—'অরুণবাবু, আপনি কি আমাকে এতবড়োই গাধা বলে মনে করেন?'

—'রক্ষা করুন মশাই, পুলিসকে গাধা মনে করবার দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু এটুকু আমি মনে করি, অধীনের গরিবখানায় যখন এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

—'হ্যাঁ, এটা আপনি মনে করতে পারেন।'

—'তাহলে বলে ফেলুন মশাই, দয়া করে বলে ফেলুন! কী উদ্দেশ্য আপনার? বরুণের বিরুদ্ধে আমার মুখ থেকে নতুন কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে চান?'

—'অরুণবাবু, আপনাকে আমি বন্ধুর মতন দেখি।'

—'অন্যায় করেন। বরুণের শত্রুকে আমি কোনোদিন বন্ধু বলে মানতে পারব না।'

—'আপনি বড়োই নিষ্ঠুর।'

—'মানলুম। কিন্তু ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন। স্পষ্ট ভাষায় বলুন, আপনার কোন হুকুম আজ আমাকে মানতে হবে?'

—'হুকুম নয় অরুণবাবু, অনুরোধ।'

—'অনুরোধ? পুলিসের অনুরোধ? জোনাকীর কাছে চাঁদের আলোকপ্রার্থনা? প্রশান্তবাবু, এইবারে আপনি হাসালেন মশাই!'

এতক্ষণ পরে প্রশান্ত একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'আপনি তো আমাকে বসতে বললেন না, কাজেই নিজেকে নিজের সাহায্য করতে হল।'

—'আজ পুলিসের এই অসম্ভব বিনয় দেখে সত্যিই আমার ভয় হচ্ছে।'

এইবারে প্রশান্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'অরুণবাবু, আপনি দেখছি এক হাতেই তালি বাজাতে চান। আমি ভালো বললেও আপনি ঝগড়া করবেন! পুলিস, পুলিস, পুলিস! হ্যাঁ, আমি পুলিস, সরকারি নিমক খেয়ে কর্তব্যপালনের চেষ্টা করি বটে! কিন্তু আমার এই ইউনিফর্মের তলায় কি সাধারণ মানুষেরই হৃদয় নেই? পুলিসের লোকের কি মা বা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধুবান্ধব কেউ নেই? আর, দেশের আর দশের উপকারের জন্যেই কি পুলিসের সৃষ্টি নয়? কর্তব্যপালনের পরেও কি পুলিস সাধারণ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে না? আজ কেন আমি এখানে এসেছি জানেন? দীনুডাকাতকে বাঁচাবার জন্যে!'

অরুণ হতভম্বের মতন থেমে থেমে বললে, 'দীনুডাকাতকে—বাঁচাবার জন্যে! মানে?'

প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'আবার বলি, বিশ্বাস করুন অরুণবাবু! দীনুকে গ্রেপ্তার করেই আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে, এখন আর আমি তার শত্রু নই—কারণ তার দয়াতেই আজ আমি এই দুনিয়ায় বেঁচে আছি। আমি দীনুর মৃত্যু দেখতে চাই না, আমি চাই তাকে বাঁচাতে!'

অরুণ বিস্মিত ভাবে বললে, 'আপনার কথা এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না। বরুণের কি হয়েছে?'

—'আপনার বন্ধু ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে মৃত্যুর পথে।'

অরুণ বিদ্যুতাহতের মতন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মৃত্যুর পথে! বরুণ কি পীড়িত?'

—'হ্যাঁ, তাই আমি মনে করি। আজ আপনার বন্ধুকে দেখলে আপনিও হয়তো চিনতে পারবেন না!'

—'কী অসুখ হয়েছে তার?'

—'জানি না। হয়তো বনের পাখি খাঁচায় এলে এমনই অবস্থা হয়। দীনু হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেনি বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে।'

—'বরুণ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে?'

—'প্রায়। সে যা খায়, তাকে খাওয়া বলে না। তার ওজন কমে গেছে পঁচিশ পাউন্ড। সে কারুর সঙ্গে—এমন কি আমার সঙ্গেও কথা কয় না। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে, আর কী যে ভাবে সেইই জানে! কোর্টে এসে কাটগড়ার ভিতরে সে চুপ করে বসে-বসে প্রচণ্ড মাতালের মতন যেন ঝিমোতে থাকে—চারিদিকে জনতা, উকিল-ব্যারিস্টারের তর্কাতর্কি, বিচারকের প্রশ্ন,—কিন্তু সে যেন পাথরের পুতুলের মতন নির্বিকার, কোনোদিকে তাকায় না, তার চোখ থাকে মাটির দিকে, কারুর কোনও কথা শুনছে বলেও মনে হয় না! কেবল তার মনের নয়, দীনুর দেহেরও যে ভঙ্গুর অবস্থা, তাতে তার হাতে হাতকড়ি দেওয়াও মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা দেওয়ার মতো! কিন্তু বড়োসাহেবের হুকুম, হাজত থেকেই তার হাতে যেন হাতকড়ি পরিয়ে কোর্টে আনা হয়—কারণ সে হচ্ছে বিপদজনক

ব্যক্তি! আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম পালন করছি, এ ছাড়া উপায় কি বলুন? কিন্তু তবু আমি ভুলতে পারি না, এই দীনুই আমার জীবনরক্ষা করেছে—নিজের জীবনও বিপন্ন করে! আমার কি বিশ্বাস জানেন? দীনুকে কেউ দণ্ড দিতে পারবে না,—বিচার শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হবে!'

অরুণ চিন্তিত ভাবে বললে, 'প্রশান্তবাবু, আপনার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। পৃথিবীতে বরুণের চেয়ে আর কারুকে আমি বেশি ভালোবাসি না।'

প্রশান্ত বললে, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি চেষ্টা করলে আপনার বন্ধুকে হয়তো বাঁচাতে পারেন। আর সেই কথা বলবার জন্যেই আজ আমি এসেছি।'

—'আমি কি চেষ্টা করব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

—'হাজতে গিয়ে দীনুর সঙ্গে আপনি একবার দেখা করবেন?'

—'কেন?'

—'দীনুকে উৎসাহিত করবার জন্যে। তাকে ভালো করে বুঝিয়ে আসুন, এভাবে আত্মহত্যা করে কোনোই লাভ নেই। আপনার কথায় সে আবার উচিতমতো পানাহার করতে পারে।'

অরুণ একটু ভেবে বললে, 'প্রশান্তবাবু, আপনি জানেন, বরুণ ধরা পড়বার পর থেকেই আমি আর তার সঙ্গে দেখা করিনি? বরুণকে বন্দীঅবস্থায় দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সে করুণ দৃশ্য সহ্য করতে পারব না।'

প্রশান্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'সে কি, বন্ধুর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করবেন না!'

অরুণ বললে, 'আমার চেষ্টায় কোনও ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না। যে নিজে মরতে চায় তাকে আমি উৎসাহিত করব কেমন করে? আর কিসের জন্যেই বা উৎসাহিত করব? আপনাদের জেলখানায় চিরকাল বাস করবার জন্যে? না, না, আমারও মতে সে-অপমান সহ্য করার চেয়ে বরুণের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়!'

প্রশান্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'দেখছি, আপনারা দুই বন্ধুই এক ধাতুতে গড়া।'

—'হ্যাঁ প্রশান্তবাবু, তা নইলে আমাদের বন্ধুত্ব এতটা প্রগাঢ় হতে পারত না। আমি বরুণকে ভালো করেই জানি। সে হচ্ছে তেপান্তরের মুক্ত বাতাসের মতন, কোনোদিনই কারুর অধীন হতে পারবে না। ভাবছেন, বন্দী করে আপনারা বরুণকে শাস্তি দেবেন? না, সে-সুযোগ সে দেবে না। আমারও বিশ্বাস, দণ্ডলাভের আগেই তার মৃত্যু হবে।'

প্রশান্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'বড়োই দুঃখের কথা, বড়োই দুঃখের কথা! দীনুর মতন লোক যে এমন ভাবে নিজেকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যাবে, এ আমার মোটেই ভালো লাগছে না। আর সব দিক দিয়েই দীনু হচ্ছে উজ্জ্বল রত্ন, তার একমাত্র অপরাধ, রাজার আইনকে সে মানে না।'

অরুণ বললে, 'দীনুর পথ ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই

না। তবে তার পরিণাম যে এমন শোচনীয় হল, এইটেই হচ্ছে আক্ষেপের কথা। দেখুন প্রশান্তবাবু, একদিন আমি একটি কাঠবিড়ালীর বাচ্ছা ধরেছিলুম। তার জন্যে একটি ছোট্ট বাসা তৈরি করে দিলুম আর তাকে খেতে দিলুম ভালো ভালো খাবার—সে-রকম লোভনীয় খাবার বোধহয় কখনও সে খেতে পায়নি। কিন্তু তবু সে এককণা খাবারও স্পর্শ করলে না। অনাহারেই সে দুদিন কাটিয়ে দিলে—কোনও রকমেই তাকে খাওয়াতে পারলুম না। একটা সামান্য কাঠবিড়ালীও বন্দীজীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই বরণীয় মনে করলে। তৃতীয় দিনে দেখলুম তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তখন পাছে সে মারা পড়ে সেই ভয়ে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলুম।'

প্রশান্ত গাত্রোত্থান করে বললে, 'কিন্তু রাজার আইন বড়োই কঠিন অরুণবাবু! দীনু না বাঁচলেও আইন তাকে মুক্তি দেবে না।'

দ্বিতীয়
দীনুর কাণ্ড

আজ দীনুডাকাতের বিচারের দিন। অন্যান্য দিনের মতন আজও বিচারালয়ের ভিতরে ও বাইরে দেখা যাচ্ছে সেই একই দৃশ্য—চারিদিকে কেবল কৌতূহলী মানুষের ভিড়। বরং আজ যেন জনসমাগম হয়েছে আরও বেশি। কেবল বাঙালি নয়, জনতার ভিতরে দেখা যাচ্ছে আরো নানান-জাতের লোক। সকলেই জেলখানার গাড়ি আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে সাগ্রহে।

রাস্তাতেও যতদূর চোখ চলে দেখা যায় কেবল লোকের পরে লোক। বিচারালয়ের আঙিনায় আর তিলধারণের ঠাঁই নেই বলে তারা আশ্রয় নিয়েছে পথের উপরেই। যদিও তারা জানে যে জেলের গাড়ির দরজা-জানলা ভিতর থেকেই বন্ধ থাকবে এবং দীনুকে সেখান থেকে দেখবার কোনও উপায়ই নেই, তবু দীনুর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও তারা যেন কৃতার্থ হতে চায়! মাঝে মাঝে জনতার ভিতরে হচ্ছে যষ্টিধারী পুলিসের আবির্ভাব, কিন্তু লোক সরাতে এসে পুলিসই যেন তলিয়ে যাচ্ছে সেই বিরাট জনসাগরের মধ্যে। সার্জেন্ট ও পাহারাওয়ালাদের ধাক্কায় একদল লোক যদি সরে যায়, অমনি আর একদল লোক এগিয়ে এসে সেই শূন্য স্থানটুকু আবার পূর্ণ করে দেয়—যেন একটা তরঙ্গের পরে আসছে আর একটা তরঙ্গ। সে-জনতাকে সামলানো অসম্ভব। থেকে থেকে ভিড়ের মধ্যে কোনোরকমে পথ করে নিয়ে মোটরের পর মোটর আসছে এবং গাড়ির ভিতর থেকে নামছেন উকিল, ব্যারিস্টার ও বিচারকরা।

হঠাৎ খানিক দূরে জনসাগর যেন উথলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠে উচ্চ চিৎকার শোনা গেল—'জয় দীনবন্ধুর জয়, জয় দীনবন্ধুর জয়, জয় দীনবন্ধুর জয়!' অমনি জনতার প্রত্যেক লোকই বিপুল আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে উঠল। এবং কারাগারের গাড়ি উঠোনে যেখানে এসে দাঁড়াবার কথা, দলে দলে লোক সেইদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভিড়ের ভিতরে বারংবার বাধা পেয়ে জেলখানার গাড়িখানা অবশেষে বিচারালয়ের অঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করলে এবং গাড়ির ভিতর থেকে প্রথমে নামল একজন সশস্ত্র সার্জেন্ট। তারপর দেখা গেল দীনুডাকাতকে।

প্রশান্ত চৌধুরী দীনুর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করেনি। সত্যিই আজ তার অবস্থা শোচনীয়, মলিন মুখ, শীর্ণ দেহ, নুয়েপড়া মাথা—এ যেন সে দীনুই নয়। এ যেন একটা জ্যান্ত মড়া!

আচম্বিতে জনতার ভিতরে জাগল বিষম এক চাঞ্চল্য। বিকট চিৎকার, গালাগালি, মারামারি! সূর্যালোকে হঠাৎ শূন্যে জ্বলে উঠল কয়েকখানা চকচকে ছোরা।

গাড়ির দরজার কাছে যে সার্জেন্টটা দাঁড়িয়েছিল, সচকিতে মুখ ফিরিয়েই সেই দিকে সে তাকিয়ে দেখলে এবং পরমূহূর্তে গাড়ির ভিতর দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে যে, এতক্ষণ মরোমরোর মতো দীনুডাকাত যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই!

বিচারালয়ের দোতলার বারন্দার উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে স্বয়ং প্রশান্ত চৌধুরী। উপর থেকে সে সবিস্ময়ে দেখলে, গাড়ি থেকে নেমেই মৃতকল্প দীনুর দেহ হঠাৎ যেন অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠল! সার্জেন্টের একমুহূর্ত অসতর্কতাই তার পক্ষে হল যথেষ্ট। বিদ্যুতের মতন সে একলাফে ভিড়ের ভিতরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল এমন-এক জনতার নিরেট প্রাচীর, যা ভেদ করে আর কোনও চক্ষুই তাকে আবিষ্কার করতে পারলে না।

প্রশান্ত উপর থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'পাকড়ো! পাকড়ো! আসামি ভাগতা হ্যায়। সেপাই, সেপাই!' এবং সেইভাবে চেঁচাতে চেঁচাতেই সে বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচের দিকে।

ততক্ষণে জনতার যেখানে মারামারি হচ্ছিল, পাহারাওয়ালারা সেইদিকে ছুটে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে মারামারি থেমে গেল এবং ছোরাগুলো হল আবার অদৃশ্য! পুলিসের লাঠির আঘাতে কয়েকজন লোক জখম হল, বাকি লোকগুলো যে যেদিকে পারলে ছুটে পালাতে লাগল।

প্রশান্তের উদভ্রান্ত দৃষ্টি ঘুরতে লাগল চারিদিকে। কোথায় দীনু, কোথায় দীনু? ভিড় যেন তাকে গপ করে গিলে ফেলেছে!

না, না—ওইযে দীনু! ওইযে দীনু! হাঁ, ফটকের সামনে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে দীনু স্বয়ং! প্রশান্ত ফটকের দিকে ছুটতে ছুটতে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই, ওই আসামি পালাচ্ছে! ধরো, ধরো—ওকে ধরো!'

সার্জেন্ট ও পাহারাওয়ালারা দৌড়ে গিয়ে বাঘের মতন দীনুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীনু তাদের এড়াবার চেষ্টা করেও পারলে না, সকলে মিলে তাকে চেপে ধরে টানতে-টানতে আবার ভিতরের দিকে নিয়ে আসতে লাগল।

দুই-হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে দীনু মাটির উপরে বসে পড়ল। তার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, মনের দুঃখে সে কেঁদে ফেলেছে।

প্রশান্ত তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দীনু, পুলিসকে ফাঁকি দেওয়া কি এতই সহজ?'

দীনু সেইভাবেই বসে রইল, কোনও জবাব দিলে না।

—'শুনছ দীনু, মুখ তোলো।'

কিন্তু দীনু মুখ তুললে না।

—'মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? কিন্তু লজ্জা করে আর লাভ কি ভায়া, উঠে দাঁড়াও। কোর্টের ভেতরে চলো।'

তবু দীনু ওঠবার চেষ্টা করলে না।

তখন একজন সার্জেন্ট এগিয়ে গিয়ে জোর করে টেনে তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিলে, কিন্তু তখনও দীনু হাত দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করছে।

প্রশান্ত নিজের দুই হাত দিয়ে দীনুর হাত-দুখানা টেনে নিচের দিকে নামিয়েই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'একি! কে তুই? তোকে দীনুর মতন দেখতে বটে, কিন্তু তুই তো দীনু নস!'

সত্য, তাকে দেখতে প্রায় দীনুর মতোই বটে। তার মুখ, দেহ ও কাপড়-চোপড় সমস্তই দীনুর মতো, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি!

প্রশান্তের মনের ভিতরে আসল ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দীনুর শিষ্যরা আজ এখানে একটা সুপরিকল্পিত নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় করে গেল। সমস্ত বন্দোবস্তই আগে থাকতে ঠিক করা ছিল। ওই আকস্মিক মারামারিটা হচ্ছে একটা সাজানো ব্যাপার। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুলিসের চোখকে হঠাৎ অন্যমনস্ক করা। তারপর পুলিস যখন নকল দীনুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে, আসল দীনু সেই ফাঁকে সকলকে কলা দেখিয়ে অদৃশ্য হবে যবনিকার অন্তরালে। খুবই সহজ কৌশল, কিন্তু কী ফলপ্রদ!

হতাশভাবে জেলখানার গাড়ির ভিতর দিকে তাকিয়েই প্রশান্তের দৃষ্টি আবার চমকে উঠল!

গাড়ির তলায় পড়ে রয়েছে একজোড়া হাতকড়া—যা পরানো ছিল দীনুডাকাতের হাতে!

তৃতীয়

নীলপত্র

রাত তখন এগারোটা।

ফিরতে দেরি হবে বলে প্রশান্ত বাড়িতে বলে গিয়েছিল, তার খাবার যেন ঢাকা-চাপা দিয়ে রাখা হয়। জামা-কাপড় ছেড়ে সে খাবার জায়গায় গিয়ে বসল, কিন্তু লোহার ঢাকনাখানা তুলেই তার চক্ষু হল স্থির!

থালায় খাবারের সঙ্গে রয়েছে একখানা নীল রঙের খাম—তার উপরে লাল কালিতে নাম লেখা, শ্রীযুক্ত অশান্ত চৌধুরী। আবার সেই বিখ্যাত নীলপত্র! এ পত্র যে কোথা থেকে আসছে প্রশান্তর তা বুঝতে দেরি হল না। এতদিন নীলপত্রের লেখক ছিল হাজতের মধ্যে আবদ্ধ।

সে নীলপত্রের দিকে স্থির চক্ষে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চিৎকার করে নিজের স্ত্রীকে ডাকলে।

তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বামীর চিৎকারে হল তার নিদ্রাভঙ্গ। তাড়াতাড়ি নিচে এসে শুধোলে, 'খেতে বসে অত গর্জন করছ কেন? হল কি?'

প্রশান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'হবে আবার কি, আমার ঘরে এসেছে শনির ভেট! থালার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

তার স্ত্রীর কাছেও নীলপত্র অপরিচিত ছিল না। থালার দিকে তাকিয়েই সে চমকে উঠল!

প্রশান্ত বললে, 'গারদ থেকে বেরিয়েই দীনু আবার নীলপত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে? কিন্তু কথা হচ্ছে, চিঠিখানা খাবারের থালায় এনে রেখে গেল কে?'

স্ত্রী বললে, 'কেমন করে জানব বলো? তোমাদের দীনুডাকাত সব করতে পারে! মনে আছে, একদিন সে দলবল নিয়ে তোমার বাড়িতেই নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল?'

প্রশান্ত বললে, 'মনে নেই আবার! কেবল কি খেয়েই গিয়েছিল? তোমার সঙ্গে ভাব করে গল্প করে আসর জমাতেও বাকি রাখেনি! দেখছি আবার সে আমাকে হাড়ে-মাসে জ্বালিয়ে মারবে। কিন্তু বলো দেখি, আমার খাবার সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল কে?'

স্ত্রী বললে, 'বামুনঠাকুর।'

—'ঠাকুর? সে এখন এখানে নেই তো?'

—'না, রেঁধে-বেড়ে বাসায় চলে গিয়েছে।'

রহস্যটা বুঝতে প্রশান্তর বিলম্ব হল না। তাদের পুরানো রাত-দিনের পাচক আজ সকালেই ছুটি নিয়ে একমাসের জন্যে দেশে চলে গিয়েছে এবং যাবার সময় দিয়ে গিয়েছে এই নতুন ঠিকা লোকটাকে।

প্রশান্ত বললে, 'এ নিশ্চয়ই সেই ব্যাটার কাজ। দীনুর চর হয়ে সে এখানে এসেছে। কাল আর কাজ করতে আসবে না বোধহয়।'

স্ত্রী ভয় পেয়ে বললে, 'ওগো, ও খাবার আর তোমাকে খেতে হবে না! ওর সঙ্গে যদি বিষ-টিষ কিছু মিশিয়ে গিয়ে থাকে?'

প্রশান্ত চিঠিখানা তুলে নিয়ে মাথা নেড়ে বললে, 'না গিন্নী, দীনুকে আমি চিনি। সে খুনি নয়। এখন চিঠি পড়ে দেখি, কি সংবাদ!'

খামের ভিতর থেকে চিঠি বার করে নিয়ে প্রশান্ত পড়তে লাগল :

'অশান্ত-ভায়া,

মেজাজ আজ নিশ্চয়ই ভালো নেই? তা থাকবে কেমন করে? দীনু আবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালে তো?

ভেবেছিলে, দীনুকে জোর করে পাঠাবে আন্দামান ভ্রমণ করতে? তোমার বড়ো আশার বাতি নিবে গেল, না?

তুমি জানো অশান্ত, দেশে দেশে ভ্রমণ করতে আমি খুব ভালোবাসি? আন্দামানে হয়তো আমি গেলেও যেতে পারতুম, তবু আমার আপত্তি কেন শুনবে? ও-জায়গাটা স্বাস্থ্যকর নয়। ওখানে গেলে নাকি খালি দেহ নয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে মনও।

গর্দভাবতার, তুমি ভেবেছিলে হাজতে মনের দুঃখে দীনু করেছিল আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ? মোটেই নয়, মোটেই নয়। আমি অভিনয় করতুম তোমাদের ভোলাবার জন্যেই। খাওয়া-দাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছিলুম, কারণ আমি চেয়েছিলুম দেহকে রোগা করতে। সর্বদা মন-মরার মতন পড়ে থাকতুম, যাতে তোমরা ভাবো আমার জীবনীশক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে আর ক্রমেই আমি চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ছি। আমি জানতুম এইভাবে অভিনয় করলে পুলিসের রাহুর দৃষ্টি ক্রমেই অসতর্ক হয়ে পড়বে। পুলিস ভাববে আমার আর পালাবারও ক্ষমতা নেই। কেমন, তোমরা তাই ভাবোনি কি?

আমাকে বন্দী করে তোমরা খুব নিশ্চিন্ত ছিলে। কিন্তু আমার মস্তিষ্ককে বন্দী করতে পেরেছিলে কি? হাজতের অন্ধকারে বসেও আমি রীতিমতো মস্তিষ্ক চালনা করতুম। আর বাইরের জগতের সঙ্গে আমার যে রীতিমতো খবরের আদান-প্রদান চলত, এ-খবর কি পেয়েছিলে তোমরা? বেঁচে থাক আমার চেলা ছোট্টুলাল। আমার প্রত্যেক ইঙ্গিতটি বুঝে সে গড়ে তুলেছিল এক সুন্দর নাটকের পরিকল্পনা। আজ সকালেই তোমরা সেই নাটকের রূপটি স্বচক্ষে দেখেছ।

যেদিনই আমি বন্ধ গাড়িতে চড়ে বিচারালয়ে বেড়াতে যেতুম, সেইদিনই প্রায় তোমাদের চোখের সামনে—অথচ সকলের অগোচরেই হত সেই চমৎকার নাটকটির নিয়মিত রিহার্সাল। ঠিক কখন কোথায়, কাকে কিভাবে কোন কাজ করতে হবে, আগে থাকতেই ঘড়ির কাঁটা ধরে সমস্তই ঠিক করা ছিল। জনতার ভিতরে আমার দ্বারা নিযুক্ত কত লোক ছিল, তুমি কল্পনা করতে পারো? চুপিচুপি বলি শোনো। মোট তিনশো জন।

তারপর, দ্বিতীয়—অর্থাৎ নকল-দীনবন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো? তাকে ছেড়ে দিয়ো। আমি দরকার হলে তাকে ব্যবহার করব বলে মাসে মাসে মাইনে দিয়ে আসছি বটে, কিন্তু সে আমার দলের লোক নয়। আমার গুপ্তকথা সে কিছুই জানে না। আসলকে যখন পেলে না, নকলকে নিয়ে আর কি করবে বলো?

যতই রিভলবার আর বন্দুকের ছড়াছড়ি করো, চারিদিকে যতই সেপাই-শান্ত্রী সাজিয়ে রাখো, এ-সবের কোনোই মূল্য নেই। মানুষের মন বড়ো মজার জিনিস। অস্ত্র-শস্ত্রের পিছনে থাকে মানুষের যে মন, আগে জানা দরকার সেই মনেরই গুপ্তকথা। কোন সময়ে কোন ঘটনা মানুষের মনের উপর কি রকম কাজ করবে, এটা দেখতে ও বুঝতে কখনও আমি ভুলি না। আমি বেশ জানতুম, যথাসময়ে বিচারালয়ের সামনে একটি মিথ্যা দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিনয় করলে বিশেষ সতর্ক প্রহরীর দলও ভুলে যাবে স্থান-কাল-পাত্রের কথা। আর সেই সময়টিই হচ্ছে আমার পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছি, আজ আবার তাই আমি স্বাধীন।

তোমরা নকল দীনুর দিকে ধাবিত হলে সদলবলে, আসলের দিকে চোখ রাখলে না কেউই। পুলিসের লাঠির ভয়ে লোকজনরা যখন দিকে দিকে পালাতে লাগল, আমিও তাদের সঙ্গে ছুটলুম ফটকের বাইরে। ফটকের কাছে সেপাই ছিল, সে আমাকে দেখেও দেখলে না। আর আমার সেই ধাবমান মূর্তিকে হঠাৎ দেখলেও সে বোধহয় চিনতে পারত না। কারণ ভিড়ের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়েই বন্ধুদের অনুগ্রহে আমি পেয়েছিলুম ছোট্ট একটি গোঁপ আর দাড়ি। সে দুটি জিনিস যথাস্থানে সংলগ্ন করতে আমার তিন-চার সেকেন্ডের বেশি লাগেনি। এক জোড়া রঙিন চশমাও পেয়েছিলুম। কাজেই সহজে আমাকে চেনবার জো ছিল না।

শুনেছি, তোমরা ভেবেছিলে—রাস্তায় গিয়ে আমি কোনও মোটরে চড়ে পলায়ন করেছি। সেই কাল্পনিক মোটরখানাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুলিসের লোকরা আজ পথে পথে হানা দিয়ে বেরিয়েছে, তবু সেখানাকে আবিষ্কার করতে পারে নি কেন, জানো? কারণ আমি কোনও মোটরই ব্যবহার করিনি, করেছিলুম কেবল নিজের শ্রীচরণভরসা। আমি দৌড়াদৌড়িও করিনি, ধীরে-সুস্থে আর পাঁচজনের সঙ্গে বাসায় ফিরে এসেছি পদব্রজে। মোটর ব্যবহার করলে হয়তো তোমরা আমাকে আবার ধরে ফেলতে পারতে।

যাক, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে একদিন আমাকে গ্রেপ্তার করবে। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, বিচারকের দণ্ড আমি গ্রহণ করব না। আমরা দুজনেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। গায়ে-গায়ে শোধ হয়ে গিয়েছে, কেমন?

স্বাধীন হয়েই আমি প্রথম কি কাজ করেছি শুনবে? মহাদেওগুণ্ডার ভাই শঙ্করলালের সন্ধানে দিকে দিকে চর পাঠিয়েছি। জানো, শঙ্করলাল একদিন আমাকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেবার চেষ্টা করেছিল। তারপর তোমার মতন নির্বোধও আমাকে ধরতে পেরেছিল কেবলমাত্র তারই জন্যে। যতদিন না প্রতিশোধ নিতে পারি, শঙ্করলালকে আমি ভুলব না।

জাগ্রত হও অশান্ত চৌধুরী, যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। কখন কে হারে, কে জেতে বলা যায় না। অতএব দুঃখ ত্যাগ করো—শীঘ্রই আবার আমার সংবাদ পাবে।

হ্যাঁ, ভালো কথা। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলেও আমার হাতে মিছামিছি হাতকড়ি পরাবার চেষ্টা কোরো না। ওটা ব্যর্থ শ্রম মাত্র। কারণ, খুব সহজেই হাতকড়ি খোলবার একটি সুন্দর কৌশল আছে। ইতি

'দীনবন্ধু'

... ...

পরের দিন সকালেই প্রশান্ত আবার অরুণের বাড়িতে গিয়ে হাজির।

তাকে দেখে অরুণ মুখ টিপে হাসতে লাগল।

প্রশান্ত মুখভার করে বললে, 'ও হাসির মানে কি?'

অরুণ বললে, 'ভাবছি, আজ থেকে আমি আবার আপনার নজরবন্দী হলুম তো?'

—'নজরবন্দী?'

—'বরুণ-মাছ ধরবার জন্যে আমি হচ্ছি আপনার প্রধান টোপ। আপনি জানেন, বরুণ আমার সঙ্গে দেখা করবেই। তাই আমি হব আপনার নজরবন্দী, আমার বাড়ির চারিধারে থাকবে পুলিসের গুপ্তচরের পাহারা। এ ব্যাপার আগেও হয়েছে। এতদিন বরুণ ছিল হাজতে, তাই আমিও আপনাদের শুভদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম। কিন্তু এখন আবার চাকা ঘুরেছে, তাই আমার জন্যে আবার ঘনঘন আপনার টনক নড়বে,—কি বলেন?'

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে প্রশান্ত বললে, 'আজ আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল—'

—'বুঝেছি। তা বেশ করেছেন এসেছেন। তবে আর একটু আগে এলেই ভালো করতেন।'

—'কেন?'

—'কারণ একটু আগেই বরুণ এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে!'

প্রশান্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, 'দীনু তাহলে এর মধ্যেই এখানে এসেছিল?'

—'এসেছিল, বসেছিল, হেসেছিল, গল্প করেছিল, খাবার খেয়েছিল—আরও কিছু শুনতে চান?'

—'দেখছেন অরুণবাবু, আপনার বাড়ির উপরে নজর রেখে আমরা কিছু অন্যায় করি না?'

—'কিন্তু আপাতত আমার বাড়ির উপরে নজর রেখেও আপনি আর কিছু সুবিধা করে উঠতে পারবেন না।'

—'তাই নাকি? কেন বলুন দেখি?'

—'কারণ মাস-তিনেকের জন্যে আমি বিদেশে যাচ্ছি।'

—'বিদেশ? কোথায়?'

—'পশ্চিমের নানা জায়গায়।'

—'বেড়াতে?'

—'হ্যাঁ। অবশ্য বাড়িখানাকে আমি মাথায় করে নিয়ে যাব না। তার উপরে আপনি যতখুশি নজর দিতে পারবেন।'

—'খালি বাড়ির উপরে নজর দিয়ে লাভ?'

—'লাভ-লোকসান আপনি বুঝবেন।'

একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত বললে, 'একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

—'কি প্রশ্ন?'

—'দীনু কি কিছুদিন এখন চুপচাপ থাকবে? না, আবার আমাকে জ্বালাবে?'

—'তা আমি কেমন করে বলব? তবে সে যে চুপচাপ থাকবার ছেলে নয়, এ আমি জানি। তার মাথায় নিত্য-নূতন ফন্দির উদয় হয়। সে জড়ের মতন বসে থাকতে পারে না। বরং তার সঙ্গে তুলনা করা যায় ঘূর্ণাবর্তের।'

প্রশান্ত নিরাশ ভাবে বললে, 'বড়োই সমস্যায় পড়ে গেলুম মশাই! দেখছি, দীনুই

হবে আমার যমদূত। কারাগারেও যাকে ধরে রাখা যায় না, তাকে সামলানো কি বড়ো চারটিখানেক কথা?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বিদায় নিলে।

চতুর্থ

শঙ্করলাল

চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের সর্দার মহাদেওর কাহিনী আগেই বলা হয়েছে।*

তার ভাই শঙ্করলালও আপনাদের অপরিচিত নয়।

বরুণ অর্থাৎ দীনুর জন্যেই মহাদেও ফাঁসিকাঠে চড়ে এবং শঙ্করলাল তাই বরুণকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেয়।

মহাদেও ছিল বিপুল সম্পত্তির মালিক। তার সন্তান ছিল না, কাজেই এখন এই সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে শঙ্করলালই।

শঙ্করলাল বাস করে রাজা-রাজড়ার মতো। সুসজ্জিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দলে দলে দাস-দাসী, দ্বারবান, কর্মচারি, খান-পাঁচেক মোটরগাড়ি—ঐশ্বর্যের কোনও উপকরণেরই অভাব নেই তার। প্রতি সন্ধ্যায় তার বাড়িতে বসে গান-বাজনার মজলিস—দেশ-বিদেশের বড়ো বড়ো গাইয়েরা এসে শঙ্করবাবুর চিত্তবিনোদন করে।

শঙ্করলাল পশ্চিমের লোক, কিন্তু তাকে দেখলে বাঙালি ফুলবাবু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সে কেবল বাঙালির পোষাকই পরে না, কথাও কয় বাংলায়—যদিও তার কথার টান বুঝিয়ে দেয় যে, সে বাঙালি নয়। কিন্তু শঙ্করের বাইরের চেহারা বিলাসীবাবুর মতন হলে কি হয়, যার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ সে অনায়াসেই লক্ষ্য করতে পারবে যে, তার চোখ-মুখের ভিতর থেকে যখন-তখন ফুটে ওঠে হিংস্র ও নিষ্ঠুর বন্য ভাব!

আর সত্যসত্যই তার ভিতরটাকে ভয়ানক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তার এই বাইরের জাঁকজমক ও বিলাসিতা হচ্ছে পৃথিবীর চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের জন্যে, কিন্তু এর পিছনে লুকানো আছে মারাত্মক রহস্য। আসল ব্যাপার হচ্ছে, শঙ্করলালও আজকাল তার দাদা মহাদেওর মতন হয়েছে শয়তানদের সর্দার।

কলকাতার ভিতরে ও বাংলার বাইরে তার তাঁবে আছে বড়ো বড়ো বদমাইসের দল এবং এইসব দলে আছে শত শত চোর, জালিয়াত, ডাকাত ও হত্যাকারী। ভারতের দেশে দেশে তারা নিরীহ গৃহস্থদের উপরে গিয়ে হানা দেয়—অথচ তার দলভুক্ত পাপিষ্ঠদের কেউ জানে না, তাদের প্রধান দলপতি কে!

শঙ্করের সহকারী রূপে কাজ করে জনকয় বাছা-বাছা বিশ্বস্ত লোক, সর্দারকে চেনে কেবল তারাই। কিন্তু তাদেরও শঙ্করের বাড়িতে আসবার হুকুম নেই। তাদের কাছে দলপতির আদেশ বহন করে নিয়ে যায় পিয়ারীলাল—সে হচ্ছে শঙ্করের ডানহাতের মতো। এই ভাবে কলকাতার

---

* 'বজ্র আর ভূমিকম্প' দ্রষ্টব্য।

মান্যগণ্য লোকদের মাঝখানেই বসে শঙ্করলাল যবনিকার অন্তরাল থেকে সুতো টেনে তার হাতের সাংঘাতিক পুতুলগুলোকে খুশিমতো নাচিয়ে নিজের কাজ সারে।

দেশের লোকদের চিত্ত জয় করবার জন্যে শঙ্করলাল পরম ধার্মিক ও দাতার ভূমিকাতেও অভিনয় করে। বহু মঠ, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই সে অর্থ সাহায্য করতে ভোলে না। নিজের বাড়ির সামনেও নিয়মিত ভাবে শত শত কাঙালি ভোজন করায় এবং খবরের কাগজের প্রসাদে এসব কথা চারিদিকে প্রচারিত হয়ে যায়। দেশে দাতা বলে তার খ্যাতি রটে গিয়েছে। এমন কি অনেকের বিশ্বাস, সরকার থেকে শীঘ্রই তার উপাধি লাভের সম্ভাবনা।

মাঝে মাঝে শঙ্করলালের দলের লোকেরা ধরাও পড়ে, শাস্তিও পায়। মাঝে মাঝে তার প্রতি পুলিসের সন্দেহও জাগে। কিন্তু তবু সে এমন নিরাপদ ব্যবধানে থাকে যে, পঙ্গু আইনের দৃষ্টি তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

সেদিন দুপুরে আহারাদির পর শঙ্করলাল বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে তাম্রকূট সেবন করছে, এমন সময়ে দ্রুতপদে পিয়ারীলাল এসে হাজির হল।

মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা খুলে শঙ্করলাল বললে, 'কি হে পিয়ারী, তোমার মুখের ভাব অমনধারা কেন?'

পিয়ারীলাল ঢালা বিছানার একধারে বসে পড়ে বললে, 'এইমাত্র খবর পেলুম, দীনু-ডাকাত পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।'

শঙ্করের মুখের ভাব বদলাল না বটে, কিন্তু তার চোখদুটো চমকে উঠল চকিতের জন্যে। নীরবে তামাকের নলে গোটাকয় টান মারলে। তারপর সহজ স্বরেই বললে, 'সত্যি খবর?'

পিয়ারীলাল বললে, 'সত্যি বইকি বাবুজি! শহরময় হই চই পড়ে গিয়েছে!'

—'কেমন করে পালাল?'

পিয়ারীলাল সমস্ত বর্ণনা করলে।

শঙ্করলাল বললে, 'আজব খবর বটে। এমন কড়া পাহারার ভিতর থেকে এত সহজে কেউ পালাতে পারে? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।'

—'কিন্তু বাবুজি, বিশ্বাস না করেও উপায় নেই।'

—'উপায় নেই? বেশ, তাহলে বিশ্বাস করলুম। কিন্তু তুমি এতটা উত্তেজিত হয়েছ কেন?'

—'বলেন কি বাবুজি, উত্তেজিত হব না? জানেন, দীনু আপনার বন্ধু নয়?'

শঙ্করলাল একটু হেসে বললে, 'আমার শত্রুর অভাব নেই। না হয় আর একজন বাড়ল। এতে ভয় পাবার কি আছে?'

—'দীনু যদি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে?'

—'মারা পড়বে। আর, সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা না করলেও আমি তাকে ছাড়ব না। সে আমার দাদার হত্যাকারী। গেল-বারে তার রক্ত দেখেছি। এবারে তার মরা মুখ দেখব। আর তাকে পুলিসের হাতে সঁপে দেব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

শঙ্করলাল ঘনঘন তামাকের নল টানতে লাগল, পিয়ারীলাল চুপ করে বসে

রইল। খানিকক্ষণ পরে সে বললে, 'বাবুজি, আমি বলি দীনুকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।'

—'কেন বল দেখি?'

—'দীনুর দলও হালকা নয়। হয়তো সে আমাদের অনেক খবর রাখে। ভেবে দেখুন, বাইরের বহু লোকের সাহায্য না পেলে কেউ এমন ভাবে পালাতে পারে না। হাজতের ভিতরে বসে যে এমন আশ্চর্য ব্যবস্থা করতে পারে, সে কি সহজ মানুষ?'

—'না পিয়ারী, আমি দীনুকে ভয় করি না। আমার কি বিশ্বাস জানো? হয় বাংলাদেশের পুলিস ঘুমন্ত, নয় দীনুর কাছে ঘুষ খেয়ে পুলিস তাকে পালাতে দিয়েছে।'

পিয়ারীলাল তবু মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'কি জানি বাবুজি, ব্যাপারটা আমার কেমন ভালো লাগছে না। যেচে কালসাপকে খোঁচানো উচিত নয়। একদিকে পুলিস, আর একদিকে দীনুর শত্রুতাকে নিয়ে আমরা দুদিক সামলাতে পারব কি?'

তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসে শঙ্করলাল বললে, 'পারতে হবে পিয়ারী, পারতে হবে। বুদ্ধিবলই হচ্ছে সেরা বল। যা বলি শোনো। শহরের চারিদিকে চর পাঠাও। দীনুর আড্ডার খোঁজ নাও। ভালো করে ফাঁদ পাতো। আমি নিজে হাতেনাতে কাজ করি না বটে, কিন্তু দাদার হত্যাকারীকে বধ করব আমি স্বহস্তেই।'

পঞ্চম

ঢালের দুই পিঠ

কদিন ধরে প্রশান্ত হচ্ছে ভেবে ভেবে সারা। দীনুডাকাত পলায়ন করে তাকে নিক্ষেপ করে গিয়েছে ভাবনাসমুদ্রে।

দীনুর পলায়ন-প্রহসনের জন্যে তাকে কেউ দায়ি বলে মনে করেনি। সব ঝুঁকি পড়েছে গিয়ে জেলগাড়ির রক্ষী সার্জেন্টের উপরে। সে যদি বন্দীর উপরে তার দৃষ্টি সমান সজাগ রাখত, তাহলে দীনু পালাবার কোনও সুযোগই পেত না।

কাজেই এজন্যে প্রশান্তের মন ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। কিন্তু মনে মনে এই সত্যটা বারংবার অনুভব করতে পারছিল যে, ঘটনাক্ষেত্রে সে নিজেও উপস্থিত থেকে দীনুকে কোনোরকম বাধাই দিতে পারেনি, বরং নকল দীনুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থেকে আসল দীনুর পলায়নপথ করে দিয়েছিল আরও সুগম।

প্রশান্ত বারংবার মানসচক্ষে দর্শন করে, দীনুডাকাত নিজের আড্ডায় বসে তার গাধামির কথা স্মরণ করে অট্টহাস্যে যেন ঘরের ছাদ ফাটিয়ে দিচ্ছে! সেই বিশ্রী অট্টহাস্য শুনে তার আত্মসম্মান যেন কুঁচকে পড়তে চায়! মনে মনে সে পণ করে, এ বাহাদুরির সুখ বেশিদিন আমি দীনুকে ভোগ করতে দেব না—করব, করব, আবার তাকে গ্রেপ্তার করব!

কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, দীনুকে গ্রেপ্তার করা ততটা সহজ নয়। পালিয়ে গিয়ে সে যে কোথায় ডুব মেরেছে তা আবিষ্কার করা যেন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

এক উপায় ছিল অরুণের এবং তার বাড়ির উপরে সজাগ দৃষ্টি রাখা, কারণ অরুণ আর দীনু পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারে না। কিন্তু আজকের ট্রেনে অরুণও করেছে পশ্চিমের দিকে যাত্রা। সুতরাং এদিক থেকেও আর কোনোরকম সূত্র পাওয়া সম্ভবপর হবে না।

তাহলে উপায়?

টেবিলের উপরে একজোড়া পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে প্রশান্ত ভাবতে আর ভাবতে আর ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ টেবিলের উপর থেকে মেঝের উপরে পা দুটোকে সশব্দে নামিয়ে ফেলে, চেয়ার ছেড়ে উঠে একটি ছোটোখাটো লম্ফত্যাগ করলে এবং তার উল্লসিত মন যেন সচিৎকারে বলে উঠল—'হয়েছে, হয়েছে, একটা উপায় হয়েছে!'

দীনুর লেখা নীলপত্রের একটা জায়গা তার মনে পড়ে গেল ঃ 'যতদিন না প্রতিশোধ নিতে পারি, শঙ্করলালকে আমি ভুলব না!'

এ যে একটা মস্ত সূত্র! কেন সে এটা নিয়ে একবারও মাথা ঘামায়নি?

দীনু যখন জিদ ধরেছে, শঙ্করলালকে নিশ্চয়ই ছাড়বে না!

শঙ্করলাল একাধিক বার তাকে প্রাণে মারবার চেষ্টা করেছিল, তারপর তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল বলতে গেলে একরকম সেইই!

দীনু যে রকম একরোখা লোক, শঙ্করলালকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবে! সে আর যাইই হোক, নিজের বাক্যরক্ষা করে। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে প্রশান্ত হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে এই পরম সত্যটা। কতদিন সে পুলিসকে আগে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছে, কোন তারিখে কোথায় গিয়ে সে চুরি বা ডাকাতি করবে! তারপর বিপদ ও ধরা পড়বার ভয়েও নিজের বাক্যরক্ষা করতে পশ্চাৎপদ হয় নি—পুলিসের চোখের উপরেই যথাসময়ে কেল্লা ফতে করে তবে সে আবার অদৃশ্য হয়েছে!

অতএব দীনু অবশ্যই আসবে শঙ্করলালের বাড়িতে!

এবং তাকেও যক্ষের মতন আগলে বসে থাকতে হবে শঙ্করলালের বাড়িখানা।

কিন্তু এই শঙ্করলাল সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। সবাই বলে সে খুব দানী ও ধার্মিক—দেশের ও দশের মাঝখানে এই অল্পদিনেই তার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে। কিন্তু তাকে নিয়ে নানারকম কাণাঘুসাও শোনা যায়—যদিও প্রমাণ অভাবে তাকে ধরবার ছোঁবার উপায় নেই।

দীনু বলে বটে শঙ্করলাল বারবার তাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও দীনুর মুখের কথা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী নেই।

কিন্তু শঙ্করলালের দাদা হচ্ছে নামজাদা গুণ্ডা মহাদেও। আর পুলিস গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখেছে, নানা ব্যাঙ্কের হিসাবে তার জমা টাকার পরিমাণ মাসে মাসে বেড়ে উঠছে আশ্চর্য ভাবেই। তার এত টাকার আমদানি হচ্ছে কোথা থেকে?

যাক, শঙ্করলালকে নিয়ে পরেও মাথা ঘামালে চলবে, আপাতত দরকার কেবল দীনু-ডাকাতকে।

সেইদিন থেকেই শঙ্করলালের বাড়ির উপরে বসল পুলিসের পাহারা। দিনের চেয়ে রাতেই দীনুর আগমন-সম্ভাবনা বেশি বলে সন্ধ্যার পর থেকে প্রত্যহ প্রশান্ত নিজেই ছদ্মবেশ পরে রাত জেগে যথাস্থানে রাখে খর দৃষ্টি।

এমনি করে দিনের পর দিন যায়, প্রশান্ত একমনে করে দীনুর ধ্যান ধারণা, কিন্তু তবু দেখা দেয় না নিষ্ঠুর দীনু!

প্রশান্ত কিন্তু নাছোড়বান্দা! সে মনে মনে রবিবাবুর একটি গানের লাইন স্মরণ করে—

'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে!'

সে বিলাতের পৃথিবীবিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডস-এর সত্যিকার গোয়েন্দাদের কাহিনী পাঠ করেছে। তারা উপন্যাসের কাল্পনিক গোয়েন্দাদের মতো তুড়ি মেরে কেল্লা ফতে করতে পারে না বটে, কিন্তু ছোটো বা বড়ো একটিমাত্র সূত্র আঁকড়ে মাসের পর মাস ধরে বসে থেকে শেষটা প্রায়ই কাজ হাসিল করে।

অতএব প্রশান্ত বুড়ি ছেড়ে নড়ল না, কপাল ঠুকে বসে রইল সবুরে মেওয়া ফলে কিনা দেখবার জন্যে!

... ...

ঢালের অন্য পিঠেও উঁকি মারবার চেষ্টা করি।

বরুণ এখন কি করছে সেটাও এইবারে দেখা দরকার। আমরা—অর্থাৎ ঔপন্যাসিকরা হচ্ছি অদ্ভুত লোক। দশটা বেজে এক মিনিটের সময়ে আমরা স্বর্গে উঠে ভগবানের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, আবার দশটা বেজে দু মিনিটের সময়ে নরকে নেমে আলাপ করে আসতে পারি স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে! আমাদের মনোরথের আশ্চর্য গতির কাছে যে কোনও বেগবান এরোপ্লেনকেও মনে হবে উড়ন্ত শামুকের মতো। আমাদের গতিই কেবল অবাধ নয়, আনাগোনা করবার অধিকার আমাদের আছে স্বর্গ-মর্ত-রসাতলের সর্বত্রই।

সুতরাং চোখের পলকেই আমরা যদি প্রশান্তের কাছ থেকে বরুণের কাছে গিয়ে হাজির হই, তাহলে তোমরা অবাক হোয়ো না। বাঘের গর্তে আর গোরুর গোয়ালে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।

পূর্ব আকাশে তখন সবে ফুটে উঠেছে উষাকুমারীর হাসির আভা।

এরই মধ্যে বরুণ মুগুর ভেঁজে ও ডন-বৈঠক দিয়ে নিয়ে বসে বসে হাঁপ ছাড়ছে।

এমন সময়ে ছোট্টুলালের দেখা পাওয়া গেল।

বরুণ শুধোলে, 'কি রে ছোট্টু, খবর কি?'

ছোট্টু বললে, 'নতুন খবর কিছুই নেই।'

—'প্রশান্ত এখনও হাল ছাড়েনি?'

—'না। কালও সারা রাত সে শঙ্করের বাড়ির পাশে কানা গলির ভেতরে একটা রোয়াকে অন্ধকারে গা ঢেকে বসেছিল। তার অন্য অন্য চরেরাও নানারকম পোষাক পরে আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করেছে।'

—'তাহলে আমার পক্ষে ও-অঞ্চলে যাওয়া এখন বিপদজনক?'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

—'তাহলে কেমন করে শঙ্করলালকে শাস্তি দিই বলো দেখি?'

—'আমি কেমন করে বলব হুজুর?'

—'তাহলে তুই বলতে পারবি না? কেন রে ছোট্টু, তোর মাথা তো খুব সাফ?'

ছোট্টু লজ্জিত ভাবে বললে, 'কী যে বলেন হুজুর, আপনার মাথা আর আমার মাথা? কথায় বলে—'কিসে আর কিসে? না, সোনায় আর সিসে'!'

বরুণ তার পিঠ চাপড়ে বললে, 'বা রে ছোট্টু, বাঃ! তুই যে বাংলা প্রবাদ কপচাতেও শিখেছিস দেখছি!'

—'হ্যাঁ হুজুর, বাংলাদেশেই আমি জন্মেছি, এখন তো আমি বাঙালি!'

—'বেশ, বেশ। কিন্তু শঙ্করলালকে নিয়ে যে সমস্যায় পড়া গেল! রামধনীর খবর কি?'

—'সে শঙ্করলালের বাড়িতে নিরাপদেই কাজ করছে। কেউ তাকে সন্দেহ করে নি।'

—'শঙ্করলাল কি এখনও আমাকে খুঁজছে? রামধনী কি বলে?'

—'রামধনীর মুখে শুনলুম, শঙ্করলাল তার চরদের ডেকে বলেছে—যে আপনার খবর দিতে পারবে তাকেই হাজার টাকা বকশিশ দেবে!'

বরুণ হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'জানিস ছোট্টু, আমাকে ধরবার জন্যে পুলিস থেকেও পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে? আমি এখন বড়োই মূল্যবান জীব রে! আমাকে পাবার জন্যে সবাই লালায়িত হয়ে উঠেছে!'

ছোট্টু বললে, 'কিন্তু আপনার খবর যারা রাখে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

—'সেই সুখেই তো বেঁচে আছি ভাই! বিশ্বস্ত বন্ধুর ভালোবাসা পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? আচ্ছা, রামধনীর মুখে আর কিছু শুনলি?'

—'শঙ্করলালের লোহার সিন্দুকে কি আছে সে জানতে পেরেছে।'

—'এটা সুখবর।'

—'সিন্দুকে আছে একশোখানা হাজার টাকার নোট, জড়োয়া গয়নায় আর সোনা-দানাতেও আছে আরও লাখ টাকার জিনিস।'

—'এত টাকা বাড়িতে রাখার কারণ?'

—'শঙ্করলাল নাকি সর্বদাই বিপদের জন্যে প্রস্তুত! হঠাৎ পালাবার দরকার হলে সে এই সম্পত্তি নিয়ে অদৃশ্য হতে চায়।'

বরুণ মুখ নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর হাসতে হাসতে বললে, 'ঠিক ছোট্টু, ঠিক! হয়েছে!'

—'কি হুজুর?'

—'শঙ্করলালকে আমি প্রথমেই কি শাস্তি দেব জানিস? ওই দুই লক্ষ টাকার নোট আর গয়না তার কাছ থেকে আমি জরিমানা স্বরূপ আদায় করব।'

—'কেমন করে হুজুর? তার বাড়ির চারিধারে যে পুলিসের পাহারা!'

বরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তাতে কিছু আসে যায় না। রামধনীকে জানিয়ে রাখিস, আসছে অমাবস্যার রাতে সে যেন শঙ্করলালের বাড়ির খিড়কির দরজা ভিতর থেকে খুলে রাখে। আর তার কাছে আমি যে ওষুধের শিশি দিয়েছি, বাড়ির চাকর-দারোয়ানদের জলের কলসিতে কি খাবারের জিনিসে যেন সেটা ব্যবহার করে।'

ষষ্ঠ

অমাবস্যার রাত

কালো ঘুটঘুটে মুখোশপরা অমাবস্যার রাত এসেছে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারমাখা কলকাতার শিয়রে।

তার উপরে আজকের অবস্থা আরও ভয়াবহ। শূন্য দিয়ে ছুটে চলেছে কয়লারঙা মেঘের পর মেঘ—কড়-কড়-কড় ডাকছে বজ্র, ঝক-মক-ঝক জ্বলছে বিদ্যুৎ, ঝর-ঝর-ঝর ঝরছে বৃষ্টিধারা!

বিশ্বের যত কালিমা, যত কোলাহল আর যত অশ্রুজল যেন আজ একসঙ্গে জড়াজড়ি করতে চাইছে। পৃথিবী যেন আজ বিভীষিকার রঙ্গমঞ্চ।

শঙ্করলালের অট্টালিকাখানা যেন আজ রাস্তার উপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং সেই স্থানটা অধিকার করে আছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না—

তবু সেই দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে গলির এক ভিজে রোয়াকের উপরে বসে ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে প্রশান্ত চৌধুরী এবং তার আপাদমস্তক জুড়ে বয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির জল।

বাজ, বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ ছাড়া শহরের কোথাও আর কারুর সাড়া নেই। আজকে এ যেন মৃতজীবের পৃথিবী।

থেকে থেকে প্রশান্তের সন্দেহ হতে লাগল যে, তার অনুচররাও বোধহয় এখান থেকে সরে পড়ে কোনও নিরাপদ জায়গায় মাথা গোঁজবার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিখ্যাত গোয়েন্দাদের আদর্শ সামনে রেখেও প্রশান্ত আর ধৈর্যধারণ করতে পারছে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস হল যে, এমন ভীষণ রাতে মানুষ দীনু কেন, একটা পথের কুকুরও পথে বেরুবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করবে না! সে নিতান্ত নির্বোধ তাই অন্ধকারে অন্ধ হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে আর ঝড়ে কেঁপে কঠিন কোনও ব্যাধিকে আমন্ত্রণ করতে চাইছে!

শঙ্করলালের অতবড়ো বাড়ির একটা ঘরেও আলো জ্বলছে না। জ্বলবে কেন? কর্তা, গিন্নি, ছেলেমেয়ে, চাকর-দরোয়ান সবাই এখন আপন আপন বিছানায় সুখনিদ্রায় অচেতন। এমন ঝড়-জলে ঘুম যে আরও ঘন হয়ে ওঠে! দীনু এখন কি করছে? নিশ্চয়ই নরম বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আরামে কুঁকড়ে খাসা একটি ঘুম দিচ্ছে! দুর্ভাগ্য কেবল তারই।

নিজের শয়নগৃহের গরম বিছানার কথা ভেবে প্রশান্তের মন যখন অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠছে, তখন আচম্বিতে খুব কাছ থেকেই ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ডুবিয়ে জেগে উঠল বিষম এক যন্ত্রণার আর্তনাদ!

স্প্রিং-টেপা পুতুলের মতন প্রশান্ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতরকার একখানা বাড়িতে দপ করে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক আলো।

পরমুহূর্তে শোনা গেল দুম করে একটা ভারি দরজা খোলার শব্দ এবং তার পরেই কে চিৎকার করলে, 'খুন! খুন! খুন!'

প্রশান্ত রোয়াক থেকে লম্ফত্যাগ করে নিচে নেমে সেইদিকে ছুটে গেল।

টর্চ টিপে দেখলে বাড়ির সদর দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে একটি বুড়ো ভদ্রলোক থর-থর কাঁপছেন—বিষম আতঙ্কে তাঁর দুই চক্ষু বিস্ফারিত!

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, 'হয়েছে কি? কোথায় খুন হয়েছে?'

বৃদ্ধ জবাব দিতে পারলেন না, কেবল বাড়ির দোতালার দিকে করলেন অঙ্গুলিনির্দেশ।

কোমরের খাপ থেকে একটানে রিভলবারটা বার করে নিয়ে প্রশান্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বৃদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে সভয়ে বললেন, 'আমি যেতে পারব না—সে দৃশ্য আমি আর দেখতে পারব না—উঃ, কী ভয়ানক!'

প্রশান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কি আশ্চর্য, তাহলে আমাকে পথ দেখাবে কে?'

বৃদ্ধ অবশ হয়ে মাটির উপরে বসে পড়ে বললেন, 'পথ দেখাতে হবে না, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ডানদিকের প্রথম ঘর। হে ভগবান, আমার কি সর্বনাশ হল!'

প্রশান্ত আর দাঁড়াল না, দ্রুতপদে এগিয়েই সামনে পেলে সিঁড়ির সার। সেখানে এবং বাড়ির উপরে আলো জ্বলছিল। সে টপাটপ সিঁড়িগুলো পার হয়ে দোতলায় গিয়ে হাজির হল। ডানদিকেই বারান্দা ও একখানা আলোকিত ঘর। কিন্তু তার ভিতরটা স্তব্ধ।

প্রশান্ত সন্তর্পণে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। কিন্তু তারপরেই যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে প্রাণ-মন শিউরে ওঠে!

ঘরের এদিকে-ওদিকে উল্টে পড়ে আছে একটা টেবিল ও খানকয় চেয়ার এবং চারিদিকে বিষম ঝটাপটির স্পষ্ট চিহ্ন! মেঝের উপরে এখানে-ওখানে রক্তের ধারা এবং দুই পাশের দুই দেওয়ালের কাছে লম্বা হয়ে পড়ে আছে দুজন পুরুষের রক্তাক্ত দেহ! তাদের আড়ষ্ট মুখ, স্থির দৃষ্টি ও নিস্পন্দ দেহ দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয়না যে, তারা আর বেঁচে নেই!

কিন্তু হত্যাকারী কোথায়? নিশ্চয় বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে! পালাবার আগেই তাকে ধরতে হবে।

দোতলায় মোট চারখানা ঘর। রিভলবার বাগিয়ে ধরে প্রশান্ত একে একে চারখানা ঘর খুঁজেও কারুকে দেখতে পেলে না। সিঁড়ি দিয়ে আরও উপরে উঠে গেলে দোতলার শূন্য ছাদ। বাকি রইল একতলা।

আবার নিচে নেমে সে একতলাতেও হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে পারলে না। কিন্তু বাড়ির উঠান পার হয়ে ওপাশে আর একটা দরজা পাওয়া গেল। সে দরজা খোলা। হত্যাকারী যে ওই দরজা খুলেই সরে পড়েছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই!

প্রশান্ত আবার ছুটে প্রথম দরজার কাছে এল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে সেই বৃদ্ধকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

তখন তাকে নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে প্রশান্ত তার সঙ্কেতবাঁশিতে ফুঁ দিলে। তখনই চারিদিক থেকে তার অনুচররা ছুটে এল দ্রুতবেগে।

প্রশান্ত বললে, 'এ বাড়িতে ডবল খুন হয়েছে। জন-চার লোক আমার সঙ্গে এসো, বাকি সবাই এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো।'

প্রশান্ত আবার দোতলায় উঠল। সেই ভয়াবহ ঘরের কাছে গিয়ে বললে, 'এই ঘরে খুন হয়েছে। ডবল খুন, একজোড়া লাশ।'

সকলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপর এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে প্রশান্তের মুখ-চোখ হয়ে উঠল উদ্‌ভ্রান্তের মতন! দু-দুটো মৃতদেহের একটাও সেখানে নেই!

সপ্তম

ডবল খুনের পর

প্রশান্তের সহকারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'একজোড়া লাশ কোথায় স্যার?'

প্রশান্ত হতভম্বের মতন বললে, 'এইখানে দেখে গিয়েছি। কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না!'

সহকারী বললে, 'কি আশ্চর্য, তাও কি সম্ভব? ঘর ভুল করেননি তো?'

—'নিশ্চয়ই নয়! চেয়ে দেখ, ঘরময় রক্তের ছড়াছড়ি! ওইখানে একটা লাশ পড়েছিল, আর একটা লাশ ছিল ওইখানে! চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়ে আছে সেই ভাবেই! ঠিক ঘরেই এসেছি!'

সহকারী মাথা চুলকোতে বললে, 'এমন অদ্ভুত কাণ্ড তো কখনও দেখিনি!'

প্রশান্ত বললে, 'বুঝেছি। আমি যখন তোমাদের ডাকবার জন্যে নেমে রাস্তায় গিয়েছিলুম, লাশ লোপাট হয়েছে সেই সময়েই। এ খুন একজনে করেনি, তারা দলে ভারি।'

সহকারী দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বললে, 'বলেন কি স্যার! এমন সাহসী খুনির কথা তো কখনও শুনিনি! পুলিসের চোখের উপর থেকে লাশ লোপাট! ওরে বাবা!'

প্রশান্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, 'শীগগির নিচে চল! সবাইকে ডাকো! খুনিরা দুটো লাশ নিয়ে এখনও বেশিদূর পালাতে পারেনি। ও-দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এখনই ব্যাটাদের পিছনে ছোটো! আর দেরি নয়—এসো!'

এক-এক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি পার হয়ে এবং বাঁশি বাজাতে বাজাতে প্রশান্ত নিচে নেমে গেল—তার পিছনে পিছনে নামল অন্যান্য পুলিসের লোক। বাড়ির সামনে বাকি যারা দাঁড়িয়েছিল, বাঁশির আওয়াজ শুনে তারা সবাই ভিতরে এসে দাঁড়াল।

প্রশান্ত খুব কম কথায় সমস্ত ঘটনা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, 'ওদিকের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো! পথে যে কোনও গাড়ি বা যে কোনও লোককে দেখবে, সবাইকে পাকড়াও কোরো! দেখি, শয়তানদের ধরতে পারি কিনা!'

বাড়ির ওধারেও প্রথমে একটা সরু গলি, তারপর বড়ো রাস্তা। গলি পার হয়ে সকলে বেগে বড়ো রাস্তার উপরে গিয়ে পড়ল।

তখনও অমাবস্যার রাত, কাজল মেঘ ও নিষ্প্রদীপ কলকাতা চতুর্দিকে সেই দৃষ্টি-অন্ধ-করা বিপুল কালিমাকে বিস্তৃত করে রেখেছে—যেদিকে তাকানো যায় কেবল অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! রমঝম বাদলধারা তখনও ঝরছে, ভৈরব বজ্র তখনও হুঙ্কার দিচ্ছে, উন্মত্ত ঝটিকা তখনও হাহাকার করে ছুটে বেড়াচ্ছে। পথে জন-মানব নেই, কোনও গাড়ির শব্দ নেই, একটা কুকুর-বিড়ালেরও পদশব্দ নেই।

এই প্রচণ্ড অন্ধকারের রাজ্যে কারুকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা বৃথা। তবু প্রশান্ত ও তার দলবল দিকে দিকে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে আর ছুটে বেড়ালে, কিন্তু তাদের সমস্ত পরিশ্রমই হল ব্যর্থ! এ পৃথিবী আজ যেন কোন অভাবিত বিভীষিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, যার বুক জুড়ে বইছে কেবল তিমিরসাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ!

সহকারী বললে, 'স্যার, বুনোহাঁসরা পালিয়ে গিয়েছে, আর তাদের পিছনে ছুটে লাভ নেই। এখন কি করব বলুন?'

প্রশান্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এসেছিলুম দীনুর খোঁজে, কিন্তু সে তো হয়েছে ডুমুরের ফুল! তার ওপরে ঘাড়ে চাপল আবার একটা ডবল-খুনের মামলা। আমারই বরাত! চলো, আর একবার শঙ্করলালের বাড়ির ওদিকেই যাই!'

ইতিমধ্যে প্রায় দশ মিনিট কেটে গিয়েছে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হয়েই তারা সবিস্ময়ে দেখলে, শঙ্করলালের বাড়ির সুমুখটা আলোয় আলোয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল আচম্বিতে! তারপরেই শোনা গেল যেন কাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর!

ধাঁ করে প্রশান্তের মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল একটা বিশেষ সন্দেহের বিদ্যুৎ! সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, 'আমার সঙ্গে ছুটে এসো—শীগগির!'

অনেকগুলো ভারি ভারি দ্রুত পদশব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে পুলিশবাহিনী উপস্থিত হল শঙ্করলালের অট্টালিকার সামনে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই তারা দেখতে পেলে, এতক্ষণ যে-বাড়ি মগ্ন হয়েছিল অন্ধকারের অতলে, এখন তার উপরকার ঘরে ঘরে ছুটোছুটি করছে লোকের পর লোক এবং তারা চিৎকারও করছে নানান রকম কণ্ঠস্বরে! নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে আজ ঘটেছে কোনও অসাধারণ ঘটনা!

প্রশান্ত দৌড়ে গিয়ে শঙ্করলালের বাড়ির ফটকের উপর ধাক্কা মারতে মারতে চিৎকার করে বললে, 'ফটক খোলো, ফটক খোলো! এখানে এত গোলমাল কিসের?'

বাড়ির উপর থেকে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে কে বললে 'কে তোমরা! কী চাও?'

প্রশান্ত অধীর কণ্ঠে বললে, 'কী হয়েছে এখানে? আমরা পুলিসের লোক।'

উপর থেকে কণ্ঠস্বর এলো, 'অপেক্ষা করুন। এখুনি ফটক খুলে দিচ্ছি।'

মিনিট-খানেকের মধ্যেই নিচে নেমে ফটক খুলে দিলে স্বয়ং শঙ্করলাল।

প্রশান্ত টর্চের আলোকশিখা তার মুখের উপরে নিক্ষেপ করে বললে, 'আপনিই বোধহয় শঙ্করবাবু?'

জবাব হল, 'হ্যাঁ।'

—'কি হয়েছে বলতে পারেন?'

—'আমার লোহার সিন্দুক থেকে দু লক্ষ টাকা চুরি গিয়েছে!'

—'দু লক্ষ টাকা চুরি গিয়েছে! কেমন করে?'

—'তা বলতে পারি না। চোরেরা কিন্তু আমার লোহার সিন্দুক খুলেছে, চুরি করেছে, আর পালিয়েও গিয়েছে।'

প্রশান্তের বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সে প্রায় ক্লান্ত স্বরেই বললে, 'চোরেরা কেমন করে আপনার বাড়ির ভিতরে ঢুকল? শুনেছি আপনার অনেক দরোয়ান আর চাকর আছে, তারা কি চোরেদের সাড়া পায়নি? তারা কি করছিল?'

শঙ্করলাল একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বললে, 'তারা ঘুমোচ্ছিল। তারা এখনও ঘুমোচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি করেও তাদের জাগাতে পারছি না। মনে হচ্ছে তাদের কেউ কিছু খাইয়েছে।'

—'আপনি কেমন করে চুরির খবর পেলেন? আপনিও নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ কোনও শব্দ শুনেই হোক বা আর যে-কারণেই হোক আমার ঘুম গেল ভেঙে। মনে কেমন সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখি, চার-পাঁচজন লোক ছুটে তেতলা থেকে নিচের দিকে নেমে গেল। আমিও তাদের পিছনে পিছনে নেমে এলুম—কিন্তু আর তাদের দেখতে পেলুম না। নিচে এসে দেখি, বাড়ির খিড়কির দরজাটা খোলা রয়েছে।'

প্রশান্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা ফুটল না।

শঙ্করলাল বললে, 'আপনি আমাকে চেনেন না বোধহয়, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনিই তো প্রশান্তবাবু?'

প্রশান্ত ক্ষীণ স্বরে বললে, 'হুঁ।'

—'আপনার নামে একখানা চিঠি আমার লোহার সিন্দুকের ওপরে পড়েছিল।'

প্রশান্ত অত্যন্ত অবসন্ন ভাবে বললে, 'বুঝতে পারছি, সে চিঠি কার লেখা!'

—'একখানা নীলরঙের খাম, ওপরে লাল কালিতে আপনার নাম লেখা। এই নিন।'

প্রশান্ত অত্যন্ত নাচারের মতন পত্রখানা শঙ্করলালের হাত থেকে গ্রহণ করলে। তারপর কৌতূহলী দৃষ্টির কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে একটু সরে গিয়ে টর্চের আলোকে পাঠ করলে ঃ

'ভাই প্রশান্ত,

তুমি 'ঢেঁকিশাল দিয়ে কটকে' যাবার চেষ্টায় ছিলে, না? কিন্তু পারলে কি?

তোমার যুক্তি ছিল এই ঃ যেহেতু শঙ্করলালের বাড়িতে হবে আমার আবির্ভাব, সেই হেতু ওখানে পাহারা দিলেই তুমি করবে আমাকে লাভ।

কিন্তু এটা হচ্ছে উল্টো যুক্তি। তুমি কি ভেবেছ, তোমার গতিবিধির উপরেও নজর রাখিনি? যেচে ব্যাধের ফাঁদে পা দিয়ে আমার এই বহুকষ্টার্জিত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হব, এমন কাঁচা ছেলে আমি নই। স্বাধীনতাকে আমি বরাবরই ভালোবাসতুম। কিন্তু অধীনতার যাতনা যে কতখানি মর্মান্তিক, তোমার বাঁধন-দড়ি পায়ে পরবার আগে আমি ভালো করে অনুভব করতে পারিনি। সাতমাসকাল আমি ছিলুম ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ফিরিঙ্গী রাজার অতিথি। সেই সাতমাসব্যাপী দুঃস্বপ্নকে ভুলব না, আমি জীবনে ভুলব না। এবার ধরা পড়বার আগে করব আত্মহত্যা।

তোমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আমি জানি। তাই বুঝেসুঝে আজ আমি পেতেছিলুম ব্যাধভোলানো ফাঁদ।

এতক্ষণে ব্যাপারটা তুমি যে কতক-কতক আন্দাজ করতে পেরেছ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বোধহয় এখনও তোমার কাছে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায় নি? আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

'খুন! খুন!' চিৎকার শুনে বন্য মহিষের মতো গলির যে বাড়িখানার দিকে তুমি ধাবিত হয়েছিলে, কিছুকাল আগে ওখানা ভাড়া নিয়েছি আমিই। কেন জানো? শঙ্করলালের আর তোমাদের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবার জন্যে। কতদিন যে আমি তোমারই মতন সজাগ পাহারাওয়ালার সুমুখ দিয়েই ও বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছি তার আর সংখ্যা নেই। তোমার ধ্যানের ঠাকুর তোমারই সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে, আর তুমি হতভাগ্য বসে বসে দেখেছ কেবল অন্ধকারের স্বপ্ন! অবশ্য এ কথা না বললেও চলবে যে, আমি ধারণ করতুম ছদ্মবেশ।

তারপর শোনো। ও বাড়ির দোতলায় উঠে তুমি দুটো লাশ দেখেছিলে তো? কিন্তু তারা মড়া নয়, জ্যান্ত মানুষ। তারা মৃত্যুর ভান করেছিল মাত্র। যা দেখে তুমি মনে করেছ রক্ত, তা হচ্ছে রাঙা রং! অর্থাৎ ওখানে কোনও খুনই হয়নি!

যেই তুমি সাহায্যের জন্যে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলে, অমনি মড়ারা উঠে খিড়কির দরজা দিয়ে চম্পট দিলে। তারপর তোমরা যখন লাশ ও খুনির খোঁজে দিগবিদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছ, সেই ফাঁকে আমি ঢুকেছি শঙ্করলালের বাড়ির ভিতরে। কোন কৌশলে তা বলব না, কারণ সেটা হচ্ছে আমার গুপ্তকথা।

আমার পরিকল্পনা ভালো লাগছে? তাহলে আর একটা কথাও শুনে রাখো। আমার এই পরিকল্পনার সফলতা সম্বন্ধে আমি এতটা নিশ্চিত যে, কোনও ঘটনা ঘটবার আগেই—অর্থাৎ ঘটনাক্ষেত্রে যাত্রা করবার আগেই তোমার জন্যে এই পত্ররচনা করতে বসে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি!

এইবারে আজকের ঘটনাগুলোর পিছনে কি অর্থ আছে বোঝবার চেষ্টা করো। এখন বলো দেখি, আজ তোমার প্রত্যেকটি কার্যের কর্মকর্তা ছিল কে? তুমি? না আমি? আজ তুমি নিজের ইচ্ছায় একটিও কাজ করনি! আমি যা যা হুকুম করেছি, পরম অনুগতের মতো তুমি তার প্রত্যেকটিই পালন করেছ, একবারও অবাধ্য হওনি। এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ! তোমার মতন ভৃত্য পাওয়া সৌভাগ্য!

আমার একটা উপদেশ শুনবে? শঙ্করলালের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভুলো না। সে হচ্ছে ভয়াবহ ব্যক্তি। তার বাইরের সাধুতা মুখোশ মাত্র। ভিতরে ভিতরে সে হচ্ছে একেবারে সর্বনিম্নস্তরের মহাপাপী। এ বিষয়ে আমিও তোমাকে সাহায্য করব। যে দিনই তার বিরুদ্ধে আইনে মানে এমন প্রমাণ ও সাক্ষী সংগ্রহ করতে পারব, সেই দিনই স্মরণ করব আবার তোমার মতন পুরাতন বন্ধুবরকে। আজ এই পর্যন্ত।

'দীনবন্ধু'

অষ্টম

বুদ্ধুর সুসংবাদ

—'আমি মুণ্ডু চাই, দীনুর মুণ্ডু! আমি তাকে দেখে নেব, আমি তাকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলব!' চেঁচিয়ে বললে শঙ্করলাল।

তার বাড়িতে চুরি হবার পর পনেরো দিন চলে গিয়েছে, কিন্তু সে এখনও শান্ত হতে পারেনি।

পিয়ারীলাল বললে, 'বাবুজি, একটু আস্তে কথা বলুন। এতটা অধীর হলে চলবে কেন?'

রাগে ফুলতে ফুলতে শঙ্করলালের প্রকাণ্ড দেহ হয়ে উঠল প্রকাণ্ডতর। সে আরও জোরে চিৎকার করে বললে, 'অধীর হব না? এতেও অধীর হব না? আমার দলে এত লোক, আজও তবু কেউ দীনুর একটা খবর আনতে পারলে না! তুমি কি ভাবছ দু লাখ টাকা হারিয়ে আমি এতটা অধীর হয়ে পড়েছি? একথা মনে কোরো না পিয়ারীলাল! অমন দু লাখ আমি হাসিমুখেই বিলিয়ে দিতে পারি। আমি অধীর হয়েছি প্রতিশোধ নেবার জন্যে। দীনু আমার বাড়িতে এসে হানা দেবে, আমাকে ঠকিয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। বাঘ কখনও শেয়ালের পদাঘাত সহ্য করতে পারে? তার উপরে ভুলে যেয়ো না, দীনুর জন্যেই আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে, আজও তার শোধ নেওয়া হল না! তবু আমি অধীর হব না পিয়ারীলাল?'

পিয়ারীলাল আবার বললে, 'আপনার পায়ে পড়ি বাবুজি, একটু আস্তে কথা বলুন।'

শঙ্করলাল বললে, 'কার ভয়ে আস্তে কথা কইব বল দেখি? বিশ্বাসঘাতক রামধনী তো আর বাড়িতে নেই!'

পিয়ারীলাল বললে, 'জানি বাবুজি। কিন্তু রামধনী যতদিন আমাদের এখানে ছিল, আমরা কি তাকে সন্দেহ করতে পেরেছিলুম? চুরির পরেই সে পালিয়ে গিয়েছিল বলেই

তো তার আসল রূপ ধরতে পেরেছি। রামধনী নেই, কিন্তু দীনুর আরও কোনও চর এখানে আছে কিনা কে বলতে পারে?'

শঙ্করলালের রাগে-ফোলা দেহ যেন চুপসে গেল। সে গদির উপরে বসে পড়ে স্বর নামিয়ে বললে, 'পিয়ারীলাল, তোমার কথা শুনে আমার রাগ যে আরও বেড়ে উঠতে চাইছে! দীনুর অন্য কোনও চরও আমার বাড়িতে আছে নাকি?'

—'থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।'

—'তাহলে এক কাজ করলেই তো হয়, বাড়ির সমস্ত চাকর-দরোয়ানদের তাড়িয়ে নতুন একদল লোক রাখব নাকি? তুমি কি পরামর্শ দাও?'

পিয়ারীলাল একটু হেসে বললে, 'নতুন লোক রাখলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। নতুন লোকজনদের অনেকেই আসবে হয়তো দীনুর আড্ডা থেকে। বাবুজি, দীনুডাকাতকে আপনি যতটা তুচ্ছ বলে ভাবছেন সে তা নয়। শুনেছি তার মনের জোর, বুদ্ধির জোর আর গায়ের জোর এই তিন জোরই আছে।'

শঙ্করলাল হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'ভেতো বাঙালি, তার আবার গায়ের জোর! তুমি আমাকে হাসালে পিয়ারীলাল।'

—'আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, অতবড়ো পালোয়ান মহাদেওবাবুজিকে দীনু একলাই কাবু করেছিল?'

—'হতে পারে। দাদার বয়েস হয়েছিল, বুড়োকে কাবু করা শক্ত নয়। তুমি জানো তো, ছেলেবেলায় আমিও কুস্তি শিখেছি, দাদার কাছেই? দাদা যখন-তখন বলতেন, 'শঙ্করলাল, বড়ো হলে তুই আমার চেয়েও জোয়ান হবি।' আমি জোর-গলায় বলতে চাই, দীনুর মতন বাঙালিকে আমি ঠিক খোকার মতন তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে পারি! এ খালি আমার মুখের কথা নয়, ভগবান যদি দিন দেন, তুমি তাহলে স্বচক্ষে দেখতে পাবে যে আমার কথা সত্যি কিনা!'

এই সময়ে ঘরের দরজায় বাহির থেকে করাঘাত হল। পিয়ারীলাল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে বললে, 'কিরে বুদ্ধু, তুই যে হঠাৎ এখানে? কোনো খবর-টবর আছে নাকি?'

বাহির থেকেই গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ বাবু, মস্ত সুখবর!'

—'তাই নাকি? আয়, ভেতরে আয়।'

বুদ্ধু ঘরের ভিতরে এসে শঙ্করলালকে অভিবাদন করলে। তাকে দেখতে ছিপছিপে, কিন্তু তার দেহ রীতিমতো কঠিন ও সবল। রং কালো, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ আর তার মুখচোখের উপরে ফুটে উঠেছে শয়তানীর স্পষ্ট ছাপ!

শঙ্করলাল একটু কৌতূহলী হয়ে বললে, 'হ্যাঁরে বুদ্ধু, তুই এমন কি সুখবর এনেছিস?'

বুদ্ধু একগাল হেসে বললে, 'আমি হাজার টাকার বকশিশ নিতে এসেছি হুজুর!'

শঙ্করলাল চমকে উঠল। ভ্রূ সঙ্কুচিত করে বললে, 'তার মানে? কিসের জন্যে বকশিশ?'

বুদ্ধু বললে, 'আজ আমি রামধনীকে দেখতে পেয়েছি!'

শঙ্করলাল আবার যেন নিবে গিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, 'ধ্যেৎ! এই তোর মস্ত সুখবর? রামধনী তো চুনোপুঁটি, তার জন্যে আবার বকশিশ কিসের রে?'

বুদ্ধু মুখ টিপে হাসতে হাসতে দুই হাত জোড় করে বললে, 'গোলামের সব কথা আগে শুনুন হুজুর!'

—'আচ্ছা, কি বলতে চাস বল।'

বুদ্ধু মাটির উপরে উবু হয়ে বসে বললে, 'হুজুর, আজ পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলুম রামধনীকে। কিন্তু সে আমাকে দেখতে পায়নি। হুজুরের বাড়িতে সে যে কি কাণ্ড করে পালিয়েছে আমার তো জানতে বাকি নেই, কাজেই সে কোথায় যায় দেখবার জন্যে আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছু ধরলুম। এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে এগিয়ে রামধনী শেষটা হাটখোলার গঙ্গার ধারে একখানা খুব পুরোনো বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। আমার কেমন সন্দেহ হল। রামধনী যখন দীনুডাকাতের চর তখন এ বাড়িখানা আর কার হতে পারে? বাড়ির চারিদিকে বার-কয়েক ঘোরাঘুরি করলুম, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু কিছু খোঁজখবরও নিলুম। তারপর বাড়ির ভিতরটা একবার উঁকি মেরে দেখবার জন্যে আমার মন যেন ছটফট করতে লাগল। তখন সন্ধে হয়েছে, দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক সেই ঘরের পাশেই ছিল একটা বড়ো বটগাছ। আমি চুপিচুপি সেই গাছে গিয়ে উঠলুম। খানিকটা উঠেই ঘরের ভিতরটা বেশ দেখতে পেলুম। হুজুর, বললে আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সেই ঘরের ভিতরে কাকে দেখলুম জানেন?'

খানিকটা কল্পনা করে নিয়ে শঙ্করলাল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে? কাকে?'

—'দীনুডাকাতকে হুজুর, দীনুডাকাতকে!'

শঙ্করলাল উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বিষম আগ্রহে বললে, 'তুই ঠিক বলছিস বুদ্ধু? তুই ঠিক দেখতে পেয়েছিস? তুই দীনুকে চিনিস তো?'

বুদ্ধু বললে, 'তা আর চিনব না হুজুর? দিনের পর দিন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আদালতের কাঠগড়ায়। তার চেহারা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আর ঘরের ভেতরে জোর আলো জ্বলছিল, দীনুর মুখ বেশ ভালো করেই দেখে নিয়েছি।'

শঙ্করলাল বিপুল উৎসাহে বুদ্ধুর পিঠের উপরে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, 'শাবাশ, বাহাদুর!'

বুদ্ধু নিজের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কাতর স্বরে বললে, 'এত জোরে আমাকে আর একবার আদর করলেই আমাকে পটল তুলতে হবে হুজুর!'

শঙ্করলাল হেসে ফেলে বললে, 'আচ্ছা, আর চড় মেরে আদর করব না! এখন বল দেখি, দীনু কি করছিল?'

—'শুয়ে ছিল। বিছানার উপরে চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে ছিল। দেখেই মনে হল, তার খুব শক্ত ব্যামো হয়েছে। রামধনী তাকে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছে, তাও আমি দেখে এসেছি। দীনু বোধহয় বিছানা ছেড়ে নামতে পারে না।'

শঙ্করলাল মহা আনন্দে নৃত্য করতে করতে বলে উঠল, 'জয় মা ভবানী! জয় মা কালী! তাহলে আজ রাত্রেই দেব নরবলি!'

পিয়ারীলাল জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি করতে চান বাবুজি?'

শঙ্করলাল বললে, 'কী আবার করতে চাইব? আজ পনেরো দিন ধরে সারাক্ষণই যে আশার স্বপ্ন দেখে আসছি, তাইই সফল করে তুলব! দীনুকে বধ করব—হ্যাঁ, নিজের হাতেই বধ করব—এমনি, এমনি করে'—বলেই সে আত্মবিস্মৃতের মতো দু-হাত বাড়িয়ে বুদ্ধুর গলা টিপে ধরতে গেল! কিন্তু বুদ্ধু ভারি হুঁশিয়ার ব্যক্তি, তড়াক করে এক লাফ মেরে শঙ্করলালের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ল।

পিয়ারীলাল তাড়াতাড়ি শঙ্করলালের দুই হাত চেপে ধরে বললে, 'শান্ত হোন বাবুজি, শান্ত হোন! বুদ্ধুকে আপনি দীনু মনে করবেন না।'

বুদ্ধু ত্রস্ত ভাবে বললে, 'হুজুর, আজ আর আমার বকশিশ চাই না, আমি কাল আবার আসব!'

শঙ্করলাল প্রায় গর্জন করে বললে, 'তুই চুপ করে ওইখানে দাঁড়া! তোকে আজ আমার সঙ্গে দীনুর বাড়িতে যেতে হবে। পিয়ারীলালও যাবে, আরও কেউ কেউ যাবে। আজ আর কিছুতেই দীনুকে আমি ছাড়ব না।'

পিয়ারীলাল ভয়ে ভয়ে বললে, 'বাবুজি, আপনার হুকুম আমরা সবাই মানতে রাজি আছি। কিন্তু এইসব গোলমালের ভেতরে আপনার মতন লোকের যাওয়া উচিত কি?'

মুখ-চোখ বিকৃত করে শঙ্করলাল নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললে, 'প্রতিহিংসা চাই, প্রতিহিংসা চাই, প্রতিহিংসা চাই! দীনুকে স্বহস্তে বধ না করলে আমার মন তৃপ্ত হবে না! আজ আমি দেখব সেই ভেতো বাঙালি কতটুকু শক্তি ধরে! আমি এক-একখানা করে তার দেহের প্রত্যেক হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব, তার জিভ টেনে বার করব, তার দুই-চোখ উপড়ে নেব!'

পিয়ারীলাল বললে, 'বাবুজিকে আমরা আর কি বলব? আপনি যা ভালো বোঝেন, করুন। আমরা কখন যাব?'

—'রাত বারোটার পরেই!'

নবম

দীনুর মুণ্ডচ্ছেদ

চাঁদনিরাত, কিন্তু চাঁদ দিয়েছে আজ মেঘের চাদর মুড়ি। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আলোমাখা অন্ধকার। খানিক দেখা যায়, খানিক দেখা যায় না।

রাত সাড়ে বারোটা। এ অঞ্চলটা এ সময়ে একেবারে নীরব ও নির্জন হয়ে পড়ে। খালি শোনা যায় গঙ্গার সুমধুর কলধ্বনি।

চাঁদ মুখ না ঢাকলে গঙ্গাকে দেখায় যেন নর্তকী। সে তালে তালে নাচে, আর তার হীরক-খচিত জল-নূপুর করে ঝকমক ঝকমক। কিন্তু আজ হারা চাঁদের শোকে গঙ্গাকে

দেখাচ্ছে যেন বিধবার সাদা কাপড়ের মতো। তার বুকে নেই আলোক-রেণু, নেই কোনও চাঞ্চল্য।

একখানা মাঝারি বাড়ি। সেকেলে, ময়লা, ফাট-ধরা। তার দোতলায় একখানি মাত্র ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। খোলা জানলার এই ঔজ্জ্বল্যটুকু না থাকলে মনে হত, এ-বাড়িতে কেউ বাস করে না। কারণ বাড়ির আর সব দরজা-জানলা বন্ধ এবং তার ভিতরটাও একেবারে নিসাড়।

একদিকে একটুকরো খোলা জমি। বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বেশ বড়োসড়ো একটা বটগাছ। এবং সেই গাছের তলায় দেখা যাচ্ছে যেন কয়েকটা অন্ধকারের ছায়ামূর্তি।

এরা হচ্ছে শঙ্করলাল ও তার দলবল। তারা ফিসফিস করে কি পরামর্শ করছে।

দলের যারা প্রধান এবং বুদ্ধি ও শক্তির জন্যে যাদের সুনাম আছে, শঙ্করলাল কেবল তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। গুণতিতে তারা আটজন।

শঙ্করলাল বলছে, 'পিয়ারীলাল, বুদ্ধুর কথা মিথ্যা নয়। গাছে চড়ে আমিও এইমাত্র দেখলুম, একখানা খাটের উপরে বুক পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে যে লোকটা ঘুমুচ্ছে, সে দীনু-ডাকাত ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। আর একটা ব্যাপারও আমি লক্ষ্য করেছি। দীনুর ঘরের দরজা খোলা।'

পিয়ারীলাল তবু বোঝ মানল না, বললে, 'কি জানি বাবুজি, আমার মন কেমন খুঁত খুঁত করছে!'

—'তোমার মন খুঁত খুঁত করছে কেন?'

—'মনে হচ্ছে ও-বাড়িতে ঢুকলে আমরা বিপদে পড়তে পারি!'

—'কি বিপদ?'

—'জানি না।'

—'ও তোমার মনের ভ্রম।'

—'ধরুন, বাড়ির ভিতরে দীনুর দল যদি আমাদের চেয়ে ভারি হয়?'

এবার বুদ্ধু কথা কইলে। বললে, 'সন্ধের সময়েই আমি এ পাড়ায় খবর নিয়ে জেনেছি, বাড়ির ভিতরে দুজন চাকর আর দীনু ছাড়া অন্য কেউ থাকে না।'

শঙ্করলাল বললে, 'শুনলে তো পিয়ারীলাল?'

পিয়ারীলাল জবাব দিলে না।

শঙ্করলাল বললে, 'এখন কথা হচ্ছে, বাড়ির ভেতরে ঢুকি কেমন করে? সদর বন্ধ, দরজা ভাঙা তো চলবে না!'

দলের একজন বললে, 'সর্দারজি, আমি একটা দড়ির সিঁড়ি এনেছি। হুকুম দেন তো সেই সিঁড়ি নিয়ে আমি ছাদের ওপরে উঠতে পারি।'

—'কেমন করে?'

—'ঐ জলের নলটা বয়ে।'

—'আরে বাহবা! তাহলে তো আর কোনও ভাবনাই থাকে না।'

—'ছাদে উঠে সিঁড়িটা আমি নামিয়ে দিচ্ছি। তারপর—'

—'থাক, আর বলা বাহুল্য। এখন তাড়াতাড়ি ছাদে ওঠ দিকি বাপু!'

লোকটা কাজের। নল ধরে এত সহজে ছাদে গিয়ে উঠল যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। তারপর দড়ির সিঁড়ি ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়ল। মিনিট-কয় পরেই দেখা গেল, ছাদের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্করলাল ও তার দলবল।

শঙ্করলাল চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'ওই তো দেখছি ছাদের সিঁড়ি। বুদ্ধু, তুই পা টিপে নিচে নেমে যা। তারপর সদর দরজাটা খুলে রাখ। কি জানি, যদি কোনও হাঙ্গাম হয়, পালাবার রাস্তা সাফ থাকবে। তুই সেইখানে দাঁড়িয়েই পাহারা দিবি—বুঝেছিস?'

বুদ্ধু তখনই ছাতের উপর থেকে অদৃশ্য হল।

পিয়ারীলাল বললে, 'বাবুজি, একটা কথা রাখবেন?'

—'কি কথা? আবার কি আমাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করবে?'

—'না বাবুজি।'

—'তাহলে বলো।'

—'দীনুকে জাগাবেন না। ভোজালির এক কোপে তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে উড়িয়ে দিন।'

—'কেন বলো দেখি?'

—'এটা একে বেপাড়া, তায় শত্রুপুরী। যত চুপিচুপি আর তাড়াতাড়ি কাজ সারা যায় ততই ভালো।'

—'ঠিক বলেছ পিয়ারীলাল, আমিও তাই ভাবছিলুম। বেশ, খালি তুমি আমার সঙ্গে এস। বাকি সবাই ছাতের ওপরেই থাকো। তোমাদের দরকার হলে ডাকব—কিন্তু বোধহয় দরকার হবে না। এসো পিয়ারীলাল!'

শঙ্করলাল ভোজালিখানা বার করে হাতে নিয়ে অগ্রসর হল। পিয়ারীলাল চলল পিছনে পিছনে।

সিঁড়ি বয়ে তারা দোতলায় নামল। তারপর দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল। কোথাও কোনও সাড়া নেই। বাড়িভরা এক ভীরু স্তব্ধতা যেন নর রক্তের কলঙ্ক মাখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে! নিশ্চন্দ্র রাত্রির খানিকটা যেন বাড়ির ভিতরে ঢুকে ব্যাপার দেখে শিউরে শিউরে উঠছে আতঙ্কে!

পিয়ারীলালের গা টিপে শঙ্করলাল একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখালে, একটা খোলা দরজা দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে পড়েছে খানিকটা আলো।

পিয়ারীলাল অস্ফুট স্বরে বললে, 'বোধহয় ওই ঘর!'

—'চুপ!'

নিঃশব্দে এগিয়ে তারা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশ থেকে ঘরের ভিতরে উঁকি মারলে। হ্যাঁ, তারা যথাস্থানেই এসেছে! বিছানার উপরে ওই যে দীনুডাকাত নিশ্চিন্ত মুখে উপভোগ করছে নিদ্রাসুখ! আহা, সে জানে না তার ঘুম আর এ-জীবনে ভাঙবে না!

সাবধানে দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

শঙ্করলাল বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল—তার চক্ষে জ্বলেছে হত্যার আগুন, তার মুখে ফুটেছে পিশাচের হাসি!

ভোজালিখানা ধীরে ধীরে মাথার উপরে তুলে সে লক্ষ্য স্থির করলে। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে ভোজালি নামল নিচের দিকে এবং পরমুহূর্তে দীনুর ছিন্নমুণ্ড ছিটকে সশব্দে লুটিয়ে পড়ল গৃহতলে এবং পরমুহূর্তে—

হ্যাঁ, পরমুহূর্তেই পিছনে গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'এখুনি মাথার উপরে হাত তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াও! একটু নড়লে বা টুঁ শব্দ করলেই কুকুরের মতন গুলি করে মেরে ফেলব!'

ভীষণ বিস্ময়ে ও সচমকে দুই মূর্তি পিছন ফিরে দেখলে, এইমাত্র যার মুণ্ডচ্ছেদ করা হল, ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে সেই দীনুডাকাত স্বয়ং, এবং তার দুই হাতে দুই রিভলভার!

একি স্বপ্ন? একি ভেল্কি? একি সত্য?

বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করলে আরও চারজন লোক—তাদেরও প্রত্যেকের হাতে একটা করে রিভলবার!

বরুণ বললে, 'মনে করছ তোমাদের ছাতের স্যাঙাতদের ডাকবে? ও-আশা ত্যাগ কর বন্ধুগণ, ও-আশা ত্যাগ কর! তাদের অবস্থাও এতক্ষণে তোমাদের মতনই হয়েছে! সিংহের গর্তে ঢুকলে ভেড়া কখনও পালাতে পারে? ছোটুলাল, এদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নে—এদের হাত-পা বেঁধে ফ্যাল!'

তখনও শঙ্করলালের ও পিয়ারীলালের আচ্ছন্ন আর হতভম্ব ভাব কেটে যায় নি, তারা বিনা-বাধায় আত্মসমর্পণ করলে, তাদের হাতে-পায়ে পড়ল কঠিন দড়ির বাঁধন!

বরুণ হাসতে হাসতে বললে, 'শঙ্করলাল, এখনও অবাক হয়ে কি ভাবছ বলো দেখি? ভাবছ, আমার কাটা মুণ্ড কেমন করে আবার জোড়া লাগল! পিছনদিকে চেয়ে দেখ, তুমি হত্যা করেছ আমার এক মোমেগড়া প্রতিমূর্তিকে!'

শঙ্করলাল মুখ ফিরিয়ে চকিত চক্ষে দেখলে, প্রতিমূর্তির কাটামুণ্ডটা নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত মুখে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে, তার গলদেশে একফোঁটাও রক্ত নেই! গভীর আক্ষেপে সে ফেললে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস!

বরুণ অট্টহাস্য করে বললে, 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছ বৎস? তোমার দুঃখে আমিও সহানুভূতি প্রকাশ করছি!'

এতক্ষণ পরে শঙ্করলাল মৌনব্রত ত্যাগ করলে। নিজের সঙ্গীর দিকে ফিরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'পিয়ারীলাল, আমরা বোকার মতন ফাঁদে পড়ে গিয়েছি!'

পিয়ারীলাল বিরক্ত ভাবে বললে, 'বাবুজি, আমি তো আগেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম! কেন আপনি আমার কথা শুনলেন না? কেন আপনি এখানে এলেন?'

ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বরুণ বললে, 'তুমি সাবধান করে দিয়েছিলে নাকি? ভ্যালা মোর শুভাকাঙ্ক্ষী রে! কিন্তু বাপু, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, আসন্ন কালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়?'

শঙ্করলাল হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললে, 'ওহে দীনুডাকাত, ভারি যে তোমার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা দেখছি! তুমি আমাদের নিয়ে কি করতে চাও শুনি?'

—'আমাকে নিয়ে তুমি যা করতে চেয়েছিলে!'

—'তুমি আমাদের খুন করবে?'

—'উঁহু! আমি তোমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাব—যেমন ঝুলিয়েছিলুম তোমার গুণধর বড়দাদা মহাদেওকে!'

—'কি বললি দীনুডাকাত?'

—'আমি নামে ডাকাত হতে পারি—কিন্তু ডাকাতি করি নরকের কীটদের উপরে, আর সেই টাকা বিলিয়ে দিই গরিব সাধুদের ভিতরে। আমি তোর মতন জাল-জুয়াচুরি-গুণ্ডামি করি না, জীবনে কোনোদিন মানুষের রক্তে কলঙ্কিত করি নি আমার এই হাত। আজ আমি তোর সাধুতার ঘোমটা খুলে দুনিয়াকে দেখাতে চাই আড়ালে রয়েছে কী কুৎসিত বীভৎসতা, কী জঘন্য পশুত্ব, কী অসম্ভব শয়তানি!'

শঙ্করলাল ঠিক উন্মাদগ্রস্তের মতন হা হা হা হা করে হাসতে শুরু করে দিলে। তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, 'ওরে হীন ডাকু, জানিস আমি শঙ্করলাল? জানিস আমার নাম সকলের মুখে মুখে? জানিস আমার দানের কথা? তুই যেসব কথা বললি তার প্রমাণ কোথায়? তোর মতন ডাকাতের কথায় কে বিশ্বাস করবে?'

বরুণ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সহজ স্বরেই বললে, 'তোর পাপের প্রমাণ দেবার মতন লোকের অভাব নেই।'

—'তাই নাকি?'

—'তোর সঙ্গে আজ যে দুর্লভ জীবগুলিকে পাকড়াও করেছি, তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে তারাই।'

—'হা হা হা হা! কিহে পিয়ারীলাল? তুমি আমার পাপের কথা কি জানো?'

পিয়ারীলাল বললে, 'ওসব কথা কিছুই আমি জানি না বাবুজি! আমি খালি জানি আপনি হচ্ছেন আমার অন্নদাতা প্রভু!'

গর্বিত কণ্ঠে শঙ্করলাল বললে, 'ওরে ডাকু, শুনলি তো?'

বরুণ হেসে উঠে বললে, 'শঙ্করলাল, অতটা আশ্বস্ত হয়ো না। তোমার মুখে পুরু করে কালি মাখাতে পারে এমন সাক্ষী আমার কাছেই আছে।'

শঙ্করলাল আশ্চর্য ভাবে বললে, 'তোর কাছে? বলিস কিরে!'

—'হ্যাঁ, ওই কথাই বলি।'

—'কে সে?'

—'বুদ্ধু।'

শঙ্করলাল দুই চোখ কপালে তুলে বললে, 'বুদ্ধু? সে তো আমার দলের লোক—সে তো আমারই হুকুমের দাস!'

বরুণ বললে, 'ওরে একচক্ষু হরিণ, তোর দেখবার ক্ষমতা কতটুকু? আজ তোকে এখানে কে ভুলিয়ে এনেছে জানিস? তার নাম হচ্ছে বুদ্ধু!'

শঙ্করলাল তখনও বিশ্বাস করতে পারলে না। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বললে, 'বুদ্ধু? অসম্ভব!'

বরুণ বললে, 'হ্যাঁ গো সিংহচর্মাবৃত গর্দভ! বুদ্ধুকে পাঠিয়েই আজ তোমাদের এই ফাঁদে এনে ফেলেছি।'

শঙ্করলাল স্তম্ভিতের মতন চুপ করে রইল।

পিয়ারীলাল বললে, 'বুদ্ধু তো আমাদেরই দলের লোক। আমরা যা করেছি, সেও তো তাই করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে সে নিজের গলা বাঁচাবে কেমন করে?'

বরুণ হাসিমুখেই বললে, 'বোকারাম কোথাকার, ইংরেজি-আইনে 'রাজার সাক্ষী' বলে এক জীব আছে তাও কি তোদের মনে নেই?'

শঙ্করলাল হঠাৎ বিকট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'বুদ্ধুকে এনে দাও—বুদ্ধুকে আমার কাছে এনে দাও! আমি এখুনি তাকে খুন করে ফেলব!'

বরুণ ঘাড় নাড়তে নাড়তে কৌতুকভরে বললে, 'আহা আমার ছাতুভুক! হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধা, সুমুখ দিয়ে একটা মাছি উড়ে গেলেও কিছু করতে পারবে না, সে আবার বলে কিনা, খুন করব! বলিহারি ছাতুর গুণ! বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি!'

দুই হস্ত প্রাণপণে বন্ধনমুক্ত করবার জন্যে বিফল চেষ্টা করতে করতে শঙ্করলাল সচিৎকারে বললে, 'কী বলব রে ভেতো বাঙালি! আমার হাত-পায়ের দড়ি খোলা থাকলে দেখে নিতুম আজ তোকে!'

বরুণ নিজের মুখ শঙ্করলালের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ছাতুখোর, তুমি আমায় চোখের সামনেই দেখছ! তুমি কি এর চেয়েও ভালো করে আমাকে দেখতে পারো?'

শঙ্করলাল নিষ্ফল আক্রোশ আর সামলাতে না পেরে হঠাৎ বরুণের মুখের উপরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ রে চিংড়িমাছখেকো ভাতের পোকা,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! একবার আমার বাঁধন খুলে দিয়ে দ্যাখ না।'

বরুণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের থুতু কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে গম্ভীর স্বরে ডাকলে, 'ছোট্টুলাল!'

ছোট্টুলাল তখনই ভিতরে এসে বললে, 'হুজুর!'

—'শঙ্করলালের হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দাও।'

ছোট্টুলাল সভয়ে বললে, 'কি বলছেন হুজুর!'

বরুণ অধীর ভাবে মাটির উপরে পদাঘাত করে বললে, 'প্রতিবাদ কোরো না! যা বলছি শোনো! শঙ্করলালের বাঁধন খুলে দিয়ে তোমরা দরজার কাছে গিয়ে রিভলবার নিয়ে দাঁড়াও। এই হতভাগ্য যদি আমাকে হারিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারে, তোমরা পথ ছেড়ে দেবে! কিন্তু তার আগে যদি পালাবার চেষ্টা করে, তোমরা তখুনি একে গুলি করে কুকুরের মতন মেরে ফেলবে।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই বিচিত্র এক অভিনয়ের জন্যে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হল। শঙ্করলাল বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন!

বরুণ নিজের পাঞ্জাবিটা খুলে দরজার কাছে ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে অত্যন্ত শান্ত ভাবেই বললে, 'এসো ছাতুর ট্রেডমার্ক! বাংলাদেশে

বসে, বাঙালির রক্তশোষণ করে তুমি আজ গালাগাল দিচ্ছ বাঙালিকেই? দেখি আজ ছাতুর বীরত্ব! আমি প্রস্তুত।'

শঙ্করলাল কোনও কথা বললে না, সেও নিজের জামা খুলে ফেললে! তারপর একবার দরজার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, পালাবার পথ জুড়ে চকচক করছে চার-চারটে রিভলবার! তারপর সে নিজের গেঞ্জিটাও খুলে ফেললে। তখন দেখা গেল তার বিরাট বক্ষ ও বাহুমূলের স্ফীত মাংসপেশী—যা দেখলে রীতিমতো বলিষ্ঠ ব্যক্তির মনও একেবারে দমে যায়।

সে বললে, 'দীনু, তুই সত্যি কথা বলছিস তো?'

—'কি?'

—'তোকে হারাতে পারলে আর কেউ আমাকে বাধা দেবে না? আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব?'

—'আমি শঙ্করলাল নই, আমার কথার মূল্য আছে!'

—'দ্যাখ তবে মজাটা!' বলেই শঙ্করলাল তার সুদীর্ঘ বাহু বিস্তার করে বরুণকে ধরবার জন্যে প্রকাণ্ড এক লম্ফত্যাগ করলে!

বরুণ হেঁট হয়ে বিদ্যুৎবেগে এক পাশে সরে গেল এবং শঙ্করলাল মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কঠিন দেওয়ালের উপরে। সেই আঘাতের যন্ত্রণা সামলাবার আগেই সে আচ্ছন্নের মতন অনুভব করলে, পিছন থেকে তার কোমর ধরে কে তাকে অত্যন্ত অনায়াসে শূন্যে তুলে সজোরে নিক্ষেপ করলে ঘরের মেঝের উপরে! সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের ধাক্কা লেগে কাঁচের গেলাস ও কুঁজো সমেত একটা তেপায়া সশব্দে উল্টে মেঝের উপরে গিয়ে পড়ল।

শঙ্করলাল কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল এবং সেই আর্তধ্বনি স্তব্ধ হবার আগেই বরুণ আবার তার দীর্ঘ কেশ ধরে আকর্ষণ করে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে! তারপরেই তার উপরে হতে লাগল অবিশ্রাম মুষ্টির পর মুষ্টির আঘাত! কী তার হয়েছে, কে তাকে মারছে, সেসব কিছু বোঝবার আগেই শঙ্করলাল আবার হল পপাত ধরণীতলে!

বরুণ উদ্যত বজ্রের মতন গর্জন করে বললে, 'শঙ্করলাল! তুই কি এখনও ভেতো বাঙালির শক্তি-পরীক্ষা করতে চাস?'

কিন্তু শঙ্করলাল নিশ্চেষ্ট হয়ে বোবার মতন পড়ে রইল—কারণ, তখন তার কথা কইবার বা ওঠবার আর কোনও ক্ষমতাই ছিল না।

বরুণ বললে, 'লড়তে আমি ভালোবাসি! কিন্তু যে-লড়াই এত সহজে শেষ হয়ে যায়, সে হচ্ছে ছেলেখেলা! ছোট্টুলাল!'

—'হুজুর!'

—'এই অপদার্থটাকে আবার ভালো করে বেঁধে ফ্যালো!'

আদেশ পালন করতে ছোট্টুলালের বিলম্ব হল না।

নিক্ষিপ্ত পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে তার ভিতরে মাথা গলিয়ে বরুণ বললে, 'ভাই ছোট্টু!'

—'হুজুর!'

—'এখন আমাদের কি করা উচিত বল দেখি?'

—'হুজুরই জানেন!'

—'না ছোট্টুলাল, তোরা সবাই আমার সঙ্গে বড়ো গোলামের মতন কথা বলিস! তোরা কি আমার গোলাম? তোরা যে আমার ভাই!'

ছোট্টুলাল হঠাৎ হেঁট হয়ে পড়ে দুই হাতে বরুণের দুই পা জড়িয়ে ধরে অভিভূত স্বরে বললে, 'না হুজুর, আমরা আপনার ছেলে!'

বরুণ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'বা রে ছোট্টু, বেশ যে কথা কইতে শিখেছিস! তাহলে শোনো পুত্রবর! আমার পদযুগল ত্যাগ করে উঠে দণ্ডায়মান হও! তোমাকে এখুনি একবার টেলিফোনের কাছে যেতে হবে। ইনস্পেক্টার অশান্ত অর্থাৎ প্রশান্ত চৌধুরীর ঠিকানায় ফোন করে দাও যে, এখানে তাঁর জন্যে অনেকগুলি জীবন্ত রত্ন অপেক্ষা করে আছে। বুদ্ধু এখানে থাকবে। অশান্তকে জানিয়ে রেখো, বুদ্ধুই হবে 'রাজার সাক্ষী'! তাকে আরও বলে রেখো যে, তারপরে তার যদি কিছু জানবার দরকার থাকে আমার পত্র যথাসময়ে হাজির হয়ে জানিয়ে দেবে।'

—'আচ্ছা, হুজুর!'

—'ফোন করবার পরে আমরা কি করব ছোট্টু?'

—'আপনিই জানেন হুজুর!'

—'ছোট্টুলাল, তারপরে এস্থান হবে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক! কারণ, তারপরে অশান্ত চৌধুরী এখানে এসে একসঙ্গে রথ দেখতে আর কলা বেচতে চাইবে! অর্থাৎ সে শঙ্করলালদেরও ধরবে আর আমাদেরও ছাড়বে না! দরকার কি অত গোলমালে ভাই? তোমার 'ফোনের' কথা শেষ হলেই আমি সদলবলে অদৃশ্য হব! কি বল? সেইটেই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?'

ছোট্টুলাল নতমুখে বললে, 'আপনিই জানেন হুজুর!'

বরুণ রেগে উঠে বললে, 'ছোট্টু, তোর কথা ভালো লাগে না, তুই চলে যা আমার সুমুখ থেকে! তুই হচ্ছিস আমার বাজে প্রতিধ্বনি! যা, ফোন করগে যা!'

দশম

ডাণ্ডার কাণ্ড

বরুণ ও ছোট্টুলাল ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হল। তারপর শোনা গেল সিঁড়ির উপরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। তারপর আর জনপ্রাণীর সাড়া নেই—শোনা যায় কেবল অদূরবর্তিনী গঙ্গার জলদলকলরব।

এতক্ষণে শঙ্করলালের দর্প চূর্ণ হয়েছে। কষ্টে নিঃশ্বাস টানতে টানতে সে বললে, 'পিয়ারীলাল, আর আমাদের রক্ষা নেই। এখনই পুলিস এসে পড়বে।'

হাত-পা-বাঁধা পিয়ারীলাল ঘরের মেঝের উপরে গড়িয়ে গড়িয়ে শঙ্করলালের পাশে গিয়ে হাজির হল। তারপর ফিশ ফিশ করে বললে, 'ভয় নেই বাবুজি! আমরা বোধহয় এখান থেকে লম্বা দিতে পারব!'

—'যাও, যাও, বাজে বোকো না!'

—'ঠিক বলছি হুজুর, ঠিক বলছি! ভাগ্যে ওরা আলো নিবিয়ে দিয়ে যায় নি!'

—'আরে নির্বোধ, আলো নিবিয়ে দিলে আমাদের এর চেয়ে বেশি আর কি অসুবিধা হত?'

—'আমরা চোখে দেখতে পেতুম না।'

—'মূর্খ!'

—'চোখে দেখতে পাচ্ছি বলেই আমি পালাবার উপায়ও দেখতে পাচ্ছি!'

—'পিয়ারীলাল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আমাদের হাত-পা বাঁধা, আমরা—'

পিয়ারীলাল বাধা দিয়ে বললে, 'আস্তে বাবুজি, বুদ্ধুকে এখানে পাহারায় রেখে গেছে। চেয়ে দেখুন ওই ভাঙা কাচের গেলাস আর কুঁজোর দিকে!'

তাদের মারামারির সময়ে তেপায়া-উল্টে-পড়ে-যাওয়া সেই কাচের গেলাস ও কাচের কুঁজোর ভাঙা টুকরোগুলো মেঝের উপরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়েও শঙ্করলাল কিছুই বুঝতে পারলে না।

পিয়ারীলাল বললে, 'ভাঙা কাচে ক্ষুরের মতো ধার হয় জানেন তো বাবুজি? আমি একখানা খুব ধারালো কাচ বেছে নিয়ে আগে আপনার হাতের দড়ি কেটে দেব। তারপর আপনি কেটে দেবেন আমার বাঁধন!'

—'পিয়ারীলাল, তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু তোমারও যে হাত-পা বাঁধা, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

—'কিন্তু আমার মুখ আর দাঁত তো বাঁধা নেই! ভাঙা কাচ দাঁতে চেপে ধরে আমি আপনার হাতের দড়ি ঠিক কেটে দিতে পারব। সেই সময়ে এক ভয় বুদ্ধুকে, কিন্তু সে হচ্ছে একের নম্বরের ভিতু, আড়ালে বসে পাহারা দিচ্ছে বটে, কিন্তু আপনার সামনে মুখ দেখাতে ভরসা করবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই শঙ্করলালের হাতের বাঁধন খসে পড়ল এবং তারপর তাদের উভয়েরই বন্ধনমুক্ত হতে বেশি দেরি লাগল না।

... ...

বরুণ ও ছোট্রু চলে যাবার পর বুদ্ধু একতলায় সদর দরজার সামনে পুলিসের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিয়ারীলালের অনুমান মিথ্যা নয়, একে শঙ্করলালকে সে মূর্তিমান যমের মতন ভয় করত, তার উপরে সে করেছে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা, ভয়ে ও চক্ষুলজ্জায় উপরে যেতে তার পা উঠল না। আর উপরে যাবার প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করলে না, আষ্টেপৃষ্ঠে যাদের বেঁধে রাখা হয়েছে, তাদের নিয়ে আবার মাথা ঘামাবার দরকার কি? অতএব বুদ্ধু নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি ফুঁকে সময় কাটাতে লাগল।

ইতিমধ্যে একখানা আরও কালো এবং আরও পুরু মেঘ এসে চাঁদনি-রাতকে একেবারে গ্রাস করে ফেললে। সেই ঘনঘটায় বাইরের খোলা জমিটা হারিয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের

অন্তরালে। চমকে উঠল তীব্র বিদ্যুৎশিখা, গর্জন করে উঠল ক্রুদ্ধ বজ্র, হুহু করে ছুটে এল একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়া—বৃষ্টি পড়তে বোধহয় আর দেরি নেই।

ঠাণ্ডা বাতাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে গায়ের কাপড়খানা ভালো করে মুড়ি দিয়ে বুদ্ধু যখন ভাবছে—পুলিস এখনও আসে না কেন, ঠিক সেই সময়ে অদূরে জেগে উঠল রাত্রির বুক মথিত করে দ্রুতগামী মোটরগাড়ির চিৎকার!

মুখের বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বুদ্ধু বলে উঠল, 'নিশ্চয় পুলিসের গাড়ি!'

সিঁড়ির উপরে পদশব্দ! সচমকে মুখ ফিরিয়ে বুদ্ধু সভয়ে দেখলে অসম্ভব দৃশ্য! মারমুখো হয়ে দুমদাম করে নেমে আসছে শঙ্করলালের বিভীষণ প্রকাণ্ড দেহ এবং তার পিছনে পিছনে পিয়ারীলাল!

তারপর কি করা উচিত, সেটা স্থির করতে তার কালবিলম্ব হল না। বাড়ির বাইরে লম্বা এক লাফ মেরে বুদ্ধু হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভিতরে।

শঙ্করলাল তার পশ্চাতে ধাবমান হবার চেষ্টা করতেই পিয়ারীলাল বলে উঠল, 'হুঁশিয়ার বাবুজি! পুলিসের গাড়ি কাছে এসে পড়েছে!'

পুলিসের নাম শুনেই শঙ্করলাল থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে ত্রস্ত চক্ষে দেখলে, পূর্বদিকের রাস্তা ধরে একখানা বাসের মতন মস্ত গাড়ি হেড লাইট জ্বেলে বেগে ছুটে আসছে।

পিয়ারীলাল বললে, 'দৌড়ে চলুন—আমরা গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ব!'

আচম্বিতে কোন অদৃশ্য কণ্ঠে জাগ্রত হল ব্যঙ্গপূর্ণ হো হো অট্টহাস্য!

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন শঙ্করলাল বলে উঠল, 'ও কে? ও কে হাসে রে?'

—'তোর যম!'

—'কে তুই? বেরিয়ে আয় সামনে!'

প্রমাদ গুণে পিয়ারীলাল বললে, 'এখুনি সর্বনাশ হবে! গঙ্গার দিকে—গঙ্গার দিকে চলুন!'

কিন্তু গঙ্গার দিকে অগ্রসর হতে না হতেই কি-একটা জিনিস কোথা থেকে সজোরে ধাঁ করে শঙ্করলালের ডান পায়ের উপরে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'বাপরে বাপ' বলে সে হল গোড়াকাটা কলাগাছের মতন পপাতধরণীতলে!

—'কি হল বাবুজি! উঠুন—উঠুন!' বলে পিয়ারীলাল দুইহাতে প্রাণপণে শঙ্করলালকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে।

আবার ধপাস করে বসে পড়ে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে শঙ্করলাল বললে, 'আমার ডান পা বোধহয় ভেঙে গিয়েছে—আমি আর চলতে পারছি না!'

হা হা হা হা করে হাসির সঙ্গে অন্ধকারের ভিতর থেকে শোনা গেল—'আমি দীনু! বৎস ছাতু, আমাকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়, তুমি যাতে চলতে না পারো সেই ব্যবস্থাই আমি করেছি!'

দুর্জয় ক্রোধে দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে শঙ্করলাল দাঁড়িয়ে উঠে এক বিকট হুঙ্কার দিয়ে লম্ফত্যাগ করলে এবং তারপর আবার মাটির উপরে পড়েই বিষম আর্তনাদ করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তেই ঘটনাস্থলে হুড়মুড় করে পুলিসগাড়ির আবির্ভাব। ভিতর থেকে হস্তদন্তের মতন প্রশান্ত বেরিয়ে এল সদলবলে।

মাঠের নীরন্ধ্র অন্ধকারকে বিতাড়িত করেছে হেডলাইটের উগ্র ছটা। পিয়ারীলাল তখন অদৃশ্য, ভূমিতলে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে কেবল শঙ্করলালের প্রায়-অচেতন দেহ।

এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করে প্রশান্ত মাটির উপর থেকে তুলে নিলে লোহা-দিয়ে বাঁধানো ও এক হাত লম্বা একটা খেঁটে বা ছোট ডাণ্ডা। বিস্মিত চোখে সেটা সে পরীক্ষা করতে লাগল।*

একাদশ

আবির্ভাব ও অন্তর্ধান

প্রশান্ত পথ চলতে চলতে হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলে, অরুণের বাড়ির সমস্ত দরজা ও জানলা খোলা! তবে কি অরুণ আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে?

সদর দরজার কাছে গিয়ে প্রশান্ত ডাকলে, 'ও অরুণবাবু, অরুণবাবু!'

ডাক শুনে অরুণ নিচে নেমে এল। বললে, 'আরে, প্রশান্তবাবু যে! কলকাতায় পা দিতে না দিতেই আপনার মুখদর্শন! তাহলে এখনও আমাদের বাড়ির ওপরে আপনাদের পাহারা বজায় আছে দেখছি!'

প্রশান্ত মস্তকান্দোলন করে বললে, 'না মশাই, না! খালি-খাঁচার ওপরে পাহারা দেব, আমরা এতটা মূর্খ নই! আপনি যে ফিরেছেন তাও আমি জানতুম না। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বাড়ির জানলা-দরজা খোলা দেখে খবর নিতে এলুম। সেটাও কি অন্যায়?'

—'না, না, এসেছেন—বেশ করেছেন! চলুন, বৈঠকখানায় চলুন।'

—'সময় নেই মশাই, সময় নেই! একটা নতুন মামলা সাজাতে হচ্ছে।'

—'অন্তত এক কাপ চা আর টোস্টের স্বাদ নিয়ে যান। ফেরবার পথে বর্ধমান থেকে সীতাভোগ আর মিহিদানা নিয়ে এসেছি, তারও দু-চারটে নমুনা পরীক্ষা করলে কম খুশি হব না!'

—'লোভ দেখিয়ে জব্দ করলেন দেখছি। চলুন তাহলে।'

দুজনে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল!

অরুণ ডাকলে, 'শ্রীধর! অ শ্রীধর!'

—'আজ্ঞে!'

—'দুজনের জন্যে টোস্ট, চা, সীতাভোগ, মিহিদানা।'

—'পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবু!'

অরুণ ফিরে বসে বললে, 'তারপর প্রশান্তবাবু, নতুন কি মামলার কথা বলছিলেন না?'

—'হ্যাঁ মশাই, ভারি জটিল মামলা!'

---

* দূরের কোনও লোককে অক্ষম করবার জন্যে বাংলাদেশের সেকালকার ডাকাতরা এইরকম খেঁটে বা ছোট ডাণ্ডা ব্যবহার করত। আজকাল এর ব্যবহার উঠে গিয়েছে বটে, কিন্তু আগে অভ্যস্ত হাতে এই অস্ত্র হত অব্যর্থ।

—'শঙ্করলালের মামলা বুঝি?'

—'সে খবরও রাখেন?'

—'কাগজে পড়েছি। আপনি খুব বড়ো বড়ো আসামিকে গ্রেপ্তার করেছেন দেখছি। এই সেদিন ধরলেন মহাদেওগুণ্ডাকে, তারপর দীনুডাকাতকে। তারপর আবার এই শঙ্করলালকে। আপনার বাহাদুরি দেখলে অভিভূত হতে হয়।'

—'ঠাট্টা করছেন?'

—'কেন, ঠাট্টা কেন?'

—'আপনি তো জানেন, মহাদেওকে ধরিয়ে দিয়েছে দীনু, আর দীনুকে ধরিয়ে দিয়েছে শঙ্করলাল। আবার শঙ্করলালকে ধরিয়ে দিয়েছে কে, দুদিন পরে তাও শুনতে পাবেন।'

—'এখনই শুনি না।'

—'শঙ্করলালকে ধরিয়ে দিয়েছে আপনার বন্ধু—'

—'বরুণ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি তা জানি।'

—'কি করে জানলেন? খবরের কাগজে তো ও-কথা বেরোয়নি, আর আপনি ছিলেন কলকাতার বাইরে—সুতরাং দীনুর সঙ্গেও আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।'

—'এক-মুহূর্তেই আপনার পুলিস প্রাণ জেগে উঠল যে! একেবারে জেরা শুরু করে দিলেন?'

—'না মশাই, আমি জেরা-টেরা করছি না। কিন্তু যে কথা আপনার জানা অসম্ভব, আপনি তা জানলেন কেমন করে? তাই বিস্মিত হচ্ছি।'

অরুণ দরজা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'এইতেই বিস্মিত হচ্ছেন? তাহলে অধিকতর বিস্মিত হবার জন্যে প্রস্তুত হোন প্রশান্তবাবু!'

—'মানে?'

—'আমাকে মানে বলে দিতে হবে না—নিজেই বুঝতে পারবেন!'

পরমুহূর্তেই প্রশান্ত যা দেখলে সেটা তার কল্পনাতীত!

চায়ের ট্রে হাতে করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে যে লোকটি, অরুণ তাকে বরুণ বলে জানে, আর প্রশান্ত জানে দীনুডাকাত বলেই!

প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে!

বরুণ একগাল হেসে মিষ্টি গলায় বললে, 'আমাকে দেখে ব্যস্ত হবেন না প্রশান্তবাবু! এখন আমি দীনুডাকাত নই, আমার নাম শ্রীবরুণকুমার।'

প্রশান্ত একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। যে দীনুকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সে দিবারাত্র জল্পনা-কল্পনা করে, যাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাবার জন্যে রাজশক্তি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সেইই কিনা স্বেচ্ছায় আজ তার সুমুখেই এসে হাজির! অপরাধীর এতখানি বুকের পাটা দেখেছে কেউ কখনও?

ট্রে-খানা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে বরুণ তেমনই হাসিমুখেই বললে, 'আজ

আপনাকে পরিবেশন করবার সৌভাগ্য অর্জন করে এই অধমের জীবন আর দেহ আর মন সার্থক হয়ে গেল! টোস্ট খান, সীতাভোগ খান, মিহিদানা খান, চা খান! আরও কিছু চান?'

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল প্রশান্তের মুখ-চোখের ভাব!

বরুণ নরম গলাতেই বললে, 'এমন ভাবে দেখা হয় না বাঘ আর হরিণের—না প্রশান্তবাবু? কিন্তু আমি জানি এ বাড়ির ওপরে যখন আর পুলিসপাহারা নেই, তখন নিরাপদেই পদার্পণ করতে পারি আমি। তারপর অকস্মাৎ মহাশয়ের আবির্ভাব। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলুম, আপাতত আপনি যখন নিরস্ত্র, আর আমার পকেটে আছে একটি অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র, তখন নির্ভয়ে আপনার সঙ্গে দু-চারটে বাক্যালাপ করে গেলে মাথার ওপরে আকাশ ভেঙে পড়বে না! আপনি কি বলেন?'

প্রশান্ত কিছুই বলতে পারলে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বরুণের মুখের পানে।

বরুণ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'আমার দিকে অমন বোবার মতন তাকিয়ে থাকলে একটুও লাভ হবে না। খাবার আর চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বসতে আজ্ঞা হোক। কিঞ্চিৎ উদরসেবা করে আমার আর অরুণের জীবন ধন্য করুন। ....আচ্ছা, এই দেখুন, আগে আমিই আরম্ভ করছি—আপনাকে উৎসাহিত করবার জন্যে!' এই বলে সে একখানা টোস্ট হাতে করে তুলে নিলে।

অরুণ বললে, 'নিন প্রশান্তবাবু, আরম্ভ করুন।'

প্রশান্ত নীরস স্বরে বললে, 'অনুরোধ যখন করছেন, ভদ্রতার খাতিরে রাখতেই হবে। কিন্তু আমার চা ছাড়া আর কিছুই চলবে না।'

বরুণ বললে, 'তাহলে এই খাবারগুলো কেন এখানে এল?'

—'আপনারা গ্রহণ করবেন বলে। আমার হাতে আর সময় নেই, আমাকে এখনই বিদায় নিতে হবে।' প্রশান্ত তাড়াতাড়ি চা শেষ করবার জন্যে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল ঘন ঘন।

বরুণ হেসে বললে, 'মাপ করবেন প্রশান্তবাবু। তাড়াতাড়ি চা শেষ করলেও আপনি এখন পালাতে পারবেন না!'

—'মানে?'

—'আমার আগে আপনি এখান থেকে অদৃশ্য হতে পারবেন না।'

—'এটা কি আদেশ?'

—'উঁহু, অনুরোধ।'

—'এমন আশ্চর্য অনুরোধের কারণ?'

—'অনুমান করুন।'

—'অনুমান করতে পারছি না।'

—'এটা কি সত্যকথা?'

—'হ্যাঁ।'

—'না!'

—'আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চান?'

—'শঙ্করলালের মামলা বুঝি?'

—'সে খবরও রাখেন?'

—'কাগজে পড়েছি। আপনি খুব বড়ো বড়ো আসামিকে গ্রেপ্তার করেছেন দেখছি। এই সেদিন ধরলেন মহাদেওগুণ্ডাকে, তারপর দীনুডাকাতকে। তারপর আবার এই শঙ্করলালকে। আপনার বাহাদুরি দেখলে অভিভূত হতে হয়।'

—'ঠাট্টা করছেন?'

—'কেন, ঠাট্টা কেন?'

—'আপনি তো জানেন, মহাদেওকে ধরিয়ে দিয়েছে দীনু, আর দীনুকে ধরিয়ে দিয়েছে শঙ্করলাল। আবার শঙ্করলালকে ধরিয়ে দিয়েছে কে, দুদিন পরে তাও শুনতে পাবেন।'

—'এখনই শুনি না।'

—'শঙ্করলালকে ধরিয়ে দিয়েছে আপনার বন্ধু—'

—'বরুণ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি তা জানি।'

—'কি করে জানলেন? খবরের কাগজে তো ও-কথা বেরোয়নি, আর আপনি ছিলেন কলকাতার বাইরে—সুতরাং দীনুর সঙ্গেও আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।'

—'এক-মুহূর্তেই আপনার পুলিস প্রাণ জেগে উঠল যে! একেবারে জেরা শুরু করে দিলেন?'

—'না মশাই, আমি জেরা-টেরা করছি না। কিন্তু যে কথা আপনার জানা অসম্ভব, আপনি তা জানলেন কেমন করে? তাই বিস্মিত হচ্ছি।'

অরুণ দরজা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'এইতেই বিস্মিত হচ্ছেন? তাহলে অধিকতর বিস্মিত হবার জন্যে প্রস্তুত হোন প্রশান্তবাবু!'

—'মানে?'

—'আমাকে মানে বলে দিতে হবে না—নিজেই বুঝতে পারবেন!'

পরমুহূর্তেই প্রশান্ত যা দেখলে সেটা তার কল্পনাতীত!

চায়ের ট্রে হাতে করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে যে লোকটি, অরুণ তাকে বরুণ বলে জানে, আর প্রশান্ত জানে দীনুডাকাত বলেই!

প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে!

বরুণ একগাল হেসে মিষ্টি গলায় বললে, 'আমাকে দেখে ব্যস্ত হবেন না প্রশান্তবাবু! এখন আমি দীনুডাকাত নই, আমার নাম শ্রীবরুণকুমার।'

প্রশান্ত একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। যে দীনুকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সে দিবারাত্র জল্পনা-কল্পনা করে, যাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাবার জন্যে রাজশক্তি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সেইই কিনা স্বেচ্ছায় আজ তার সুমুখেই এসে হাজির! অপরাধীর এতখানি বুকের পাটা দেখেছে কেউ কখনও?

ট্রে-খানা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে বরুণ তেমনই হাসিমুখেই বললে, 'আজ

আপনাকে পরিবেশন করবার সৌভাগ্য অর্জন করে এই অধমের জীবন আর দেহ আর মন সার্থক হয়ে গেল! টোস্ট খান, সীতাভোগ খান, মিহিদানা খান, চা খান! আরও কিছু চান?'

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল প্রশান্তের মুখ-চোখের ভাব!

বরুণ নরম গলাতেই বললে, 'এমন ভাবে দেখা হয় না বাঘ আর হরিণের—না প্রশান্তবাবু? কিন্তু আমি জানি এ বাড়ির ওপরে যখন আর পুলিসপাহারা নেই, তখন নিরাপদেই পদার্পণ করতে পারি আমি। তারপর অকস্মাৎ মহাশয়ের আবির্ভাব। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলুম, আপাতত আপনি যখন নিরস্ত্র, আর আমার পকেটে আছে একটি অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র, তখন নির্ভয়ে আপনার সঙ্গে দু-চারটে বাক্যালাপ করে গেলে মাথার ওপরে আকাশ ভেঙে পড়বে না! আপনি কি বলেন?'

প্রশান্ত কিছুই বলতে পারলে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বরুণের মুখের পানে।

বরুণ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'আমার দিকে অমন বোবার মতন তাকিয়ে থাকলে একটুও লাভ হবে না। খাবার আর চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বসতে আজ্ঞা হোক। কিঞ্চিৎ উদরসেবা করে আমার আর অরুণের জীবন ধন্য করুন। ....আচ্ছা, এই দেখুন, আগে আমিই আরম্ভ করছি—আপনাকে উৎসাহিত করবার জন্যে!' এই বলে সে একখানা টোস্ট হাতে করে তুলে নিলে।

অরুণ বললে, 'নিন প্রশান্তবাবু, আরম্ভ করুন।'

প্রশান্ত নীরস স্বরে বললে, 'অনুরোধ যখন করছেন, ভদ্রতার খাতিরে রাখতেই হবে। কিন্তু আমার চা ছাড়া আর কিছুই চলবে না।'

বরুণ বললে, 'তাহলে এই খাবারগুলো কেন এখানে এল?'

—'আপনারা গ্রহণ করবেন বলে। আমার হাতে আর সময় নেই, আমাকে এখনই বিদায় নিতে হবে।' প্রশান্ত তাড়াতাড়ি চা শেষ করবার জন্যে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল ঘন ঘন।

বরুণ হেসে বললে, 'মাপ করবেন প্রশান্তবাবু। তাড়াতাড়ি চা শেষ করলেও আপনি এখন পালাতে পারবেন না!'

—'মানে?'

—'আমার আগে আপনি এখান থেকে অদৃশ্য হতে পারবেন না।'

—'এটা কি আদেশ?'

—'উঁহু, অনুরোধ।'

—'এমন আশ্চর্য অনুরোধের কারণ?'

—'অনুমান করুন।'

—'অনুমান করতে পারছি না।'

—'এটা কি সত্যকথা?'

—'হ্যাঁ।'

—'না!'

—'আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চান?'

—'পাগল! পুলিস কখনও মিথ্যাকথা বলতে পারে?'

—'তাহলে আমি আপনার বন্দী?'

—'আজ্ঞে না! পুলিসকে বন্দী করে রাখবার মতন জেলখানা কোথায় পাব আমি? আসল কথা কি জানেন প্রশান্তবাবু? আপনাকে আগে যেতে দিলে, আপনি এখনই তীরবেগে ধাবমান হবেন লালপাগড়ির অন্বেষণে। দীনুডাকাতকে ধরবার সুযোগ আর আমি আপনাকে দেব না!'

প্রশান্ত বসে রইল,—ঠিক যেন বোকা!

বরুণ হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বর বদলে কঠিন কণ্ঠে বললে, 'শোনো প্রশান্ত! বাজে চালাকি ছেড়ে দিয়ে ভালো করে শোনো! আমি কি বলবার জন্যে আজ তোমার সঙ্গে দেখা করলুম, জানো? আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, হাজার বার মাথা খুঁড়লেও কাল থেকে বেশ-কিছুকালের জন্যে আর তুমি আমার দেখা পাবে না! সুতরাং আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধু অরুণের জীবনকে আর যেন ভারবহ করে তুলো না!'

প্রশান্ত বিস্মিত ভাবে বললে, 'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না!'

—'আমি বলতে চাই, অরুণের বাড়ির ওপরে প্রাণপণে পাহারা দিলেও আর কেউ আমাকে এখানে আবিষ্কার করতে পারবে না!'

—'কেন?'

—'আমি যাব এখন অজ্ঞাতবাসে।'

—'তাহলে আপনি আর কলকাতায় থাকবেন না?'

—'কলকাতায় থাকব না, বাংলাদেশে থাকব না, হয়তো ভারতবর্ষেও থাকব না! বর্তমান জীবন আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে—আমার কাছে একঘেয়েমি হচ্ছে বিষের মতো! আমি চাই নিত্য নব উত্তেজনা, নিত্য নব বিপদের বৈচিত্র্য, নিত্য নব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত! কালকেই আমি যাত্রা করব সেই অজানার সন্ধানে! সুতরাং আমাকে ধরবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করে তুমি আর পণ্ডশ্রম কোরো না!'

প্রশান্ত বললে, 'কিন্তু আজ যদি আপনাকে ধরবার চেষ্টা করি?'

—'পারবে না। তুমি নিরস্ত্র, আমি সশস্ত্র। গায়ের জোরেও তুমি আমার কাছে শিশুর মতো। তুমি বাইরের লালপাগড়িদের সাহায্য পাবে বলে মনে করছ? কিন্তু সে আশা ছেড়ে দাও—কারণ, ওই শোনো আমার মোটরের গর্জন।'

শোনা গেল, একখানা মোটর সশব্দে ক্রমে অরুণের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বরুণ বললে, 'নমস্কার প্রশান্তবাবু! আসি ভাই অরুণ! আবার কবে কলকাতায় আসব আমি নিজেই তা জানি না! বিদায়!' হঠাৎ সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই অরুণ ও প্রশান্ত শুনলে, বাড়ির সুমুখে যে মোটরখানা এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানা আবার সশব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল!

অরুণ হেসে উঠল সকৌতুকে।

প্রশান্ত বসে রইল মূক মূর্তির মতন।

সূর্যকরের দ্বীপে

প্রথম

ঘটনাক্ষেত্র

এই নাটকীয় কাহিনীর ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে বোর্নিয়ো দ্বীপ। বাঙালি পাঠকের কাছে বোর্নিয়ো দ্বীপ যথেষ্ট অপরিচিত, সুতরাং গল্প বলবার আগে ঘটনাক্ষেত্রের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

বোর্নিয়ো পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। এর উত্তরে আছে দক্ষিণ চীন-সমুদ্র, পশ্চিমে ও দক্ষিণে আছে কারিমাতা প্রণালী ও জাভা সমুদ্র এবং পূর্বদিকে আছে ম্যাকাসার প্রণালী ও সিলেবিস সমুদ্র। দ্বীপটি আকারে ২,৯০,০০০ বর্গমাইল এবং এর জনসংখ্যা হচ্ছে ২৬,৬০,০০০।

বোর্নিয়ো দ্বীপটি চার ভাগে বিভক্ত (১) ইংরেজ অধিকৃত উত্তর বোর্নিয়ো; (২) ব্রুনি-স্ট্রেট সেটেলমেন্টের অধীনস্থ একটি মুসলমান রাজ্য; (৩) সারাওয়াক—এখন ইংরেজদের অধীনস্থ রাজ্য, কিন্তু ঘটনার সময়ে তার সামন্ত বা করদ রাজা ছিলেন একজন ইংরেজ; এবং (৪) ওলন্দাজদের অধিকৃত বোর্নিয়ো। ওলন্দাজদের বোর্নিয়ো আবার দুইভাগে বিভক্ত (১) পশ্চিম বোর্নিয়ো, এর জনসংখ্যা ৬,৮৫,৫৪৫; এবং (২) দক্ষিণ ও পূর্ব বোর্নিয়ো, জনসংখ্যা ১০,৯১,৩৪১।

বোর্নিয়োর বাসিন্দাদের ভিতরে প্রধান হচ্ছে ডায়াক জাতি, এবং তাদের ভিতরেও নানা বিভাগ আছে। চীনদেশের অনেক লোকও এখানে ব্যবসা ও বাণিজ্য সূত্রে বসবাস করে। নদীর ধারে ধারে বাস করে মালয়জাতীয় লোকেরাও।

এই বিংশ শতাব্দীতেও বোর্নিয়ো দ্বীপকে রহস্যময় বলে বিবেচনা করা হয়। উপরে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য যে রাজত্বের কথা বলা হল, ওদের প্রত্যেকটি বোর্নিয়ো দ্বীপের এক-এক প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু দ্বীপের মধ্যভাগের কথা আজও ভালো করে জানা যায়নি। সেখানকার বাসিন্দারা প্রায়-অসভ্য। তাদের প্রকৃতি হচ্ছে অত্যন্ত বন্য ও হিংস্র। তাদের অনেকে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং তাদের অনেকে আবার নরমাংস ভক্ষণ না করলেও শিকার করতে ভালোবাসে নরমুণ্ড।

দ্বীপের মধ্যভাগ গহন অরণ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেসব গভীর বনের মধ্যে পাওয়া যায় গাটাপার্চা, রবার, নারিকেল, সাগু, র‍্যাটান-বেতের ও মূল্যবান লোহাকাঠের গাছ। কয়লা, সোনা, হিরা, তামা, লোহা, টিন ও পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির খনির জন্য বোর্নিওর বিশেষ খ্যাতি আছে। কেবল বড়ো বড়ো অরণ্যই নয়, বোর্নিও দ্বীপে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বতও দেখা যায় নানাস্থানে।

বোর্নিওর আদিম বাসিন্দাদের কথা খুব অল্পই জানা গিয়েছে। অনেক শতাব্দী আগে মালয়-জাতীয় লোকদের আক্রমণে তারা দ্বীপের মধ্যভাগে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই আদিম বাসিন্দাদের নানান জাতি এখন ক্লেমান্তান, মুরুত, কেয়ান, কেনিয়া ও পুনান প্রভৃতি নামে পরিচিত। তাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে 'ব্লো-পাইপ' (তার কথা পরে বলব), এবং তারা দিন কাটায় শিকার ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই।

বনের ভিতরে কেয়ান-জাতীয় লোকেরা যেসব বাড়িতে বাস করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব আছে। সেগুলি 'লম্বাবাড়ি' বলে ডাকা হয়। এক-একখানি লম্বা-বাড়িকে এক-একখানি গ্রাম বললেও অত্যুক্তি হবে না। কোনও-কোনও লম্বাবাড়ি দৈর্ঘে প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত! বন্য শত্রুদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এই বাড়ির ঘরগুলি থাকে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। বাড়ির একদিকে থাকে একটানা সুপ্রশস্ত দালান। সেই দালানের সামনেই থাকে পাশাপাশি ঘরের পর ঘর এবং প্রত্যেক ঘরে থাকে এক-একটি পরিবার। কোনও-কোনও বাড়ীতে পাঁচ-ছয় শত লোক পর্যন্ত বাস করতে দেখা গিয়েছে। দালানটিকে একাধারে বৈঠকখানা ও গ্রামের পথ বলেও গণ্য করা যায়।

অসভ্যদের সঙ্গে বোর্নিওর পাহাড়ে ও জঙ্গলে বাস করে ব্যাঘ্র, বন্যমহিষ, বন্যবরাহ, অজগর ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু। তার গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে ছোটোবড়ো নানা জাতের বানর। তার নদীতে নদীতে সাঁতার কেটে বেড়ায় মস্ত মস্ত কুমির। এ-ছাড়াও বোর্নিওর মধ্যে এমন আর-একটি বিশেষ জীব বাস করে যা সুমাত্রা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই জীবটির পরিচয় গল্পের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

একটু আগে ব্লো-পাইপ নামে যে অস্ত্রটির কথা উল্লেখ করেছি এইবারে তার সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার।

প্রথম-দৃষ্টিতে ব্লো-পাইপকে সাধারণ বর্শা-দণ্ড বলে ভ্রম হয়। ব্লো-পাইপের একদিকে বর্শার ফলক থাকে বটে, কিন্তু দণ্ডটির ভিতরটা একেবারে ফাঁপা। শিকারীরা এই ফাঁপা বর্শা-দণ্ডের ভিতরে সাগু-গাছের শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটি শলাকা ঢুকিয়ে কোনও জন্তুকে লক্ষ্য করে বর্শা-দণ্ডের এক প্রান্তে মুখ রেখে জোরে ফুঁ দেয় এবং শলাকাটি তৎক্ষণাৎ বেগে বেরিয়ে গিয়ে সেই জন্তুটির দেহ বিদ্ধ করে। শলাকার উপরে মাখানো থাকে অতি-বিষাক্ত ইপো-গাছের রস, সুতরাং শলাকার দ্বারা বিদ্ধ হলে জন্তুটি অবিলম্বে মারা পড়ে। ফুঁয়ের জোরে শলাকাটি ৭০ গজ দূর পর্যন্ত ছুটে যেতে পারে। বোর্নিওর লোকেরা এই ব্লো-পাইপকে সুম্পিতান বলে ডাকে। কেবল বোর্নিও দ্বীপে নয়, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের লালমানুষরাও ব্লো-পাইপের মতন অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

বোর্নিওর বাসিন্দারা এই সুম্পিতান ছাড়া প্যারাং ও ক্রিশ নামে বড়ো ও ছোটো জাতের ছুরিও ব্যবহার করে থাকে। নেপালিরা যেমন কুকরির ও শিখেরা যেমন কৃপাণের ভক্ত, বোর্নিওর বাসিন্দারাও তেমনি ক্রিশ ছুরিকে যারপরনাই ভালোবাসে। এই ক্রিশ সর্বদাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কারণ সেখানে ক্রিশ হারালে সম্মানকেও হারাতে হয়। বোর্নিওর প্রবাদ বলে, টাকা দিয়ে সব কেনা যায়, কেনা যায়না খালি ক্রিশ।

বোর্নিওর আর একটি নাম হচ্ছে 'সূর্যকরের দ্বীপ'। কারণ এই স্বাস্থ্যকর দ্বীপটি যেন চিরনিদাঘের স্বদেশ। এখানে শীত-কুয়াশার অত্যাচার নেই বললেও চলে, তাই তার উপরে ঝলমল করে অম্লান সূর্যের পরিপূর্ণ কিরণ।

দ্বিতীয়

পলাতকের দল

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র পৃথিবীর দিকে দিকে। এবং রহস্যময় বোর্নিও হয়ে উঠেছে রীতিমতো ভয়াবহ!

তার আকাশ সমাচ্ছন্ন করে দলে দলে উড়ছে জাপানের বোমারু বিমান এবং তার সমুদ্রে সমুদ্রে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে জাপানের অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ। বোর্নিওর নগরের পর নগরের উপর একসঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে বিমান ও জাহাজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা, কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলি। বোর্নিওর চতুর্দিক হয়ে উঠেছে শব্দময়, ধূম্রময় ও অগ্নিময়। শহরে শহরে মৃত্যুর তাণ্ডবনৃত্য, যেদিকে তাকানো যায় দেখা যায় রক্তের নদী এবং শোনা যায় ভীত ও আহতদের নিদারুণ ক্রন্দনধ্বনি! বোর্নিওর বুকের উপরে এসে লেগেছে প্রলয়ের বিষাক্ত নিঃশ্বাস!

ইংরেজ ও ওলন্দাজরা যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। শত্রুরা অস্ত্রে ও সংখ্যায় ঢের বেশি বলবান। দেখতে দেখতে জাপানি সৈনিকরা পঙ্গপালের মতন বোর্নিওর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নীরব হল ইংরেজ ও ওলন্দাজদের আগ্নেয়অস্ত্রগুলো।

বাসিন্দারা ধন, মান ও প্রাণ রক্ষার জন্যে শহর ছেড়ে দূর গ্রামে গ্রামে পালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু গ্রামে গিয়েও তারা নিস্তার পেলে না, কারণ জাপানিবাহিনীও ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ব্লটিংয়ের উপরে কালির ফোঁটার মতন। তখন গ্রাম ছেড়ে অনেকে ঢুকল গিয়ে দুর্গম অরণ্যের ভিতরে। যাদের সে-সাহস হল না, তারা নাচার হয়ে আত্মদান করলে শত্রুদের কবলে।

এইরকম একটি পলাতকের দল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এই দলের ভিতরে ছিল নানা জাতের লোক—তাদের কেউ চীন, কেউ ভারতবর্ষ ও কেউবা মালয় দেশের বাসিন্দা। তাদের ভিতরে কেবল পুরুষ নয়, নারী ও শিশুর সংখ্যাও ছিল অনেক। তাদের অনেকের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে, অনেকে পালাবার সময় চোখের সামনে যা পেয়েছে মোটমাট বেঁধে কাঁধের উপরে বহন করে চলেছে। অনেকে পুত্র বা স্বামী বা ভাই বা অন্য-কোনো আত্মীয়কে হারিয়ে শোকে অশ্রুত্যাগ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। দলের ভিতরে রয়েছে প্রায় দুইশত প্রাণী, কিন্তু কারুর মুখে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সকলেরই মুখে-চোখে আতঙ্ক ও হতাশার চিহ্ন, দেহে শ্রান্তির লক্ষণ। তারা পথ চলেছে ঠিক প্রাণহীন কলের পুতুলের মতন।

এই বৃহৎ দলটিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে যে ব্যক্তি তাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের লোক। তার হাবভাব ও হুকুম দেবার ভঙ্গি দেখলেই আন্দাজ করা যায়, সে বহুলোকের উপরে কতৃত্ব করতে অভ্যস্ত। সকলে তাকে সসম্ভ্রমে 'তুয়ান', বলে সম্বোধন করছে। এদেশি-ভাষায় 'তুয়ান' বলতে বোঝায় 'স্যার' বা 'মহাশয়'।

জাপানিদের অস্ত্রকে ফাঁকি দিয়েও অরণ্যের নানান বিপদকে তারা এড়াতে পারছে না। কেবল পথশ্রমেই তাদের দেহ অবসন্ন নয়, খাদ্যাভাবের জন্যেও তাদের কষ্ট পেতে

হচ্ছে যথেষ্ট। সারাদিনে তারা মাইলের পর মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এর মধ্যে দেখতে পায়নি একখানি মাত্র গ্রামও।

কেবল জঙ্গলের পর জঙ্গল। একটা জঙ্গল শেষ হতে না হতেই আবার নূতন জঙ্গল আরম্ভ হয়—সেই বিশাল অরণ্যপ্রদেশের ভীষণতা ও নিবিড়তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। শূন্য দিয়ে জাপানি বিমান উড়ে যাচ্ছে, তাদের বুক-চমকানো গর্জন শুনতে পাচ্ছে সকলেই, কিন্তু উপর থেকে বিমানচালক পলাতকদের একজনকেও দেখতে পাচ্ছে না। নিচের দিকে নানা জাতের ঘন লতার জালে সমাচ্ছন্ন হয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতিরা আকাশকে ধরবার জন্যে যে একশো-দেড়শো ফুট উপরে উঠে গিয়েছে এবং তাদের ঘন ডালপালার আবরণ সূর্যালোকের পথ প্রায় বন্ধ করে রেখেছে। আকাশে নীলিমাও চোখে পড়ে কদাচ। গাছের শাখায় শাখায় ঝুলছে বা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে হরেক-রকমের অগুন্তি বানর। অরণ্যের ভিতর অকস্মাৎ এই অভাবিত জনতার আবির্ভাব দেখে বানরেরা সচকিত হয়ে উঠেছে বিপুল বিস্ময়ে! ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করে ও নিজেদের ভাষায় মানুষদের গালাগালি দিতে দিতে তারা আরো উপর-ডালে গিয়ে উঠে বসছে।

অরণ্যের ভিতরে সর্বদাই বিরাজ করছে যেন সন্ধ্যার আলো-আঁধারি এবং স্থানে-স্থানে জমাট বেঁধে আছে যেন অন্ধ রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার। সেখানে মানুষের চোখ চলে না, কিন্তু থেকে থেকে জ্বলে উঠেই নিবে যায় কাদের হিংস্র, ক্ষুধিত ও অমানুষিক দৃষ্টি। মাঝে মাঝে হঠাৎ শোনা যায় কোনও পশুর ভীষণ গর্জন। এবং সেইসঙ্গে মানুষের করুণ আর্তনাদ! তারপরই জনতার বহু কণ্ঠে জাগে ত্রস্ত কোলাহল এবং প্রকাশ পায় পলাতকদের দল থেকে অদৃশ্য হয়েছে কোন হতভাগ্য মানুষ।

স্থানে স্থানে বৃহৎ প্যারাং অস্ত্রের সাহায্যে জঙ্গলের ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা কেটে না নিলে আর অগ্রসর হবার উপায় থাকে না। স্থানে-স্থানে জঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে খানিকটা খোলা জায়গা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে চোখের সামনে দেখা দেয় কোনও বেগবতী নদী। সেখান থেকে ফেরবার বা সেখানে বসে বিশ্রাম করবার কোনও উপায়ই নেই, কারণ রাত্রি আসবার আগেই একটা লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা।

সকলেই যখন হতাশ হয়ে পড়ে, দলের ভারতীয় নেতা তখনও হাল ছাড়ে না। সকলকে উৎসাহ দিয়ে সে হাসিমুখেই বলে, 'কোনও ভয় নেই! প্যারাং চালিয়ে বাঁশঝাড় কাটো! তারপর র‍্যাটান-লতা কেটে নিয়ে তাই দিয়ে বাঁশগুলোকে বেঁধে ভেলা তৈরি করে নাও! আমরা সেই ভেলায় চেপে নদী পার হয়ে যাব। দেরি কোরো না, পিছনে তাকিও না—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। আমাদের বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া।'

মালয় দ্বীপের লোকদের প্যারাং চালাবার দক্ষতা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তিন-চারটে ভেলা তৈরি করে ফেলে এবং তারই উপরে চেপে তারা সবাই নদীর অন্য তীরে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু মৃত্যু এখানেও তাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। জলের ভিতর থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে একাধিক কুমিরের

বীভৎস মুখ। আচম্বিতে তাদের বিপুল লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং পরমুহূর্তেই দেখা যায়, ভেলার প্রান্ত থেকে দুই বা তিনজন লোক ঠিকরে জলের ভিতরে গিয়ে পড়ল! যারা জলে পড়ে তারা আর উপরে ওঠে না।

নদীর ওপারে সকলকে গ্রাস করবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে আবার এক নিবিড় বন। নিজেদের হতভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে আবার সেই অরণ্যের গর্ভে প্রবেশ করে ক্লান্ত পথিকরা।

বাইরে তখন দিনের আলো নিবু-নিবু এবং অরণ্যের ভিতরে নেমে এসেছে যেন দৃষ্টিহীন নিশীথ রাত্রি। সেখানে পাখিদের সন্ধ্যাসঙ্গীত নেই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বেশি করে জেগে উঠছে ঝিল্লী-ঝঙ্কারের সঙ্গে যেন অসংখ্য অজানা বিভীষিকার কণ্ঠস্বর! দিনের বেলাতেও যা প্রায় অসম্ভব, রাতের অন্ধকারে পথিকরা কেমন করে এই অরণ্যের প্রাচীর ঠেলে অগ্রসর হবে? এইবারে যে সেই দলের সর্দারের স্থান গ্রহণ করেছিল সেই ভারতবাসীও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন হয়ে পড়ল।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছে অতঃপর কি করা উচিত, তখন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মতন হঠাৎ টর্চের একটা তীব্র আলো জ্বলে উঠে তার মুখের উপরে এসে পড়ল। আলোকশিখার তীব্রতায় দলপতির দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে গেল।

আলোটা প্রায় আধ মিনিট কাল দলপতির মুখের উপরে স্থির হয়ে রইল, তারপর সেটা ফিরে জনতার চারিদিকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে দপ করে আবার নিবে গেল।

চারিদিকে আবার অন্ধকারের পালা। ইতিমধ্যে দলপতি পকেটের মধ্য থেকে নিজের রিভলবার বার করে নিয়ে ভাবছে, এই বিজন গহন বনের ভিতরে টর্চ জ্বাললে কে! একি জাপানিদের চর, না নূতন কোনও শত্রু?

অন্ধকারের ভিতর থেকে ইংরেজিতে প্রশ্ন হল, 'কে আপনি?'

দলপতি উত্তর দিলে, 'আমি ভারতের সন্তান। জাতে বাঙালি।'

—'আপনি যে বাঙালি সেটা দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এমন অসময়ে এত লোক নিয়ে আপনি এই মারাত্মক বনের ভিতরে কেন?'

দলপতি বললে, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি কে?'

—'আমার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন যে, আমি আপনাদের শত্রু নই। এখন বলুন দেখি, এই বনের ভিতরে এত লোক নিয়ে কেন এসেছেন?'

—'আমরা জাপানিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে চাই না। তাই আমরা পালিয়ে যাচ্ছি।'

—'পালিয়ে যাবেন কোথায়?'

—'বনের ভিতরে নূতন কোনও আশ্রয়ের সন্ধানে।'

অন্ধকারের ভিতরে জেগে উঠল হা হা করে উচ্চ হাসির ধ্বনি। তারপর আবার শোনা গেল, 'বোর্নিওর বনে এসেছেন আশ্রয়ের সন্ধানে? আপনি কি জানেন না বাঘ-

হাতি গণ্ডারেরও চেয়ে ভীষণ জীব বাস করে এই বনের যেখানে-সেখানে? জাপানিদেরও চেয়ে তারা বেশি নিষ্ঠুর, বেশি সাংঘাতিক?

দলপতি বললে, 'আপনি কাদের কথা বলছেন? বোর্নিওর অসভ্যদের কথা?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যারা নরমাংস খায় আর যারা নৃমুণ্ড শিকার করে! ভিন্ন জাতের মানুষদের তারা মানুষ বলেই মনে করে না।'

দলপতি বললে, 'অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতন অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে আছে। প্রবল জাপানিদের আমরা বাধা দিতে পারব না বটে, কিন্তু এরকম সাধারণ শত্রুদের আমরা ভয় করি না।'

কণ্ঠস্বর আবার হেসে উঠে বললে, 'ভুল মশাই, ভুল। এই অরণ্যরাজ্যে খোঁজ নিলে অসাধারণ শত্রুরও অভাব বোধ করবেন না। তাকে দেখতে পাবার আগে সেইই আপনাকে আক্রমণ করতে পারে!'

দলপতি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, 'আপনি আশ্চর্য কথা বলছেন! এমন কোনও অসাধারণ শত্রুকে তো আমি জানি না!'

—'জানেন মশাই, জানেন! সে শত্রু আপনার অপরিচিত নয়।'

দলপতি সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, 'আপনি কার কথা বলছেন?'

—'সেকথা এখন শুনে কাজ নেই। আপনার নাম জানতে পারি কি?'

—'আমার নাম প্রশান্ত চৌধুরী। আপনার নাম কি? আপনি এই বনের ভিতরে কি করছেন?'

—'আমার নাম জেনে লাভ নেই। তবে এই বনের ভিতরে আমি কি করছি, তা বলতে পারি। আমি এই বনে বনে ঘুরে বেড়াই বিপন্নদের সাহায্য করবার জন্যে।'

—'তার মানে?'

—'জাপানি দস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আজ শহর ছেড়ে যারা বনবাসী হচ্ছে, আমি তাদের আশ্রয় দেবার চেষ্টা করি।'

—'কেমন করে আপনি তাদের আশ্রয় দেন?'

—'এখান থেকে খুব কাছেই আমার অসভ্য বন্ধুদের গ্রাম আছে। যেসব বিপন্ন পথ হারিয়ে বনে বনে আশ্রয়ের সন্ধান করে, আমি তাদের নিয়ে সেই অসভ্য বন্ধুদের কাছে যাই।'

—'এইযে বললেন, এখানকার অসভ্যেরা মানুষের মাংস খায়, নৃমুণ্ড শিকার করে?'

—'সব অসভ্যই একজাতের নয়। আমার অসভ্য বন্ধুরা শহুরে সভ্যদেরও চেয়ে ভালোমানুষ। আমি তাদের ভালোবাসি, তাদের নানা দিক দিয়ে সাহায্য করি, তাই তারাও মনে করে আমাকে আত্মীয়ের মতন। আপনাদেরও আমি তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারি। রাজি আছেন!'

প্রশান্ত মনে মনে ভাবতে লাগল : 'কে এই লোক? এর শুদ্ধ ইংরেজি কথা ও মার্জিত কণ্ঠস্বর শুনলে একে বিশেষ ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। এ নিজের পরিচয় দিলে না বটে, কিন্তু আপাতত একে অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই। এই

ভীষণ বনে রাত কাটাতে গেলে বুনো জানোয়ারের কবলে পড়ে বা দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়েই অনেকে মারা পড়তে পারে। তার উপরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার অত্যাচারও আছে।'

এই রকম ভেবে-চিন্তে প্রশান্ত বললে, 'আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি।'

কণ্ঠস্বর বললে, 'তাহলে এইখানে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমার বন্ধুদের খবর দিয়ে আসছি। তারা সকলকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে।'

অন্ধকারে শুকনো পাতার উপরে পদশব্দ তুলে যে কথা কইছিল সে ক্রমেই দূরে চলে গেল। প্রশান্ত আবার অবাক হয়ে ভাবতে লাগল : 'কে এই রহস্যময় ব্যক্তি? যে অসাধারণ শত্রুর ভয় দেখালে, এ নিজেই সেই লোক নয় তো? এ নিজের নামও বললে না, নিজের চেহারাও দেখালে না, অথচ টর্চের আলো ফেলে আমাকে বেশ ভালো করেই দেখে নিলে বলে বোধ হল! এর এতটা লুকোচুরির কারণ কি? আমার বড়োই সন্দেহ হচ্ছে, এর কাছে আশ্রয় চেয়ে ভালো করলুম কিনা কে জানে?'

প্রশান্ত যখন এইসব কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচড়া করছে, আচম্বিতে দূরের বন যেন জাগ্রত হয়ে উঠল!

তৃতীয়

অদ্ভুত শত্রু

প্রশান্ত দূরে তাকিয়ে দেখলে বনের একটা অংশ একেবারে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বড়ো বড়ো গাছ ও ঝোপঝাপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে লোকের পর লোক—তাদের অনেকেরই হাতে হাতে জ্বলছে মশালের আলো।

যখন তারা আরও কাছে এগিয়ে এল তখন দেখা গেল, তাদের অনেকেরই হাতে মানুষের মুখের নক্সাকাটা লম্বা লম্বা কাঠের ঢাল এবং কোমরে সংলগ্ন ঝালর-ঝোলানো তরবারি।

প্রশান্তের সঙ্গে একজন মালয়দেশীয় দোভাষী ছিল—সে বোর্নিওর অধিকাংশ জাতিরই ভাষা জানত এবং তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও তার অভিজ্ঞতা বড়ো কম ছিল না। সে তাড়াতাড়ি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'যারা আসছে, ওরা কে বলতে পারো।'

দোভাষী বললে, 'পারি তুয়ান। ওরা হচ্ছে কেয়ান জাতের লোক। ওরা লড়াই করতে ভারি ভালোবাসে। ওদের ওই কাঠের ঢালে কালো কালো কি ঝুলছে দেখেছেন?'

প্রশান্ত বললে, 'দেখছি তো। কী ওগুলো?'

—'মানুষের মাথার চুল। ওরা যেসব শত্রু হত্যা করে, তাদের মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে নিয়ে নিজের নিজের ঢাল সাজায়।'

প্রশান্ত বিলক্ষণ দমে গিয়ে বললে, 'তাহলে এই কেয়ানরাও মানুষের মুণ্ড শিকার করে?'

দোভাষী বললে, 'এক-সময় ছিল যখন প্রত্যেক কেয়ানই নরমুণ্ড শিকার করত। এখন সে প্রথা ততটা প্রবল নেই বটে, কিন্তু এখনও ওদের অনেকেই সুযোগ পেলেই নরমুণ্ড শিকার করতে ভোলে না। এরকম শিকারের ফাঁক পেলে ওরা যে সবসময়ে বীরত্বের পরিচয় দেয়, তাও নয়। হয়তো হঠাৎ ওরা আবিষ্কার করলে আপনি স্থানে-অস্থানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখনই খাপ থেকে নির্গত হল ওদের তরবারি, আর আপনার মুণ্ডটি গেল উড়ে। আপনার ধড় রইল সেইখানে পড়ে, আর বিজয়-গর্বিত বীরের মতন নাচতে নাচতে আপনার মুণ্ডটি নিয়ে শিকারী চলে গেল ঘরে ফিরে।'

প্রশান্তের বুকটা ধড়াস করে উঠল। আর কোনও কথা বলবার আগেই সে দেখলে কেয়ানদের একজন লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকলে। তখন দোভাষীর সাহায্যে তার সঙ্গে কথাবার্তা চলল।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে?'

সে বললে, 'আমি তুয়ান গজের ভৃত্য।'

—'তুয়ান গজ আবার কে?'

সে বললে, 'তুয়ান গজ এই বনরাজ্যের রাজা। তাঁর মতন শক্তিশালী এখানে কেউ নেই। কেবল বর্শা হাতে নিয়ে তিনি একটা বৃহৎ হস্তী বধ করেছিলেন, তাই সবাই তাঁকে তুয়ান গজ বলে ডাকে।'

—'আমার কাছে তোমাদের কি দরকার?'

—'তুয়ান গজ হুকুম দিয়েছেন, আপনাদের গ্রামের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে। আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

প্রশান্ত সন্দিগ্ধ চোখে লোকটার ঢালে সংলগ্ন মানুষের চুলের গোছার দিকে তাকিয়ে শুকনো স্বরে বললে, 'আমরা যদি তোমার সঙ্গে না যাই?'

লোকটি আবার সেলাম করে বললে, 'তুয়ান গজের আদেশ হচ্ছে ঈশ্বরের আদেশের মতন। আপনারা না গেলে সকলকে আমরা জোর করে ধরে নিয়ে যাব।'

প্রশান্ত মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে, ইতিমধ্যেই বনের ভিতরটা কেয়ানযোদ্ধাদের দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে—সংখ্যায় তারা কয়েক শতের কম হবে না। সে বুঝলে, দূরে থাকলে তাদের সঙ্গে যে আট-দশটা বন্দুক আছে, তারই সাহায্যে এই তরবারিধারী বন্য যোদ্ধাদের বাধা দেওয়া বা ভয় দেখানো চলত। কিন্তু এখানে এদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। নাচার ভাবে সে বললে, 'বেশ, তোমাদের তুয়ান গজের কাছেই আমাদের নিয়ে চলো।'

যে লোকটা এতক্ষণ প্রশান্তের সঙ্গে কথা কইছিল, সে ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের লোকদের কি ইসারা করলে, অমনি বনের ভিতর থেকে মস্ত একটা জয়ঢাক বেজে উঠল। ঢাকটা বার-তিনেক বেজেই আবার নীরব হল। তার মিনিটখানেক পরেই বহু দূর থেকে নৈশ-স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভেসে এল, আর একটা ঢাকের আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড পরে সে ঢাকটাও বোবা হয়ে গেল।

প্রশান্ত আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এ আবার কি ব্যাপার?'

লোকটা বললে, 'ঢাক বাজিয়ে তুয়ান গজকে জানিয়ে দিলুম আপনারা যাচ্ছেন, আপনাদের অভ্যর্থনার জন্যে একখানা 'লম্বা-বাড়ি' প্রস্তুত রাখতে। গ্রামের ঢাক জবাবে বললে, আপনাদের জন্যে সব প্রস্তুত। আসুন তুয়ান, আমাদের পিছনে পিছনে এই পথে আসুন।'

আবার যাত্রা শুরু। আগে আগে চলল কেয়ানযোদ্ধার দল, তাদের পিছনে পিছনে প্রশান্ত ও তার সঙ্গীরা। এ বনের ভিতর দিয়ে যে কোনও নির্দিষ্ট পথ আছে, প্রশান্ত এতক্ষণ সেটা আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে কখনও ডাইনে ও কখনও বাঁয়ে মোড় ফিরে কেয়ানরা যে একটা সুপরিচিত নির্দিষ্ট পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছে, সেটা বোঝা গেল বেশ ভালো করেই। তারা হচ্ছে এই বনরাজ্যের প্রজা, দুর্গম অরণ্যের প্রত্যেক রহস্য আছে তাদের নখদর্পণে।

ভেড়ার দল যেমন আশেপাশে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে অগ্রবর্তী একমাত্র নেতার দিকে দৃষ্টি রেখেই অগ্রসর হয়, প্রশান্ত এবং তার দলবলও ঠিক সেই ভাবেই সামনের জ্বলন্ত মশালগুলোর দিকেই লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। মশালগুলোর আলো সামনে ওদিককার বন-জঙ্গলকে সমুজ্জ্বল করে তুললেও ভালো করে তাদের কাছে এসে পড়ছিল না, তাদের দু-পাশের বন আধা-আলোয় ও আধা-ছায়ায় হয়ে উঠেছিল আরও বেশি রহস্যময়। মাঝে মাঝে মশালগুলো মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের এদিকটা হয়ে যাচ্ছিল প্রায় অন্ধকার।

ঠিক এমনি একটা মোড়ের উপরে এসে প্রশান্ত যেই ডানদিকে বেঁকেছে, অমনি তার পাশের একটা বড়ো ঝোপ হঠাৎ সশব্দে দুলে উঠল। বিদ্যুতের মতন তার সামনে জেগে উঠল যেন অসম্ভব এক দুঃস্বপ্ন—দুটো প্রজ্বলিত বিস্ফারিত চক্ষু এবং ঝকমকে শুভ্র করাল দন্তের সারি! পরমুহূর্তে তাকে ছোবল মারলে যেন একটা কালো অজগর সাপ—সে নিজের কণ্ঠের চারিপাশে অনুভব করলে ভীষণ এক শ্বাসরুদ্ধকর লৌহমুষ্টির চাপ! সে একবারও আর্তনাদ করবার অবকাশ পেলে না, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে কেবল এইটুকুই বুঝতে পারলে যে, আক্রমণকারী অত্যন্ত অনায়াসেই তাকে শূন্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

এই অদ্ভুত কাণ্ডটা এত সহজে ও এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল যে, প্রশান্তের পশ্চাদবর্তী সঙ্গীরা কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না।

কিন্তু তুয়ান গজের প্রধান অনুচর প্রশান্তের ঠিক আগে-আগেই অগ্রসর হচ্ছিল। সে হচ্ছে বনবাসী মানুষ, তার অনুভূতি ও শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে তখনই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একবার ঝোপটার দিকে তাকালে, তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখলে সেখান থেকে প্রশান্ত অদৃশ্য হয়েছে।

সে নিজের ভাষায় চিৎকার করে কি বললে, অমনি অগ্রবর্তী কেয়ানযোদ্ধারা সবাই ফিরে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল। তারপর তারা খাপ থেকে তরবারি খুলে দলে দলে পাশের জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগল।

অনুচর আবার চিৎকার করে আদেশ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাকের উপরে আবার পড়তে লাগল ঢুলির কাঠি।

তৎক্ষণাৎ দূর বনের ভিতর থেকে জবাব দিতে লাগল আর একটা সংবাদবাহী দামামা!

চতুর্থ

তুয়ান গজ

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান হল প্রশান্ত তা জানে না।

আসল ঘটনা যে কি ঘটেছে প্রশান্ত প্রথমটা সেটাও আন্দাজ করতে পারলে না। কেবল এইটুকু অনুভব করলে, তার কণ্ঠদেশে ও অঙ্গের নানা স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে। তখনই ধাঁ করে তার মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল সেই বিষম দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিত। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই কে তাকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মারলে এক জোর ধাক্কা। মাটির উপরে আছড়ে পড়ে যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল!

প্রশান্ত আর ওঠবার চেষ্টা করলে না। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, সে কোন শত্রুর কবলে এসে পড়েছে?

কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। তার চারিদিকে—উপরে নিচে ডাইনে বামে থমথম করছে কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার। সে নিজের দেহের তলায় কেবল অনুভব করলে, ঠাণ্ডা মাটির তৃণশয্যা। তার হাত পাঁচ-ছয় উপরে তিন-চারটে জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে। জোনাকিদের তুচ্ছ আলোর আভাস দেখেই বোঝা যায়, উপর দিকে রয়েছে একটা ঝুপসি ঝোপ।

কে এই মহাবলবান, নীরব, অজ্ঞাত শত্রু? তাকে নিয়ে সে কী করতে চায়? সে যে বাঘ-ভাল্লুকের মতন কোনও চতুষ্পদ জীব নয় এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। কারণ, যে হাত প্রশান্তর গলা টিপে ধরেছিল, তা মানুষেরই বাহু!

এইসব ভাবতে ভাবতে সে আর একটা সত্যও আবিষ্কার করলে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে বেজে বেজে উঠছে দামামার পর দামামা! দামামার মহা নাদে অন্ধ রাত্রির সমস্ত স্তব্ধতা জাগ্রত হয়ে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে! উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে প্রশান্ত এটাও বুঝতে পারলে যে, দামামাগুলোর একতান চতুর্দিক থেকে যেন মণ্ডলাকারেই এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে।

সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে আরও একটা শব্দ—মাটির উপরে তালে তালে পড়ছে যেন অনেকগুলো পা, দুম-দুম-দুম, দুম-দুম-দুম, দুম-দুম-দুম, এবং পৃথিবীর বুক করছে থর-থর-থর, থর-থর-থর, থর-থর-থর!

তারপরেই দেখা গেল বহুদূরে অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে চঞ্চল আলোকের খেলা! আলোগুলোও আসছে ক্রমে এগিয়ে।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে আড়ষ্ট ও অভিভূত হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল

প্রশান্ত। তার মুখের উপর এসে পড়ল একটা দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত ও প্রবল নিঃশ্বাস! এই বন্য নিঃশ্বাসের ভিতরে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কেমন একটা নিষ্ঠুর হিংসার ভাব, তার সঙ্গে নাগরিক জীবনের কোনও সম্পর্কই নেই।

আচম্বিতে ঝোপটা যেন দুলে দুলে উঠল, এবং তার পরমুহূর্তেই ক্ষুরধার আলোক-বর্শার মতন একটা টর্চের তীক্ষ্ণ আলোকশিখা সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক ছিন্নভিন্ন করে দিলে, শোনা গেল একটা বীভৎস গর্জন, তারপরেই একটা বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দ, তারপরে একটা পাশবিক আর্তনাদ এবং তারপরেই পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে একটা লম্ফত্যাগের ধ্বনি! প্রশান্তের মনে হল অদূরে যেন একটা মত্ত হস্তী লাফিয়ে পড়ল! কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে সে ভয়ে আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে রইল।

টর্চের শিখাটা একটু এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করে প্রশান্তের মুখের উপর নেমে এসে স্থির হল। তারপর ইংরেজিতে কথা শোনা গেল—'প্রশান্তবাবু, ধরণীশয্যা ত্যাগ করুন—আর কোনও ভয় নেই।' বনের ভিতরে একটু আগে অন্ধকারে প্রশান্ত যার সঙ্গে কথা কইছিল, এর কণ্ঠস্বর তারই মতন। পাছে ঝোপের ভিতর থেকে শত্রু আবার তাকে ধাক্কা মারে, সেই ভয়ে অত্যন্ত জড়সড় ভাবে প্রশান্ত আস্তে আস্তে উঠে বসল।

কিন্তু আর কেউ তাকে ধাক্কা মারলে না। সে তখন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'খানিক আগেও আপনার গলা শুনেছি। কিন্তু আপনি কে তা আমি জানি না, তবু আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

—'আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন?'

—'বোধহয় আপনার দয়াতেই আমি এইমাত্র কোনও দুর্দান্ত শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছি।'

—'এমন ভয়াবহ বন-জঙ্গলে প্রত্যেক মানুষেরই হওয়া উচিত প্রত্যেক মানুষের বন্ধু। এজন্যে ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন।'

—'কিন্তু আমার এই দুর্দান্ত শত্রুটি কে?'

—'যথাসময়ে আপনি নিজেই জানতে পারবেন। আপাতত খালি এইটুকু শুনে রাখুন, কিছুক্ষণ আগে আপনাকে আমি যে শত্রুর সম্বন্ধে সাবধান করেছিলুম, এ হচ্ছে তারই লীলা।'

—'এ কি মানুষ?'

—'না, অমানুষ।'

—'অমানুষ!'

—'প্রশান্তবাবু, অমানুষ আপনি কাকে বলেন? আমি বলি যার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই সেইই হচ্ছে অমানুষ। মানুষের মতন হাত-পা-মুখ থাকলেই কারুকে আমি মানুষ বলি না।'

প্রশান্ত ধীরে ধীরে বললে, 'আপনার কথাগুলো অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। আপনার কথা শুনেও আমার শত্রুর কোনও পরিচয় জানতে পারলুম না।'

—'শত্রু তার নিজের পরিচয় নিজেই দেবে বলে মনে করি। আমার পক্ষে কিছু বলাবাহুল্য মাত্র।'

—'বেশ, শত্রু যেদিন আত্মপরিচয় দেবে, আমি সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু আপনার নিজের পরিচয় না দিন, আপনার নামটাও কি আমাকে বলবেন না?'

—'আমাকে সবাই এখানে তুয়ান গজ বলে ডাকে।'

—'আপনিই তুয়ান গজ?'

—'হ্যাঁ। ইচ্ছা করেন তো এইবারে আমার স্বরূপ দর্শনও করতে পারেন। ওই দেখুন, আমার লোকজনরা আলো নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে।'

দেখতে দেখতে চারিধার বন্য যোদ্ধাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তাদের প্রত্যেকেরই এক হাতে ঢাল আর এক হাতে বর্শা বা তরবারি। যাদের ঢাল নেই তারা বাম হাতে ধারণ করে আছে জ্বলন্ত মশাল।

প্রশান্ত গাত্রোত্থান করে দেখলে, তার সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছে এক কবাটবক্ষ, সিংহকটি, সুদীর্ঘ মূর্তি! তার মাথায় বাহারি পালকবসানো টুপি, কণ্ঠে মালার মতন একটি গহনায় ঝুলছে দুটি গোলাকার সোনার ধুকধুকি, তার কটিদেশে বর্ণ-বিচিত্র কৌপীনের চেয়ে কিছু-বড়ো বস্ত্র। তার দেহের অন্যান্য সব অংশ অনাবৃত। সে এক হাতে ধরে আছে একটি বন্দুক এবং আর এক হাতে একটি বড়ো টর্চ। তার কোমরবন্ধে সংলগ্ন রয়েছে ছোরা, তরবারি ও রিভলবার।

প্রশান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে তুয়ান গজ মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'আমাকে দেখে কি আপনি বিস্মিত হয়েছেন?'

—'তা হয়েছি বইকি!'

—'কেন?'

—'আপনাকে দেখতে তো বোর্নিওর লোকদের মতন নয়!'

—'হ্যাঁ, আমি এখানকার লোকদের চেয়ে মাথায় বেশি উঁচু বটে।'

—'কেবল তাই নয় তুয়ান গজ, বোর্নিওর লোকদের মুখ কতকটা মঙ্গোলীয় আদর্শে গড়া। কিন্তু আপনার মুখে মঙ্গোলীয় ভাবের ছায়াও নেই।'

তুয়ান গজ বললে, 'এজন্যে আশ্চর্য হবার দরকার নেই। প্রাচ্য দেশে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই নানাদেশি আদর্শের মানুষ দেখা যায়। এই আপনাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। পৃথিবীতে বোধহয় এমন জাতের মানুষ নেই, ভারতবর্ষের ভিতরে যার প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। আপনার শত্রুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি, কে বলতে পারে সে আবার নূতন শক্তি সংগ্রহ করে ফিরে আসবে কিনা? সে আবার যদি আক্রমণ করে, হয়তো আমরাও আপনাকে আর রক্ষা করতে পারব না।'

প্রশান্ত বললে, 'বারংবার কাকে আপনি আমার শত্রু বলে উল্লেখ করছেন? এদেশে আমি নতুন এসেছি, এখানে কারুর সঙ্গে আমার বিবাদ নেই, এখানে কে আমার শত্রু থাকতে পারে?'

তুয়ান গজ হেসে বললে, 'এখানে কে যে আপনার শত্রু, তা আপনিও জানেন, আমিও

জানি। সুতরাং ও-বিষয় নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চলুন, আপনাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাই। আপনার সঙ্গীরা এতক্ষণে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে।'

পঞ্চম

লম্বাবাড়িতে

'লম্বাবাড়ি'র কিছু কিছু বর্ণনা গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। নদীর ধারে একখানি ছায়াকোমল তরুশ্যামল গ্রাম। এবং তারই ভিতরে এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে আছে খান-পাঁচেক লম্বাবাড়ি। সেই পাঁচখানি মাত্র লম্বাবাড়ির ভিতরে বাস করে প্রায় দুই হাজার লোক। তুয়ান গজ এইরকমই একখানা বাড়ি প্রশান্ত ও তার সঙ্গীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে।

প্রশান্তের জন্যে যে কামরাখানি নির্দিষ্ট হয়েছিল, আকারে সেখানি মস্ত বড়ো। তার মেঝে ও দেওয়াল বাঁশ দিয়ে তৈরি এবং মেঝের উপরে পাতা আছে ঘাসের ম্যাটিং। ছাদ হচ্ছে পাতা দিয়ে ছাওয়া। ঘরের একদিকে বিছানা পাতা। এদিকে-ওদিকে কতকগুলি দরকারি আসবাব ও তৈজসপত্র। দেওয়ালের গায়ে রয়েছে ব্লো-পাইপ, তরবারি ও ছোরাছুরি প্রভৃতি অস্ত্র।

পরদিন সকালে প্রশান্তর পাশে বসে তুয়ান গজ নানান কথা নিয়ে আলোচনা করছিল।

প্রশান্তর জিজ্ঞাসার উত্তরে তুয়ান গজ বলছিল, 'ঠিক বলেছেন প্রশান্তবাবু, জাভার এই বনবাসীদের ঠিক অসভ্য বলে মনে করা চলে না। এদের অসভ্য বলে পরিচিত করে কেবল ইউরোপীয়রাই। আমি এদের অসভ্য বলি না। লেখাপড়া না জানলেও এরা নানান শিল্পকার্যে দক্ষ। এদের কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে আর পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ একটি রুচিকর প্রাচীন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এদের সব কিছুরই পিছনে আছে যে একটি পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এদের অসভ্য বলে ডাকলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লোকদেরও অসভ্য বলে মেনে নিতে হয়। ভালো কথা, সকালে বোধহয় চা-পানের অভ্যাস আছে?'

প্রশান্ত হেসে বললে, 'অভ্যাস তো আছে, কিন্তু এই দুর্গম বনের ভিতরে চা পাব কোথায়?'

—'চা পাবেন আমার কাছেই। কারণ বনবাসী হয়েও ও বিলাসিতাটি ছাড়তে পারিনি। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার জন্যে একটু আগেই আমি চা তৈরি করতে বলে এসেছি।'

প্রশান্ত বললে, 'আপনার কথায় আমার মৃতদেহে যেন জীবনসঞ্চার হল। এমনি বদ-অভ্যাস করে ফেলেছি মশাই, চা না পেলে আমার কিছুতেই চলে না।'

—'চা অবশ্য আপনি পাবেন, যত চান ততই পাবেন। কিন্তু অন্যদিকে আপনার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কষ্ট হবে বোধহয়।'

—'কেন?'

—'বোর্নিওর লোকেরা সাধারণত খাবার বলতে বোঝে খালি ভাত আর মাছ, মাছ আর ভাত। দিনে তারা দুবার করে খায়, আর খায় ওই ভাত আর মাছ, আর মাছ আর ভাতই। খালি ভাত আর মাছ আপনার পছন্দ হবে কি?'

প্রশান্ত বললে, 'আরে, রেখে দিন মশাই পছন্দ আর অপছন্দ! আপনার দয়ায় যে প্রাণে বেঁচেছি এইই আমার পরম সৌভাগ্য। এর ওপরে আবার ভালো ভালো খাবারের জন্যে বায়না ধরব, এমন শিশু আমি নই।'

এই সময়ে আর একটি নূতন লোক ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। তারও সাজপোশাক তুয়ান গজের মতোই এবং তাকে দেখলেও বোর্নিওর লোক বলে মনে হয় না।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তুয়ান গজ বললে, 'প্রশান্তবাবু, ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু তুয়ান উলু। আমাদের দুজনের দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু দুজনে হচ্ছি একেবারে একপ্রাণ, একমন। আপনি ওভাবে উলুর দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? আপনি কি ওকে চেনেন?'

প্রশান্ত তুয়ান উলুর দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বললে, 'ঠিক চিনি বলতে পারি না, তবে মনে হচ্ছে ওঁকে যেন এর আগে আর কোথায় দেখেছি। ঠিক সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ—অথচ কোথায় কি যেন মিলছে না! তুয়ান উলু, আপনি কি কখনও ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন?'

ইতিমধ্যে চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে এক ভৃত্য ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। উলু কোনও জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নিযুক্ত হয়ে রইল। প্রশান্তের সন্দেহ হল, উলু সত্য বা মিথ্যা কোনও কথাই বলতে রাজি নয়। চা-পান করতে করতে সে বারংবার উলুর দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। উলু কিন্তু তার সঙ্গে আর একবারও চোখোচোখি করলে না।

তুয়ান গজ প্রসঙ্গ বদলে বললে, 'প্রশান্তবাবু, একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই।'

—'বলুন।'

—'জাপানিরা এখানকার সমস্ত দ্বীপ দখল করেছে। লড়াই হয়তো এখন বেশ কিছুকাল চলবে। যদি বন্দী হতে না চান, তাহলে দীর্ঘকালের জন্যে আপনাদের হয়তো আমাদের সঙ্গে এইখানেই থাকতে হবে। কিন্তু এখানে আপনাদের বড়োই সাবধানে থাকতে হবে।'

—'কেন? জাপানিরা কি এই বনের ভিতরে এসেও আমাদের আক্রমণ করবে?'

—'খুব সম্ভব করবে না। আপনাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে আরএক শত্রুর জন্যে।'

—'সে আবার কে?'

—'আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে না পড়লে কালকেই আপনি তাকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেতেন।'

—'তাহলে আপনি তাকে চেনেন?'

—'হুঁ, কিছু কিছু চিনি বইকি। সে এক দুর্দান্ত লোক। জাপানিদের ভয়ে যারা দলে-দলে শহর ছেড়ে বনের ভিতরে পালিয়ে আসছে, বিশেষ করে তার দৃষ্টি সেই অসহায়দের উপরেই। বনের ভিতরে হঠাৎ সে সেই পলাতকদের উপরে গিয়ে হানা দেয়, তারপর খুন বা জখম করে তাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়।'

—'তার কথা আপনি আরও কি জানেন?'

—'বেশি কিছুই জানি না, তবে এইটুকু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, বিশেষ করে আপনার উপরেই যেন তার বেশি আক্রোশ আছে।'

প্রশান্ত চমকে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আপনার এমন সন্দেহের কারণ কি?'

—'নইলে কাল সে আপনাকে চুরি করবার চেষ্টা করেছিল কেন?'

—'আপনি কি অনুমান করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে চুরি করা?'

—'সে যখন আপনাকে হত্যা করেনি, অথচ আপনাকে ঘাড়ে করে নিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিল, তখন এই সন্দেহটাই কি মনের ভিতরে প্রবল হয়ে ওঠে না?'

—'কিন্তু আমাকে চুরি করে তার কি লাভ হত?'

—'সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো করে বলতে পারেন।'

—'আমি? আমি কেমন করে জানব?'

—'প্রশান্তবাবু, আমি আপনার বন্ধু। আমার কাছে আপনি লুকোচুরি করছেন কেন?'

—'তুয়ান গজ, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'বেশ বুঝতে পারছেন প্রশান্তবাবু, বেশ বুঝতে পারছেন। আপনি কে, আমি তা শুনেছি।'

—'শুনেছেন!'

—'কেন যে আপনি বোর্নিও দ্বীপে এসেছেন, তাও জানতে আমার বাকি নেই।'

প্রশান্তর দুই চক্ষে ফুটে উঠল গভীর সন্দেহের ভাব। কিন্তু সে আর কোনও কথাই বললে না।

গজ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'প্রশান্তবাবু, আজ আর আপনাকে বেশি ব্যস্ত করব না, আপনি বিশ্রাম করুন। কিন্তু খুব সাবধান! নমস্কার। এসো উলু, প্রশান্তবাবু এখন বোধহয় আমাদের কথা নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণা করবেন। ততক্ষণে আমরা অন্য কাজে যেতে পারি।'

গজ আর উলু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। প্রশান্ত স্তব্ধ হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল;—কে এই তুয়ান গজ? আমাকে সে চিনলে কেমন করে? সে থাকে বোর্নিওর দুর্গম বনে, আর আমি হচ্ছি ভারতবর্ষের মানুষ। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই বোর্নিওর মাটিতে পা দিয়েছি, সেটাও তো তার জানবার কথা নয়! সে কি সত্যই আমার বন্ধু? না, বাজে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সে আমাকে এখানে বন্দী করে রাখতে চায়? আর ওই উলু লোকটাই বা কে? ওকে যে আমি আগে দেখেছি, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় দেখেছি? ভারতবর্ষে? কলকাতা শহরে? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে?

এ যে বড়োই রহস্যের কথা! এ-রহস্য ভেদ না করতে পারলে আমার আর শান্তি নেই। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ষষ্ঠ
রাত্রির বিভীষিকা

সন্ধ্যার মুখে খুলে গেল আকাশের জলযন্ত্র। মুষলধারে নামল বৃষ্টি। জেগে উঠল দুরন্ত ঝড়, নদীর বুকে গর্জন করছে অশান্ত তরঙ্গদল, অরণ্যের মধ্যে চিৎকার করছে প্রমত্ত বনস্পতির দল। কালো আকাশের পটে আগুনঅক্ষরে বিদ্যুৎ লিখছে সর্বনাশের কাব্য, বজ্র-দামামা তার সঙ্গে করছে সঙ্গত।

প্রশান্তের ভয় হল এই মস্ত বাড়িখানার চালা হয়তো উড়ে যাবে ঝড়ের তোড়ে যেকোনও মুহূর্তে! বাড়ির দেওয়াল ও মেঝেও কাঁপছে থরথর করে—না কাঁপছে নয়, যেন তারা থেকে থেকে দুলে দুলে উঠছে প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায়।

তার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এমন দুর্গম বিজন বনের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি যে কতখানি বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে, এটা ছিল তার ধারণার বাইরে। ভৃত্য এসে তার জন্যে ঢাকনা চাপা দিয়ে রাত্রের খাবার রেখে গিয়েছিল। সে আজ একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে নিলে। তারপর উঠে জানলাটা একটু খুলে একবার বাইরের রূপটা দেখবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু তাকিয়ে দেখলে কেবল শব্দময় অন্ধকার পৃথিবী। অন্ধ আকাশের পৃষ্ঠপটে অস্পষ্ট রেখায় দেখা যায় কেবল তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত বৃক্ষদের চঞ্চলতা, আর শোনা যায় কেবল বাড়ির সুমুখের পথ দিয়ে কলকল শব্দে ছুটন্ত জলস্রোতের কোলাহল।

হঠাৎ ভিজে ঝড়ের একটা কনকনে ঝাপটা এমন ভাবে তার মুখের উপরে এসে আঘাত করলে যে, বাইরের দিকে তাকাবার ইচ্ছা আর তার রইল না। সে তাড়াতাড়ি জানলার পাল্লা টেনে বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় আকাশ ও পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেল একটা বৈদ্যুতিক অগ্নিকাণ্ডের উচ্ছ্বাস! বিদ্যুৎ জ্বলল আর নিবল, কিন্তু তারই ভিতরে একটা গাছের তলায় প্রশান্তের সচকিত চোখ যেন দেখে নিলে কি-একটা অসম্ভব দৃশ্য! কালো অজগরের মতন মোটা দুখানা অতি দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে বসে বসে দুলছে অমানুষিক এক মনুষ্যমূর্তি!

আবার জাগল অন্ধকার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশফাটানো বজ্রের গুরুগুরু হুঙ্কার! নিশ্চয় চোখের কোনও ভ্রম হয়েছে ভেবে প্রশান্ত জানলা আর বন্ধ করলে না, আর একবার বিদ্যুৎআলোকে সেই অপার্থিব মূর্তিটা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিদ্যুতের অগ্নিময় হিজিবিজি আবার উঠল জ্বলে, প্রশান্ত সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে গাছের তলার দিকে তাকালে, কিন্তু সেই অদ্ভুত মূর্তিটা আর সেখানে নেই। তখন সে নিজের চোখের ভ্রম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে জানলাটা আবার বন্ধ

করে দিলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তার দুই চক্ষের উপরে এসে পড়ল যেন একটা নিবিড় অন্ধকারের যবনিকা! কেউ তার মুখের উপরে পরিয়ে দিলে একটা পুরু কাপড়ের অবগুণ্ঠন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন-চার জোড়া হাত তাকে সজোরে চেপে ধরে একেবারে কাবু করে ফেললে। প্রশান্ত অনুভব করলে কারা তার হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলছে! তারপরই তার দেহ উঠল ঊর্ধ্বে, এবং কারা যেন তাকে কাঁধাকাঁধি করে বহন করে কোথায় নিয়ে চলল।

একটু পরেই ঝড়ের প্রবল নিঃশ্বাস ও তুহিনশীতল বৃষ্টির ঝরঝর বিন্দু তার সর্বাঙ্গে এসে পড়তে লাগল, সে বেশ আন্দাজ করতে পারলে তাকে নিয়ে কারা বাইরে পথের উপরে বেরিয়ে এসেছে।

সে তখন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু তার কান হয়ে উঠেছিল রীতিমতো সজাগ। প্রথমে সে অনুভব করলে ও শুনতে পেলে কেবল বৃষ্টিধারার স্পর্শ ও ঝড়ের কাতরানি এবং তারপরেই সেই সঙ্গে জেগে উঠল বৃষ্টিপুষ্ট ও ঝটিকাতাড়িত নদীর গভীর জলকল্লোল! কারা তাকে বহন করে নদীর ধারে নিয়ে এসেছে।

তারপরেই প্রশান্ত শুনলে মালয় ভাষায় কে কর্তৃত্বের স্বরে বলছে, 'এই মাঝি, এখনই আমাদের পার করে দিতে হবে!' সে কিছু কিছু মালয় ভাষা শিক্ষা করেছিল।

উত্তরে শোনা গেল—অর্থাৎ মাঝিই বললে, 'না, তুয়ান, এই ঝড়ে আমরা নৌকা বাইতে পারব না।'

জোর ধমক দিয়ে কে বললে, 'তোকে পার করে দিতেই হবে! নইলে এই রিভলবারের গুলিতে তোর মাথার খুলি যাবে উড়ে!'

মাঝি হঠাৎ ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে বললে, 'না তুয়ান, আমি পারব না, আমি পারব না! আপনাদের সঙ্গে ও কে এসেছে? ও তো মানুষ নয়, ও যে ভূত! আমি পারব না তুয়ান, আমার মাথা ঘুরছে, আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব!'

কে অট্টহাস্য করে উঠল হা হা হা হা করে! তারপরেই সে বললে, 'ভয় নেই রে মাঝি, ভয় নেই! ও আমাদের সঙ্গে যাবে না, ও খালি আমাদের পৌঁছে দিতে এসেছে! ও সব করতে পারে, কিন্তু জলকে ওর বিষম ভয়!.......... এই, চলে যা তুই এখান থেকে! আর তোকে এখানে থাকতে হবে না—মাঝি তোকে এখানে দেখে ভয় পাচ্ছে।'

তারপরই শোনা গেল ভারি ভারি শব্দ—কোন-একটা বিপুল দেহ যেন এখান থেকে মাটি কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে!

মাঝি তবু আশ্বস্ত হল না। সে বললে 'না তুয়ান, যারা ভূত পোষে তাদের সঙ্গে আমি নৌকোতে উঠতে পারব না।'

লোকটা ভয়ানক রেগে গিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'দ্যাখ মাঝি, তুই যদি বেশি চালাকি করিস তাহলে তোর ঘাড় মটকাবার জন্যে এখুনি আমি ওকে ডেকে আবার ফিরিয়ে আনব। ভালো চাস তো এখনই নৌকোয় গিয়ে ওঠ।'

মাঝি বললে, 'আপনি অন্যায় রাগ করছেন তুয়ান! এই ঝড়-জলে নৌকো যদি ডুবে যায়, তার জন্যে দায়ি হবে কে?'

লোকটা অধীর স্বরে বললে, 'দায়ি হব আমি! তাড়াতাড়ি আমাদের নিয়ে চল—আজ আমাদের নদী পার হতেই হবে!'

মাঝি বললে, 'কিন্তু কাঁধে করে ও কাকে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন?'

লোকটা বললে, 'অত খোঁজে তোর দরকার কি বাপু? যা বলছি কর! নৌকোয় গিয়ে ওঠ!'

প্রশান্ত বুঝলে, তাকে নিয়ে তারা আবার অগ্রসর হল। খানিক পরেই তার দেহটাও যে গিয়ে পড়ল নৌকোর পাটাতনের উপরে, এটাও অনুভব করতে পারলে। ঠিক এই-রকম আর একটি বৃষ্টিধৌত, ঝটিকাতাড়িত রাত্রির কথা তার স্মরণ হল। মহাদেও গুণ্ডা তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিতে গিয়েছিল এবং বিসর্জন দিয়েও ছিল। সেবারে অভাবিত ভাবে সলিলসমাধি থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল দীনুডাকাত। সেবারে ঘটনাক্ষেত্র ছিল তার স্বদেশে, কিন্তু এবারে সে এসে পড়েছে বহুদূরের এক অজ্ঞাত দ্বীপে, এখানে তাকে উদ্ধার করতে পারে এমন কোনোই বন্ধু নেই।

অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভিজতে ভিজতে ও প্রবল শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে শুনতে লাগল ঝঞ্ঝার আক্রমণে ক্রুদ্ধ নদীর গর্জনের পর গর্জন।

সে কারুকে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, কারণ তার মুখের উপর থেকে তখনও কাপড়ের গুণ্ঠন সরিয়ে নেওয়া হয়নি। নৌকোয় উঠে তার শত্রুরাও আর কোনও বাক্যব্যয় করলে না। তারা যে কারা, প্রশান্ত সেটাও অনুমান করবার চেষ্টা করলে বারংবার। তুয়ান গজ তার কাছে যে শত্রুর ইঙ্গিত দিয়েছিল, সে কি এই দলেই আছে? তা যদি হয়, তাহলে সে তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। কারণ তার সন্ধানেই সে আজ এই বোর্নিও দ্বীপ পর্যন্ত ছুটে এসেছে। তার বড়োই ইচ্ছা হতে লাগল, প্রশ্ন করে শত্রুদের মুখ থেকেই এই দরকারি কথাটা জেনে নেয়। কিন্তু সে উপায়ও নেই। মুখ বেঁধে তারা তাকে একেবারে বোবা করে রেখেছে।

কিন্তু প্রথম দিনেই যে অমানুষিক শত্রু তাকে হরণ করবার চেষ্টা করেছিল, কে সে? আজ রাত্রে গাছের তলায় চকিতের জন্যে সে যে অদ্ভুত ছায়ামূর্তিটাকে দেখেছে, এর সঙ্গে তার কি কোনও সম্পর্ক আছে? আর একে দেখেই কি মাঝি ভূত ভেবে ভয়ে শিউরে উঠেছে?

প্রশান্ত এইসব ভাবছে, হঠাৎ আকাশের মুখে ফুটে উঠল এমন একটা তীব্র অগ্নিক্রীড়া, গুণ্ঠনের ভিতর থেকেও সে তা দেখতে পেলে।

তারপরেই নৌকোর ভিতর থেকে সেই পূর্বপরিচিত কণ্ঠস্বর যেন দস্তুরমতো সচকিত হয়ে বলে উঠল, 'মাঝি, মাঝি! আমাদের পিছনে পিছনে একটা বড়ো নৌকো ছুটে আসছে কেন?'

আর একজন সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'তুয়ান, তুয়ান! সামনের দিক থেকেও একখানা নৌকো এইদিকেই ছুটে আসছে!'

প্রথম ব্যক্তি আবার বললে, 'মাঝি, এই ঝড়ে নৌকো চালায়, কে ওরা?'

মাঝি বললে, 'কি করে জানব তুয়ান? ওদেরও হয়তো আপনার মতন নৌকো চালিয়ে ঝড় দেখবার শখ হয়েছে।'

লোকটা ত্রস্ত স্বরে বললে, 'না, না, এসব ভালো কথা নয়! ভাগ্যিস বিদ্যুৎটা জ্বলেছিল, তাইতো আমরা নৌকো-দুখানা দেখতে পেলুম!'

তারপরেই মাঝি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে আরে, তুয়ান, করেন কি—করেন কি! জলে ঝাঁপ দিলে বানের মুখে ভেসে যাবেন যে!'

পরমুহূর্তে ঝপাঝপ শব্দ শুনেই প্রশান্ত বুঝতে পারলে যে, নৌকো ছেড়ে কারা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাঝি বললে, 'বরাত দেখছি বড়োই মন্দ! হতভাগা বিদ্যুৎ হাসবার আর সময় পেলে না! কেন বাবা, আর একটু পরে হাসলেই তো চলত, তাহলে ওরা তো আর নৌকো-দুখানা দেখতে পেত না!' তারপরই সে খুব জোরে চেঁচিয়ে যেন কাদের ডেকে বললে, 'ভাইসব! নৌকোর শিকার জলে গিয়ে পড়েছে! ভালো করে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, যদি কারুর পাত্তা পাও।'

বিপুল বিস্ময়ে প্রশান্ত দুই কান পেতে সব শুনতে লাগল। সে বহুদর্শী পুলিশকর্মচারি, সুতরাং তার বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এই নৌকোর লোকগুলোকে ধরবার জন্যে কারা যেন গোপনে কোনও ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কিন্তু তারাই বা কারা? এক বিপদ থেকে তাকে আবার কোনও নতুন বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হবে না তো?

খানিকক্ষণ কাটল। ঝড়, বৃষ্টি ও নদীর অশান্তি ক্রমেই যেন বেড়ে উঠেছে। খুব কাছেই কোথায় যেন বজ্রপাত হল।

মাঝি আবার চিৎকার করে বললে, 'সবাই ফিরে ডাঙার দিকে চল! নদীর স্রোত ছুটছে এখন বন্দুকের বুলেটের মতন বেগে, যারা জলে পড়েছে, আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না!' তারপরেই কে এসে প্রশান্তের হাত, পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিতে লাগল।

বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রশান্ত উঠে বসে দেখলে তার পাশে হাঁটু গেড়ে রয়েছে একটা মূর্তি। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে?'

মূর্তি বললে, 'আমি এই নৌকোর মাঝি।'

প্রশান্ত বললে, 'তুমি মাঝিই হও আর যেইই হও, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

মাঝি হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর বদলে বললে, 'প্রশান্তবাবু, আপনার কাছ থেকে এই দ্বিতীয় বার আমি ধন্যবাদ লাভ করলুম।'

প্রশান্ত সচমকে বললে, 'তুয়ান গজ!'

—'হ্যাঁ প্রশান্তবাবু, অধীনের ওই নাম।'

—'তাহলে আপনি মাঝি নন?'

—'কে বললে আমি মাঝি নই? মানুষ যখন যে কাজ করে, তখন সেই কাজ হিসাবেই তার নাম হয়। এখন আমি নৌকোর কর্ণধার, এখন আমি মাঝি বইকি!'

—'তাহলে আপনিই আবার আজ আমাকে রক্ষা করেছেন?'

তুয়ান গজ হেসে উঠে বললে, 'ঠিক আপনাকেই রক্ষা করবার জন্যে আজ আমি মাঝি সাজিনি। আমি জানতুম, আজ হোক, কাল হোক আপনাকে ধরবার জন্যে এখানে শত্রুদের আবির্ভাব হবেই! আর তারা যদি আসে তাহলে জলপথের সাহায্য না নিলে চলবে না। তাই আমি মাঝির রূপ ধারণ করেছিলুম।'

প্রশান্ত সবিস্ময়ে বললে, 'আপনি আশ্চর্য লোক দেখছি।'

তুয়ান গজ ধীরে ধীরে বললে, 'প্রশান্তবাবু, একটা কথা বললে আপনি রাগ করবেন না তো?'

—'আপনার মতন বন্ধুর কথায় রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

তুয়ান গজ বললে, 'প্রশান্তবাবু, শিকারীরা বাঘ-সিংহকে লোভ দেখিয়ে বন্দুকের সীমানার মধ্যে আনবার জন্যে কি উপায় অবলম্বন করে, জানেন তো?'

—'জানি। একটা ছাগল কি ভেড়াকে বনের ভিতরে বেঁধে রেখে দেয়।'

—'ঠিক। আপনাকে আমি এখানে এনে রেখেছি একটা বড়ো শিকারকে ধরবার জন্যে। আপনি যেখানে থাকবেন সেই শিকার যে সেখানে আসতে বাধ্য, এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত।'

প্রশান্তের দুই চক্ষু ক্রমেই বেশি বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। সে বললে, 'আমার শত্রু কি আপনারও শত্রু?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনার সঙ্গে তার শত্রুতার কারণ কি?'

—'কারণ প্রকাশ করবার সময় এখনও আসেনি।'

প্রশান্ত খানিকক্ষণ নিরুত্তর হয়ে রইল। তারপর বললে, 'তুয়ান গজ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, কি একটা রহস্যের ঘেরাটোপে নিজেকে আপনি ঘিরে রেখেছেন। যদিও আপনাকে এর আগে আমি দেখেছি বলে মনে হয় না, তবে মাঝে মাঝে আপনার চোখের ভিতরে যে ভাব ফুটে ওঠে, তা যেন আমার কাছে অপরিচিত নয়। কবে, কোথায়, কার চোখে ঠিক যেন ওইরকম ভাব ফুটে উঠত।'

—'তার নাম কি প্রশান্তবাবু?'

—'এখানেই হয়েছে মুশকিল, তার নাম আমি মনে আনতে পরেছি না।'

তুয়ান গজ সরে গিয়ে নৌকোর হাল ধরে বললে, 'প্রশান্তবাবু, দুর্যোগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। চলুন, আমরা ডাঙায় নামবার চেষ্টা করি।'

নৌকোর মুখ আবার তীরের দিকে ঘুরে গেল।

সপ্তম

গজের মুখোশ ত্যাগ

—'তুয়ান উলু, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি।' পরদিন সকালে বারান্দায় বসে উলুর সঙ্গে চা-পান করতে করতে প্রশান্ত এই কথা বললে।

উলু হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'প্রশান্তবাবু, ঠিক এই এক প্রশ্ন আপনি কবার করেছেন, সে হিসেব রেখেছেন কি?'

প্রশান্ত বললে, 'না, হিসাব রাখিনি বটে, তবে আপনাকে দেখলেই ওই প্রশ্নটাই আমার মনের ভিতর জেগে ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেলুম না।'

—'উত্তর পাননি তার কারণ, ও প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। আমি হচ্ছি বোর্নিওর বাসিন্দা, আর আপনি আসছেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কেমন করে?'

—'এখানও আপনি সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন না, কেবল কথার পর কথা সাজিয়ে যুক্তি দেখাচ্ছেন। এটাও আমার সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।'

উলু আবার হেসে বললে, 'দেখছি আপনি সন্দেহ করতে বেশ অভ্যস্ত।'

প্রশান্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'ঠিক ধরেছেন তুয়ান উলু, আমি সন্দেহ করতে অভ্যস্তই বটে।'

—'তার মানে?'

—'এতদিন আপনাদের আমি বলিনি, কিন্তু আর আমার আত্মগোপন না করলেও চলবে। আমি হচ্ছি কলকাতার এক পুলিশকর্মচারি।'

উলুর মুখে কোনোরকম ভাবান্তর হল না। সে সহজ স্বরেই বললে, 'কিন্তু বোর্নিওয় এসেছেন কেন?'

—'একজন পলাতক আসামির সন্ধানে।'

—'কে সেই আসামি?'

—'সে এক গুরুতর অপরাধের আসামি। ডাকাতি আর রাহাজানি ছিল তার পেশা। কিছুদিন ধরে পুলিশকে সে জ্বালিয়ে মেরেছিল। তার নাম শঙ্করলাল!'

উলু বললে, 'সে কি একবারও ধরা পড়েনি?'

—'হ্যাঁ, আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছিলুম। বিচারে তার উপরে দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হয়। কিন্তু তাকে দ্বীপান্তর পাঠাবার আগেই পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। সে হচ্ছে চার বছর আগেকার কথা। গেল তিন বছর আমরা তার কোনও খোঁজই পাইনি। তারপর কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি, শঙ্করলাল এই বোর্নিও দ্বীপে এসে নতুন নাম নিয়ে চারিদিকে ডাকাতি, রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে। তাকে আবার বন্দী করবার জন্যেই এই দ্বীপে আমি এসেছিলুম। কিন্তু দৈব আমার প্রতি বিরূপ। শঙ্করলালকে বন্দী করব কি, জাপানিদের হাতে বন্দী হবার ভয়ে আমাকেই এখন বনবাস করতে হচ্ছে। তার উপরে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর আপনার বন্ধু তুয়ান গজও বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছেন, শঙ্করলালও আমাকে বন্দী করবার চেষ্টায় আছে।'

উলু কোনও কথা না বলে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

প্রশান্ত নিজের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললে, 'কিন্তু একটা কথা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না। তুয়ান গজও শঙ্করলালকে বন্দী করতে চান কেন? শঙ্করলালের সঙ্গে কি তাঁরও কোনও বিবাদ আছে?'

উলু বললে, 'থাকতে পারে, আমি জানি না।'

—'আপনি জানেন না!'

—'না।'

—'অসম্ভব। তুয়ান উলু, পুলিসের চাকরি নিয়ে চুল পাকিয়ে ফেললুম। লোকের মনের ভিতরে প্রবেশ করবার কিছু কিছু শক্তি আমার হয়েছে। আমার বিশ্বাস আপনি অনেক কথাই জানেন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করতে রাজি নন। কেন বলুন দেখি?' এই পর্যন্ত বলেই প্রশান্ত হঠাৎ উলুর হাতের দিকে তাকিয়ে চকিত স্বরে বলে উঠল 'তুয়ান উলু, আপনার মণিবন্ধের ওপরে ও দাগটা কিসের? এতদিন তো ওটা আমার চোখে পড়েনি!'

নিজের হাতখানা ঘুরিয়ে উরুর উপরে রেখে উলু বললে, 'ও হচ্ছে একটা জড়ুলের দাগ।'

প্রশান্ত বললে, 'হতে পারে, কিন্তু ঠিক ডান মণিবন্ধের উপরেই ওই রকম দাগ দুজন মানুষের থাকতে পারে না বোধহয়?'

উলু মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'আপনার কথাগুলো হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে।'

প্রশান্ত মর্মভেদী দৃষ্টিতে একবার উলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললে, 'এইবারে আমার স্মরণ হয়েছে আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি?'

—'কোথায় দেখেছেন?'

—'বাংলাদেশে। কলকাতা শহরে। আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অরুণবাবু! আর আপনার বন্ধু হচ্ছে—' বলতে বলতে প্রশান্ত এক লাফে আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং বিস্মিত ও অভিভূত কণ্ঠে আবার বললে, 'মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—আর একটা কথাও মনে পড়েছে! আপনার বন্ধু হচ্ছে দীনুডাকাত, আর সেই দীনুডাকাতই আজ এখানে ছদ্মবেশে তুয়ান গজ নাম ধারণ করেছে! হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই—তুয়ান গজের মুখের উপরে আমি ফুটে উঠতে দেখেছি দীনুডাকাতের মুখের ভাব। এতদিন আমি কি অন্ধ হয়েছিলুম? এতবড়ো সহজ সত্যটাও আমার চোখে ধরা পড়েনি?'

পিছন থেকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় শোনা গেল, 'সত্যের সন্ধান পাওয়া সহজ নয় প্রশান্তবাবু! কত মুনি-ঋষি আজীবন তপস্যা করেও সত্যের সন্ধান পাননি। আপনি তাদের চেয়ে ভাগ্যবান।'

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, ঘরের ভিতরে এসে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে তুয়ান গজ।

প্রশান্ত বললে, 'তুয়ান গজ—'

—'আর আমাকে তুয়ান গজ বলে ডাকছেন কেন?'

—'দীনবন্ধুবাবু—'

—'এখন ও নামও আর আমার নয়।'

—'তাহলে কি বলে আপনাকে ডাকব?'

—'আপনি তো জানেন, আমি হচ্ছি অরুণের বন্ধু বরুণ। দীনুডাকাতের মৃত্যু হয়েছে। সে যেন আজ জন্মান্তরের সুখস্মৃতি!'

—'সুখস্মৃতি?'

—'হ্যাঁ, প্রশান্তবাবু। বড়োই সুখের স্মৃতি! সেই ঘটনাময় বিচিত্র জীবন, পাপীর শাস্তি-বিধান, দীনের দুঃখ মেচন, এসবই ছিল পরম আনন্দের। আজ সে আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি!'

অরুণ বললে, 'তোমার আনন্দের তালিকা থেকে একটা বিষয় বাদ দিয়েছ বরুণ!'

—'বাদ দিয়েছি নাকি?'

—'হ্যাঁ। অশান্তবাবু নামক গোয়েন্দাকে বারংবার হয়রান করেও তুমি যে পরম আনন্দলাভ করতে, সে কথাটা বলতে ভুলে গেলে কেন?'

—'অরুণ, এ তোমার অন্যায় অভিযোগ। অশান্তবাবু নিজেই হয়রান হয়ে আনন্দলাভ করতেন। না প্রশান্তবাবু?'

কিন্তু এ রসালাপ প্রশান্তের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। সে স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর কতকটা যেন নিজের মনেই মৃদুস্বরে বললে, 'নতুন এক নাটক অভিনয়ের জন্যে অপূর্ব এক রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়ে উঠেছে। যেন নিয়তিরই এক কঠিন আকর্ষণে সুদূর ভারতবর্ষের অভিনেতারা ছুটে এসেছে এই সাগরপারের বন্যদ্বীপের দুর্গম অরণ্যের ছায়ায়—'

যেন প্রশান্তের মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বরুণ বললে, 'হ্যাঁ, সেই শঙ্করলাল, সেই দীনুডাকাত, সেই কবি অরুণ আর গোয়েন্দা প্রশান্ত চৌধুরী। আশ্চর্য এই যোগাযোগ! কিন্তু এই যোগাযোগের পরিণাম যে কি হবে, একথা আমরা কেউ জানি না। জানব কেমন করে? আমরা তো নিয়তির হাতের খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছুই নই! প্রশান্তবাবু, আর একটা কথাও আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন?'

—'কোন কথা?'

—'দুনিয়ার এত দেশ থাকতে শঙ্করলাল এই বোর্নিয়ো দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে কেন?'

—'পুলিস তার সন্ধান পাবে না বলে।'

—'না। সে এসেছে চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যে!'

—'চরম প্রতিশোধ?'

—'চরম প্রতিশোধ! শঙ্করলালকে কে ধরিয়ে দিয়েছিল, আপনি তা জানেন?'

—'হ্যাঁ, তাকে বন্দী করে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছিলেন আপনি!'

—'তার উপরে শঙ্করের দাদা মহাদেওকেও ধরিয়ে দিয়েছিলুম আমি। আমার জন্যেই মহাদেওয়ের ফাঁসি হয়েছে। এসব কথা শঙ্করলালের পক্ষে ভোলা অসম্ভব। আমি যে এখানে এসেছি পুলিস সে খবর পায়নি বটে, কিন্তু শঙ্করলাল এ তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাই এখানে হয়েছে শঙ্করলালের আবির্ভাব। যদিও ভারতের

দীনুডাকাতই যে বোর্নিয়োর তুয়ান গজ, এ কথাটা এখনও সে জানতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, সে কিছু জানতে পারবার আগেই আমি আবার তাকে বন্দী করতে পারব।'

অরুণ বললে, 'নিজের ওপরে তোমার অতটা অন্ধ বিশ্বাস থাকা ভালো নয়। শঙ্করলাল তো কাল এখানে এসেছিল, তুমি চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারোনি।'

—'কালই সে ধরা পড়ত, কিন্তু বাদ সাধলে যে আকাশের বিদ্যুৎ! দুখানা বড়ো নৌকোয় ছিল আমার পঞ্চাশ জন লোক। বিদ্যুৎ না চমকালে শঙ্করলাল তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে অন্ধের মতনই তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত। যাক, একবার বিফল হয়েছি বলে আমি হাল ছাড়ব না। প্রশান্তবাবু যখন আমাদের অতিথি হয়েছেন তখন শঙ্করলাল যে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, 'বরুণবাবু, আমি আর আপনার আতিথ্য স্বীকার করতে পারব না।'

বরুণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কেন প্রশান্তবাবু, অতিথিসৎকারে আমাদের কোনও ত্রুটি হয়েছে নাকি?'

প্রশান্ত বললে, 'না বরুণবাবু, অতবড়ো মিথ্যে কথাটা বলতে চাই না। এখানে আমি পরম সুখে আছি। তার উপরে স্বদেশে—এমন কি এই দূর-প্রবাসেও আপনার কাছে আমি বারংবার উপকৃত হয়েছি। এইবার নিয়ে আপনি আমার জীবনরক্ষা করলেন তিনবার। অমি পুলিসের লোক হলেও অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু আমি পুলিসের লোক বলেই আপনার কাছ থেকে আমাকে বিদায় গ্রহণ করতেই হবে।'

বরুণ হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি আমার মতন পাপীর সংস্পর্শে থাকতে রাজি নন?'

—'না বরুণবাবু, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। ভেবে দেখুন, আমি হচ্ছি সরকারের চাকর, নিমকের মর্যাদা রাখতে আমি বাধ্য। ধরলুম, আগেকার পেশা আপনি ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারের কাছে আজও তো আপনি পলাতক আসামি বলেই গণ্য?'

—'হ্যাঁ, ব্রিটিশ সরকারের কাছে। কিন্তু আজ আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে বাস করছি। এখানটা আগে ছিল ওলন্দাজদের রাজ্য, কিন্তু এখন হয়েছে জাপানিদের হস্তগত। আপনি যে-আইনের দাস, এখানে তা অচল।'

—'না বরুণবাবু, আপনার মতো আমিও তো এখনও ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক ত্যাগ করিনি, আমাকে বিদায় নিতেই হবে।'

—'কিন্তু আপনি এখান থেকে চলে গেলে শঙ্করলালকে আর কখনও হয়তো ধরতে পারবেন না, এটা বুঝতে পারছেন তো?'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে দুঃখিত ভাবে বললে, 'সব বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি নিরুপায়।'

অরুণ বললে, 'প্রশান্তবাবু, দলপতি হয়ে আপনি এই যে এতগুলো অসহায় অভাগাকে মৃত্যুর মুখ থেকে দূরে নিয়ে এসেছেন, এদের কি আবার মৃত্যুর মুখেই নিক্ষেপ করবেন!'

প্রশান্ত বললে, 'আমি এতটা নির্বোধ আর নির্দয় নই অরুণবাবু! এরা আপাতত আপনাদের আশ্রয়েই থাকুক না! ভারতবর্ষ থেকে আমার সঙ্গে এসেছে দশজন লোক, আমি কেবল তাদেরই নিয়ে চলে যেতে চাই।'

বরুণ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, 'আপনি যখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তখন আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

অষ্টম

সেলাদাং!

বলাবাহুল্য, প্রশান্তের যে দশজন লোক ভারতবর্ষ থেকে বোর্নিয়ো পর্যন্ত এসেছে, তারা সকলেই হচ্ছে পুলিসকর্মচারি। অপরিচিত দেশে, নিবিড় জঙ্গলের বিভিন্ন বিভীষিকার কবলে পড়ে তাদের হতভাগ্য প্রাণপক্ষীর অবস্থা হয়ে উঠেছিল তখন দেহপিঞ্জর ত্যাগ করবার মতো। তাই জঙ্গল ছেড়ে বাইরে যাবার প্রস্তাবে তারা সকলে সায় দিলে একবাক্যে এবং বিপুল আনন্দেই।

খুব ভোরে বনমুর্গীরা ঝাঁকে ঝাঁকে শূন্যপথ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল পরিচিত জলাশয়ের সন্ধানে। সিন্দূর-তিলকা উষার আবির্ভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে অন্যান্য দিবাচর বিহঙ্গরাও পুলকচঞ্চল কণ্ঠে রচনা করছিল তরুণ আলোকের প্রশস্তিগাথা।

প্রশান্ত নিজের দলবল নিয়ে বনপথের উপরে এসে দাঁড়াল।

বিদায়ী নমস্কার জানাবার জন্যে বরুণ ও অরুণও বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রশান্ত মৃদুহাস্য করে বললে, 'বরুণবাবু, ঋণের মাত্রা আরও খানিকটা না বাড়িয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আজ আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে।'

বরুণও সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'ঋণ! কিসের ঋণ?'

—'আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ।'

—'না প্রশান্তবাবু, বাঘ আর হরিণের মধ্যে কৃতজ্ঞতার কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না। আপনি যে পুলিসকর্মচারি আর আমি যে ভূতপূর্ব দস্যুদলপতি, একথা আজও আপনার হাড়ে হাড়ে গাঁথা আছে। সুতরাং এখানে কৃতজ্ঞতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

প্রশান্ত দুঃখিত কণ্ঠে বললে, 'বিদায়ের মুহূর্তে আমাকে আর আঘাত দেবার চেষ্টা করবেন না।'

—'না প্রশান্তবাবু, আমি হক কথাই বলছি। আপনি কি আজকের বিদায়কে চিরবিদায় বলে মনে করেন?'

—'নিশ্চয়ই নয়!'

—'আচ্ছা, আবার যদি আমাদের দেখা হয়, তাহলে আপনি আমাকে কিভাবে সম্বোধন করবেন? বন্ধুভাবে, না শত্রুভাবে?''

—'আজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।'

—'কেন?'

—'এর উত্তর নির্ভয় করে স্থান, কাল আর অবস্থার উপরে।

বরুণ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, 'দেখছি আপনি মনের কথা সরলভাবে বলতে নারাজ। কারণ, উত্তর দিচ্ছেন আইন বাঁচিয়ে।'

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে প্রশান্ত বললে, 'এইটেই কি আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয় বরুণবাবু? আইন বাঁচিয়ে কাজ করাই যে আমার পেশা! কথায় কথায় বেলা বাড়ছে, ওই দেখুন, জঙ্গলের ঝিলিমিলির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সূর্যের মুখ। আর নয়, বিদায়। নমস্কার।'

বরুণ এবং অরুণ একসঙ্গে বললে, 'নমস্কার।'

প্রশান্ত পায়ে পায়ে অগ্রসর হল এবং তার সঙ্গের লোকেরাও চলল পিছনে পিছনে।

আচম্বিতে জঙ্গলের নির্জন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিকে দিকে পরিত্রাহি চিৎকার জেগে উঠল, 'পালাও! পালাও! পালাও!'

আড়ালে আড়ালে শোনা গেল বহু পলায়মান মানুষের দ্রুতপদশব্দ এবং অনতিবিলম্বেই দেখা গেল, এখানে-ওখানে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে ঝোপের পর ঝোপ!

বরুণ ও অরুণের আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন স্থানীয় লোক, তারাও অত্যন্ত ত্রস্তভাবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে উদ্যত হল।

বরুণ বিস্মিত স্বরে বললে, 'ব্যাপার কি?'

—'সেলাদাং, সেলাদাং!'

—'ভয় কি? তোমাদের কাছে অস্ত্র রয়েছে, আত্মরক্ষা করো!'

বেগে পালাতে পালাতে তারা বললে, 'তি-দর, বুল্যি তুয়ান' (করা যাবে না হুজুর)!'

বন্য গো-মহিষ জাতীয় জীবদের মধ্যে সেলাদাং হচ্ছে সবচেয়ে বৃহৎ, বলিষ্ঠ এবং হিংস্র—এদের পাওয়া যায় খালি এই অঞ্চলেই। ভয়াবহ বন্য মহিষরাও বিপদ দেখলে ঝোপঝাপের আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, এরা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক ও মরিয়া এবং মানুষ দেখলেই তেড়ে এসে আক্রমণ করে। এরা কখনও পোষ মানে না বা জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে না, তাই পৃথিবীর কোনও পশুশালাতেই সেলাদাংয়ের নমুনা দেখা যায় না। শিকারীদের মতে, সেলাদাং হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার।

জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মতন প্রকাণ্ড একটা সেলাদাং—তার দুই চক্ষু যেন অগ্নিবর্ষী!

প্রশান্ত সদলবলে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে পড়েছিল—বিপদের কারণ না বুঝেই। তারপর ভালো করে কিছু বুঝতে না বুঝতেই সেই ভীষণ জীবটা একেবারে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন এক বজ্রঝটিকার মতন—সে নিজের বন্দুকটাও তোলবার অবসর পেলে না।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বুঝে প্রশান্ত দুই চোখ মুদে ফেললে এবং সেই অবস্থাতেই শুনতে

পেলে উপর-উপরি দুইবার বন্দুকের গর্জন ও খুব নিকটেই একটা গুরুভার দেহপতনের শব্দ।

সে চোখ চেয়ে দেখলে, বরুণ ও অরুণের বন্দুকের মুখে লেগে রয়েছে বিলীয়মান ধোঁয়ার রেখা এবং তার পায়ের তলায় পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে সেলাদাংটার মস্তবড়ো রক্তাক্ত দেহ!

শুকনো হাসি হেসে প্রশান্ত বললে, 'দেখছেন বরুণবাবু, যতক্ষণ এখানে থাকব ততক্ষণ আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ ক্রমশ বেড়েই চলবে। এ হচ্ছে সাংঘাতিক অরণ্য, আপনাকে সাধুবাদ দেবার জন্যেও আর আমি এখানে অপেক্ষা করতে রাজি নই।'

সঙ্গীদের নিয়ে প্রশান্ত তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলে।

সেলাদাংয়ের দেহটা ততক্ষণে মরে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বরুণ ও অরুণ এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে লাগল।

অরুণ বললে, 'বোর্নিয়োয় প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। কিন্তু তিনি যা বললেন, মিথ্যে নয়। আমরা যেখানে আছি, এ হচ্ছে সাংঘাতিক অরণ্য। এখানে পদে পদে অপঘাতমৃত্যুর সম্ভাবনা! ভাই বরুণ, আমিও এই বনের বাইরে যেতে পারলেই সুখী হই।'

বরুণ স্মিতমুখে বললে, 'এখনই তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ, তবু এখানকার ভয়ঙ্কর অজগর আর বিষম খেঁকি কালো চিতাবাঘের সঙ্গে তোমার কোনও পরিচয় হয়নি। বোর্নিয়োর আর এক বিশেষত্ব হচ্ছে—ওরাং-উটান। প্রাতরাশ এখনও প্রস্তুত হয়নি। ইতিমধ্যে একটা ওরাং-উটানের গল্প শুনবে?'

দূর বনের মাথায় মুকুটের মতো দেখাচ্ছিল উদীয়মান প্রভাকরকে এবং আকাশ-বাতাসকে কলধ্বনিময় করে তুলছিল পাখিদের প্রভাত-ফেরী।

একটা গাছের তলায় বসে পড়ে অরুণ বললে, 'গল্প শুনতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।'

বরুণও বন্ধুর পাশে আসীন হয়ে বললে, 'চার্লস মেয়ার হচ্ছেন একজন পৃথিবী-বিখ্যাত শিকারী। তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রধানত বিস্তৃত ছিল মালয়, সুমাত্রা ও বোর্নিয়ো প্রভৃতি অঞ্চলের জঙ্গলে। তাঁর শিকার ছিল দুই রকম। তিনি পশুদের কখনও বধ করতেন ও কখনও বন্দী করতেন। বন্দী পশুরা সংগৃহীত হত পৃথিবীর নানা দেশের পশুশালা ও সার্কাসের জন্যে। সুমাত্রা ও বোর্নিয়োর গভীর অরণ্যে বাস করে ওরাং-উটান বা বনমানুষ। লাঙ্গুলহীন সুবৃহৎ বানরদের মধ্যে গরিলার পরেই ওরাংয়ের স্থান। চার্লস মেয়ার একবার জঙ্গলে গিয়েছিলেন ওরাং-উটান বন্দী করবার জন্যে। বনমানুষ বধ করা সহজ, কিন্তু বন্দী করা অতিশয় কঠিন; হাতি, গণ্ডার, সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্দী করার চেয়েও কঠিন ও বিপজ্জনক। এরকম কাজে কতখানি বুদ্ধি, সাহস, ধৈর্য, তোড়জোড় ও লোকবলের দরকার হয়, এই কাহিনীটি শুনলেই তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন চার্লস মেয়ার স্বয়ং। অর্থাৎ আমার মুখ দিয়ে তুমি শুনছ যেন তাঁরই মুখের গল্প।'

... ...

জঙ্গলের মধ্যে একটি গ্রামের ভিতরে পেতেছিলুম আস্তানা।

অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর একজোড়া মস্তবড় ওরাংয়ের খবর পাওয়া গেল। মদ্দা ও মাদি। তারা বাসা বেঁধেছে প্রকাণ্ড একটা গাছের উপরে। জায়গাটা হচ্ছে গ্রাম থেকে দুই ঘণ্টার পথ।

আমার সঙ্গী ছিল ওমার ও মুন্সী। তাদের নিয়ে লোকজনদের ডেকে এনে আমরা পরামর্শ করতে বসলুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল পরামর্শ।

একসঙ্গে একজোড়া ওরাংকে জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করা যে-সে কথা নয়। প্রাপ্তবয়স্ক ওরাং যে কি অমিত শক্তির অধিকারী, আমার তা অজানা নেই। ওরাংকে স্বচক্ষে দেখেছি, এক ইঞ্চি পুরু লোহার ডাণ্ডাকে এক হাতের এক মোচড়ে রবারের মতো দুমড়ে ফেলতে! সবচেয়ে বলিষ্ঠ হচ্ছে তার বাহু। দুইদিকে বিস্তার করলে তার বাহুযুগলের মাপ হয় দশ ফুট। তার কাঁধ থেকে কটিদেশ পর্যন্ত আকারে মানুষের মতোই, কিন্তু তার পা দুটো হচ্ছে ছোটো ছোটো। ওরাং পারতপক্ষে মাটির উপর দিয়ে হেঁটে আনাগোনা করে না, দুইহাত দিয়ে ডাল ধরে ঝুলে পড়ে এক ডাল থেকে আর এক ডালে দোদুল্যমান অবস্থায় এগিয়ে যায়। যেসব অরণ্যে ওরাংয়ের বাস, সেখানকার বৃক্ষদল এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তার পক্ষে মাটির উপরে পদচালনা না করলেও চলে। ডালপালা ভেঙে বাসা বেঁধে সে রাত্রে গাছের উপরেই শয়ন করে। তারা এক এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালোবাসে এবং চল্লিশ থেকে ষাটটা পর্যন্ত ওরাং এক এক দলে থাকে।

আক্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হলে ওরাংয়ের প্রকৃতি হয় অত্যন্ত হিংস্র। শত্রুদের সংখ্যা বেশি বলে যখন সে গাছের উপর থেকে নামতে সাহস করে না, তখন বিষম আক্রোশে যেন একেবারে ক্ষেপে যায়। নিজেরই হাত কামড়ে ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। এবং একসঙ্গে একটা গাছে দুটো ওরাং থাকলে তারা পরস্পরকেই জড়িয়ে ধরে কামড়াকামড়ি করে। আহত হলে সে গাছ থেকে নেমে পড়ে দলবদ্ধ মানুষদেরও আক্রমণ করতে ভয় পায় না এবং কোনও বিশেষ মানুষ সে সময়ে ওরাংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মৃত্যু তার নিশ্চিত।

ওরাংদের বন্দী করতে যাওয়া প্রায় যুদ্ধযাত্রারই সামিল। যে দুটো জীবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, আগে থাকতে ভালো করে তদারক করবার জন্যে একদিন আমি সদলবলে যাত্রা করলুম।

সে এক গহন বন। পথপ্রদর্শকের পিছনে পিছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পায়ে পায়ে বাধা পেয়ে অসংখ্য ঝোপঝাড় ভেঙে অবশেষে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। যে গাছে তারা বাস করে তার উপরে নিচে থেকেই দেখতে পেলুম তাদের বাঁধা মাচান। সৌভাগ্যক্রমে তারা তখন বাসায় ছিল না।

সঙ্গের লোকজনদের একজায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে কেবল ওমার আর মুন্সীকে নিয়ে আমি গাছটার চারিপাশে এক চক্কর ঘুরে এলুম। গাছটা যেখানে ছিল তার চারিদিকের জঙ্গল ভীষণ ঘন। গাছের পর গাছ দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরের গায়ে পা ঠেকিয়ে। এর ডালপালা মিশে গেছে ওর ডালপালার সঙ্গে এবং তাদের উপরে আবার জাল বুনে

দিয়েছে নানা জাতের লতা। অস্ত্র দিয়ে পথ না কেটে নিলে এক পদ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সেখানে আর সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ওরাংদের গাছটাই।

সেইখানে বসে বসে ঘণ্টাখানেক মাথা ঘামাবার পর ওরাংদের বন্দী করবার ফন্দি স্থির করে ফেললুম। ওমার ও মুন্সীকে বললুম, 'চারিদিকের জঙ্গল এমনি কৌশলে কেটে সরিয়ে ফেলবে যে, ওরাংরা আর তাদের গাছ থেকে লাফ মেরে পালাতে পারবে না।' কৌশলটা কি, তাও আমি বুঝিয়ে দিলুম।

তারপর ফিরে এসে আমার লোকজনদের ডেকে জঙ্গলের লতাডালগুলো আগে কেটে ফেলতে বললুম। লতার বাঁধন ছেদন না করলে গাছগুলো কেটে ফেললেও তাদের ভূতলশায়ী করা সম্ভবপর নয়।

দলে দলে লোক শীঘ্রহস্তে প্যারাং চালিয়ে বড়ো গাছটার চতুর্দিকবর্তী প্রায় ষাট ফুট লতাজাল কাটতে নিযুক্ত হল। এ অঞ্চলের লোক দুই রকম অস্ত্র ব্যবহার করে—ক্রিশ আর প্যারাং। ক্রিশ ছোটো ছোরা এবং প্যারাং হচ্ছে তার চেয়ে বড়ো অস্ত্র। প্যারাং চালনায় এদের অদ্ভুত নিপুণতা এবং এত তাড়াতাড়ি এরা কাজ করতে পারে যে, দেখলে অবাক হতে হয়।

লতার বাঁধন কেটে ফেলা হল বটে, কিন্তু সরিয়ে ফেলা হল না। বাহির থেকে দেখলে তাদের অবিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। তারপর গাছগুলোর গুঁড়ির উপরে অস্ত্রাঘাত হতে লাগল। কিন্তু এমন কায়দায় গুঁড়ি কাটা হল যে, গাছগুলো তখনকার মতো সোজা খাড়া হয়েই রইল। সবশেষে ঠিক সেই ভাবেই ওরাংদের গাছটারও মূলোচ্ছেদ করা হল।

প্যারাংয়ের শব্দ ও বিপুল জনতার গোলমাল শুনে বনবাসী জন্তুরা কৌতূহলী হয়ে ব্যাপার কি জানবার জন্যে দলে দলে তদারক করতে বেরিয়ে এল—এমন কি অনেকগুলো ছোটো আকারের ওরাং পর্যন্ত। আমরা তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলুম না দেখে অধিকতর সাহস সঞ্চয় করে তারা আরও কাছে এগিয়ে এল। তখন দলবদ্ধ বন্যদর্শকদের কিচিরমিচির চিৎকার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক।

সেদিনকার মতো প্রাথমিক কাজ সেরে আমরা আবার গ্রামে ফিরে এলুম। সন্ধ্যার আগে ওরাংরাও ফিরে কোনও সন্দেহ করতে পারবে বলে মনে হয় না, কারণ, জঙ্গলের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে না।

গ্রামে এসেই আমরা এই বিপজ্জনক অভিযানের জন্যে আয়োজন শুরু করে দিলুম। বড়ো বড়ো গাছ কেটে পুরু তক্তা বানিয়ে দুটো খাঁচা তৈরি করা হল। কিন্তু মহাবলবান ওরাং পাছে সেই খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে র‍্যাট্টানের মজবুত দড়ি জড়িয়ে খাঁচার চারিদিক ভালো করে ঘিরে ফেলা হল। খাঁচা ভাঙতে পারলেও ওরাংরা র‍্যাট্টানের এই জাল ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। জোরে লোহার ডাণ্ডা দুমড়ে ফেলা সহজ, কিন্তু র‍্যাট্ট্যানের দড়ি ছেঁড়া সহজ নয়।

র‍্যাট্ট্যান হচ্ছে দ্রাক্ষালতার মতো একরকম লতা—তার দৈর্ঘ একশো ফুটের চেয়েও বেশি হতে পারে। মাটি থেকে বড়ো গাছ বেড়ে বিসর্পিত গতিতে তা উপরদিকে উঠে

গিয়ে আবার নেমে আসে নিচের দিকে। বাজারে যে বিখ্যাত মালাক্কা বেত পাওয়া যায়, তা সবচেয়ে মোটা র‍্যাট্যান লতা দিয়ে তৈরি।

ওই র‍্যাট্যানের দড়ি দিয়েই দুটো জালও তৈরি করা হল, ওরাংরা ভূতলে অবতীর্ণ হলেই ওই জাল দুটো সর্বাগ্রে তাদের উপরে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর কেমন করে সব দিক সামলে কাজ করতে হবে, তা বোঝাবার জন্যে কয়েক দিন ধরে চলল জোর রিহার্সাল। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তিই রীতিমতো পোক্ত হয়ে উঠল।

দিন-চারেক আমি আর জঙ্গলের মধ্যে পদার্পণ করিনি। আমার আদেশে কেবল দলে দলে লোক গিয়ে ওরাংদের গাছের চারিপাশ ঘিরে রাশি রাশি শুকনো ঘাস ও লতাপাতা স্তূপীকৃত করে রেখে এল।

তারপর একদিন পঞ্চাশজন চতুর ও নিপুণ লোক বেছে নিয়ে চললুম আমি জঙ্গলের ভিতরে। সঙ্গে রইল ওমার ও মুন্সী। আমার বিশ্বস্ত অনুচর আলিও বন্দুক নিয়ে চলল সঙ্গে সঙ্গে।

যাত্রা শুরু হয়েছিল রাতের অন্ধকারে এবং যখন যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলুম তখন সবে ফুটে উঠেছে ভোরের আলো। দেখতে পেলুম, ওরাংরা নিশ্চিন্ত মনে মাচানের উপরে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ত্রিশজন লোক চারিদিকের গাছগুলো মাটির উপরে পেড়ে ফেলবার জন্যে নীরবে এগিয়ে গেল। দশজন লোক প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বড়ো গাছটাকে ভূতলশায়ী করবার জন্যে, তারও গুঁড়িটা বেঁধে ফেলা হল মোটা কাছি দিয়ে। সেখানে রইল আরও দশজন লোক, ওরাংরা ভূমিতলে অবতীর্ণ হলেই তারা জাল নিক্ষেপ করবে তাদের উপরে। এক এক দিকে গিয়ে খবরদারির ভার গ্রহণ করলে ওমার ও মুন্সী। যথাসময়ে পিস্তল ছুড়ে সঙ্কেত দেবার ভার রইল আমার উপরে। আমার পাশে এসে দাঁড়াল বন্দুকধারী আলি।

ছুড়লুম আমি পিস্তল! সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ার ভয়াবহ হট্টগোল যেন জাগ্রত হয়ে উঠল সেই অরণ্যের মধ্যে। জনতার কান ফাটানো হই হই চিৎকার, দমাদ্দম ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে প্যারাং চালনার শব্দ! ওরাং দুটো আতঙ্কে জেগে ধড়মড় করে মাচানের উপরে উঠে বসে সভয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগল চতুর্দিকে।

ওদিকে গাছের পর গাছ মাটির উপরে শুয়ে পড়ছে ধপাধপ, ধপাধপ! দেখতে দেখতে চারিদিকের জঙ্গল সাফ—জমির উপরে একলা খালি দাঁড়িয়ে রয়েছে বড়ো গাছটা! তার তলায় দাউ-দাউ করে জ্বলছে শুকনো ঘাসলতাপাতার স্তূপ!

আতঙ্কগ্রস্ত ওরাং দুটো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আর্তচিৎকার করতে লাগল। একটা ওরাং নিচে নেমে আসতে উদ্যত হল। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরলুম। কিন্তু খানিকটা নেমেই পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার তাড়নায় সে আবার মাচানের উপরে গিয়ে উঠল এবং চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আশপাশের ডালপালাগুলো মড়মড় করে ভেঙে ফেলতে লাগল। ক্রমে ধূম্ররাশি যখন আরও ঘন হয়ে মাচানের কাছে গিয়ে পৌঁছোল,

তারাও আরও উপরে উঠে একেবারে টঙে গিয়ে বসে রইল পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল তারা তখন।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তখন চারিদিক আচ্ছন্ন, চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল বড়ো গাছটা পর্যন্ত।

ওমার ছুটে এসে খবর দিলে, 'সব ব্যবস্থা প্রস্তুত! বড়ো গাছটা ভূতলশায়ী হলে আমাদের লোকজনরা জাল ফেলে ওরাংদের বন্দী করতে পারবে। কেবল আপনার হুকুমের অপেক্ষা।' আমি হুকুম দিলুম।

দ্বিগুণ জোরে জেগে উঠল প্রচণ্ড হট্টগোল, ঢাক-ঢোলের ধুমধাড়াক্কা এবং প্যারাংয়ের খনখন-খটাখট। বড়ো গাছটা হঠাৎ দুলে উঠতেই ওরাংরা সভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। গাছটা প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর হুড়মুড় করে মাটির উপরে এসে আছড়ে পড়ল। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড।

জালে আবদ্ধ হয়ে ওরাংরা প্রথমটা দারুণ আতঙ্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারপর সমূহ বিপদ বুঝে হাত-পা-দাঁত দিয়ে জালের বাঁধন কাটবার জন্যে যুঝতে লাগল প্রাণপণে।

একটা ওরাং আচমকা জালের ছিদ্র দিয়ে তার সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেললে একজন লোককে এবং সঙ্গে সঙ্গে মট করে তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে নিক্ষেপ করলে তার দেহটাকে শূন্যের দিকে। কয়েক গজ দূরে ধপাস করে মাটির উপরে এসে পড়ল বেচারার মৃতদেহ, তার নাক ও মুখ দিয়ে হুহু করে রক্ত নির্গত হতে লাগল।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'শীগগির দ্বিতীয় জালটাও ছুড়ে ওদের চাপা দিয়ে সেটাকে বেঁধে রাখো গাছের সঙ্গে!'

ওরাংরা যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করতে করতে শেষটা নিজেরাই বাঁধা পড়ল। এ জাল এখন দুর্ভেদ্য!

আমি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খবরদারি করছি, আচম্বিতে জাল ভেদ করে আবার একটা প্রকাণ্ড থাবা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এসে চেপে ধরলে আমার পায়ের গোড়ালি। এক হ্যাঁচকা-টানে আমি হলুম পপাতধরণীতলে, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি চেপে ধরলুম একটা গাছের গুঁড়ি।

তারপর অনুভব করলুম একটা বিষম আকর্ষণ, অসাড় হয়ে গেল আমার পা এবং গাছের গুঁড়ি থেকে প্রায় খুলে এল আমার হাতের বাঁধন!

আর সকলে প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মতন। আমি মনে করলুম এইবারে এসেছে আমার অন্তিম মুহূর্ত!

কিন্তু সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিয়ে এক লাফে এগিয়ে এসে, একগাছা মোটা লাঠি দিয়ে ওমার সজোরে বারংবার আঘাত করতে লাগল ওরাংয়ের বাহুর উপরে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার জালের ভিতরে হাত গুটিয়ে নিলে।

ফাঁড়া উৎরে গেল বটে, কিন্তু আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গিয়েছিল এবং শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকের অধীনে আমাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুকাল।

ওরাংরা বন্দী হল এবং সমুদ্রপথে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল আন্টওয়ার্পের চিড়িয়াখানার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতাহীনতা ও স্বদেশত্যাগের দুঃখ তারা সহ্য করতে পারলে না, প্রাণত্যাগ করলে অনাহারে।

নবম

বরুণের ভোজবাজি

দিন তিনেক পরে ভোরবেলায় বরুণের ঘরের ভিতরে এসে অরুণ দেখলে, সে চুপ করে দুই চোখ মুদে শয্যার উপরে শুয়ে আছে।

অরুণ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কি হে বন্ধু, এমন অসময়েও তুমি তন্দ্রাদেবীর পূজা করছ নাকি?'

বরুণ চোখ খুলে বললে, 'না বন্ধু, তুমি তো জানোই, চিন্তাকুল হলে আমি চক্ষু মুদে থাকতে ভালোবাসি!'

অরুণ বললে, 'তোমার আবার কিসের চিন্তা?'

—'অনেক চিন্তা ভাই, অনেক চিন্তা! এইমাত্র আমার চর এসে কি খবর দিয়ে গেল জানো?'

—'কি খবর?'

—'শঙ্করলাল তার আড্ডা থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

—'একেবারে নিরুদ্দেশ!'

—'আড্ডা থেকে বেরিয়ে সে প্রথমে নানায়োপিনো গ্রামের ওপরে গিয়ে হানা দেয়। তারপর সেখানে লুটপাট করে দলবল নিয়ে কোথায় যে চলে গিয়েছে, কেউ তা জানে না। বনের ভিতরে তার আড্ডা খালি হয়ে পড়ে আছে।'

অরুণ খুশি হয়ে বললে, 'বেশ তো, আপদ বিদেয় হয়েছে! এ জন্যে তোমার চিন্তার কারণ কি?'

বরুণ বিছানার উপরে উঠে বসল, মুখ তার গম্ভীর। কঠিন স্বরে বললে, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ অরুণ, আমি কি প্রতিজ্ঞা করেছি।'

অরুণ বললে, 'কিছুই আমি ভুলিনি। তোমার প্রতিজ্ঞা ছিল, দস্যু শঙ্করলালকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করবে। সে প্রতিজ্ঞা তুমি রক্ষা করেছ তো!'

বরুণ মাথা নেড়ে বললে, 'এরকম প্রতিজ্ঞা রক্ষার কোনও অর্থই হয় না। শঙ্করলাল পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আবার সমাজের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে, আবার দিকে দিকে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদিও আমি আর দীনুডাকাত নই, তবু দীনদরিদ্রদের ওপরে যে অত্যাচার করে, আমার শেষ-নিঃশ্বাস পড়বার আগে তাকে আমি ক্ষমা করব না, কখনোই ক্ষমা করব না! তারপরে আমাকে তুমি কি ভাবো বলো দেখি? আমি কি কাপুরুষ? সে আমাকে খুঁজে বেড়াবে, আর আমি লুকিয়ে থাকব? না অরুণ, এ হতেই পারে না। এবারে আমি শঙ্করলালের বিষদাঁত ভেঙে তবে ছাড়ব!'

অরুণ কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'বরুণ, তোমাকে আমি কত ভালোবাসি, তা তুমি জানো। তোমার পূর্বজীবন যতই উত্তেজনাপূর্ণ হোক, আমি কোনোদিনই তার পক্ষপাতী ছিলুম না। বোর্নিয়োয় এসে তুমি আবার নূতন জীবন যাপন করবে শুনেই আমিও তোমার সঙ্গে এখানে এসেছি। এখন যদি শঙ্করলালকে উপলক্ষ্য করে আবার তুমি পূর্ব-মূর্তি ধারণ করতে চাও, আমি আর তোমার দলে নেই। এজন্যে তোমাকে যদি ত্যাগ করতে হয়, তবে সে দুঃখ পেতেও আমি নারাজ নই!'

বরুণ উঠে দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হেসে বললে, 'আচ্ছা, তোমার এইসব মূল্যবান যুক্তি নিয়েও পরে আমি রীতিমতো মস্তিষ্ক চালনা করব। আপাতত শান্তি, শান্তি! আজকের সকালটিকে ভারি মিষ্টি বলে মনে হচ্ছে, নয়? এমন সুন্দর প্রভাতে কি করা উচিত বলো দেখি?'

—'তুমিই বলো না কি করতে চাও?'

—'রক্তপাত!'

—'রক্তপাত করে শান্তির সাধনা? চমৎকার!'

অরুণের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বরুণ হাসিমুখে বললে, 'রক্তের নামেই চমকে যেয়ো না ভায়া! আমি রক্তপাত করব বটে, কিন্তু এ-রক্ত হচ্ছে তোমার কাছেও লোভনীয়!'

—'কি রকম?'

—'খালি ভাত আর মাছ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আজ আমরা দুই বন্ধুতে যদি বন্যকুক্কুটের সন্ধানে যাত্রা করি, তাহলে তোমার আপত্তি আছে কি?'

অরুণ হেসে ফেলে বললে, 'বনমুর্গীর নাম শুনেই আমার আপত্তি শঙ্করলালের মতোই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।'

বরুণ বললে, 'চলো, চলো তবে পোশাক পরে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

... ...

সত্যই এ সূর্যকরের দ্বীপ! গাঢ় নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়ছে যেন সোনালি আলোর ধারা। নদীর ওপারে একটি খোলা মাঠ, তার ওপারে দেখা যাচ্ছে নীল বনের দীর্ঘ রেখা এবং বনের ওপাশে অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বদেবতার অভ্রভেদী বিরাট দেউলের মতন একটি পর্বতশিখর! চারিধার থেকে ভেসে আসছে পাখিদের সুখের গান ও প্রজাপতিদের রঙের ইঙ্গিত।

নদীর পারঘাটে গিয়ে তারা দেখলে, একদল লোক সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা কইছে এবং একটি নারী করুণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে নষ্ট করে দিচ্ছে এমন শান্ত প্রভাতের সমস্ত সৌন্দর্য।

তাদের দেখেই লোকগুলো ছুটে কাছে এসে দাঁড়াল। বরুণ তাদের চিনলে, কারণ তারা এই অঞ্চলেরই পল্লীবাসী। একজন তার পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'তুয়ান, তুয়ান, আমাদের রক্ষা করুন!'

যে কাঁদছিল সেও আকুল স্বরে বললে, 'তুয়ান, আমার সর্বনাশ হয়েছে!'

বাকি সকলেও নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে একসঙ্গেই অভিযোগ করতে লাগল।

বরুণ তাদের কতকটা সংযত করে যা জানতে পারলে তা হচ্ছে এই ঃ নদীর এখানে নাকি একটা বিপুলদেহ কুমির দেখা দিয়েছে। প্রায়ই সে ঘাটের কাছে এসে মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আজ সকালেই সে এক স্ত্রীলোকের স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডুব মেরেছে। তার ভয়ে নদীর জল ব্যবহার করাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কেউ জলের ধারে পর্যন্ত এসে দাঁড়াতে সাহস করে না। এখন তুয়ান যদি তাদের রক্ষা না করেন, তাহলে তাদের এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনোই উপায় নেই। ইত্যাদি।

বরুণ বললে, 'অরুণ, এখানকার সরল মানুষগুলিকে সমস্ত বিপদে-আপদে সাহায্য করতে চেষ্টা করি বলেই এরা আমাকে এতটা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। কিন্তু জলের কুমির মানুষ মুখে করে পাতালে ডুব মেরেছে, আমি এদের কি সাহায্য করি বলো দেখি?'

অরুণ বললে, 'কুমিরটাকে দেখা গেলেও বন্দুক ছুড়তে পারতুম, কিন্তু তার তো কোনো পাত্তাই নেই!'

বরুণ বললে, 'কিন্তু কুমির দেখা না গেলেও আমাকে একটা উপায় করতেই হবে। এরা জানে আমি হচ্ছি মস্তবড়ো জাদুকর! এদের সে বিশ্বাসকে আমি আহত করতে চাই না।'

অরুণ হেসে বললে, 'কিন্তু কি করতে পারো তুমি? তুমি কি জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব-সাঁতারে পাতালে গিয়ে কুমিরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে?'

বরুণ বললে, 'ছিঃ বন্ধু, তুমি কি জানো না আমার এই মস্তিষ্কটি হচ্ছে নব নব দুষ্টবুদ্ধির আকর? এই দ্যাখো না, কুমিরবাবাজিকে আমি কেমন জব্দ করে দিই!' বলেই সে লোকগুলোকে ডেকে হুকুম দিলে—'শীগগির একখানা নৌকো নিয়ে এসো। কুমিরের হাত থেকে আজই আমি তোমাদের উদ্ধার করব।'

অরুণ হতভম্বের মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল, লোকগুলি তুয়ান গজের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে দৌড়ে চলে গেল এবং অনতিবিলম্বেই একখানা বড়ো নৌকা বেয়ে কয়েকজন লোক ঘাটের কাছে নিয়ে এল।

বরুণ বললে, 'এসো বন্ধু, আমরা নৌকোয় গিয়ে আরোহণ করি।'

বরুণের সঙ্গে অরুণ বিনাবাক্যব্যয়ে নৌকায় গিয়ে উঠল। তারপর বরুণের কথায় মাঝিদাঁড়িরা নৌকাখানাকে মাঝনদীর দিকে নিয়ে চলল।

নৌকা যখন নদীর মাঝ-বরাবর এসে পৌঁছেছে, তখন নদীর ধারে সারে সারে এসে দাঁড়িয়েছে শত শত গ্রামবাসী! ভাব-ভঙ্গি তাদের উৎসাহিত, মুখে মুখে তাদের উচ্চ চিৎকার!

অরুণ বললে, 'তুমি যে এতগুলো লোককে ধাপ্পা দিয়ে মাতিয়ে তুললে, এখন কি করে মুখ রক্ষা করবে? কোথায় তোমার কুমির? সে এখন জলের তলায় বসে বসে নরমুণ্ড চর্বণ করছে, উপরে আসবার জন্যে তার বয়ে গেছে!'

বরুণ বললে, 'কিন্তু তাকে জলের উপরে আসতেই হবে!'

—'কেমন করে? ফুস মন্ত্রে?'

বরুণ আর কিছু না বলে নিজের ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে একটি ডিনামাইটের স্টিক, তার সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একটি সুদীর্ঘ পলিতা! অরুণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

বরুণ বললে, 'দেখো ভায়া, ডিনামাইটের ষ্টিকটি এই আমি জলের ভিতরে নিক্ষেপ করলুম, কিন্তু পলতেটি রইল আমার হাতে। তুমি তো জানোই, এই পলতের আগুন জলের ভিতরে গিয়েও নিবেবে না? তারপর এই দেখো, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিলুম আমি পলতের মুখে আগুন! অতঃপর কি হয়, দেখা যাক।'

অগ্নি জলের ভিতরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই নদীর ভিতরে জাগল একটা চাপা বিস্ফোরণের অদ্ভুত শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর বুকে উথলে উঠল বড়ো বড়ো ঢেউয়ের পর ঢেউ!

হাতের বন্দুকটা উদ্যত করে বরুণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল সেই উদ্বেলিত নদীর দিকে দিকে। বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হল না, একদিকে দেখা গেল শ্বেতবর্ণ সুদীর্ঘ কি একটা জিনিস নদীর জলে ভেসে উঠেছে।

বরুণ চেঁচিয়ে বললে, 'ওই দেখো অরুণ, কুমিরটা চিৎ হয়ে জলের উপরে ভাসছে! ও কেবল স্তম্ভিত কি অচেতন হয়ে গেছে! শীগগির বন্দুক ছোড়ো—জলে ডোববার আগেই ও-দেহের ভিতরে কর অগ্নিবৃষ্টি!'

বরুণ ও অরুণ একসঙ্গে দুইবার করে বন্দুক ছুড়লে। তারপর বরুণ হেঁট হয়ে জলের উপরে ঝুঁকে পড়ে কুমিরের আড়ষ্ট ল্যাজটা টেনে ধরে দাঁড়িদের ডেকে বললে, 'তোমরাও কেউ কেউ এসে আমাকে সাহায্য করো। বাকি সবাই নৌকোখানাকে আবার ঘাটের দিকে নিয়ে চলো।'

নৌকা যখন ঘাটে এসে লাগল তখন আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে তুয়ান গজের নামে জয়ধ্বনিতে! বিপুল আনন্দের আবেগে অনেকে পাগলের মতন নৃত্য করতে লাগল।

মেপে দেখা গেল, মৃত কুমিরের দেহটা লম্বায় প্রায় বারো হাত।

দশম

ছোটো মাঠ, ছোটো নদীর ধারে

ভোজবাজি দেখিয়ে গ্রামবাসীদের অভিনন্দন লাভ করে বরুণ ও অরুণ আবার এগিয়ে চলল।

মাঠের পরে আরম্ভ হল অরণ্যরাজ্য।

অরুণ চমৎকৃত চক্ষে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'দেখ বরুণ, এখান থেকে বনকে দেখাচ্ছে কত সুন্দর! পাখির গানের তালে তালে নেচে উঠছে তরুণ শ্যামলতা, ফুলে ফুলে গুঞ্জন করছে মধুকররা, বড়ো বড়ো বনস্পতিকে বেষ্টন করে দুলছে পুষ্পিত

লতারা, যেখানে তাকাই সেখান থেকে উঁকি মারছে অর্কিডদের রংমশাল! আর এ-সমস্তরই উপরে স্বচ্ছ সোনার প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে শিল্পী সূর্যকর!'

বরুণ বললে, 'কিন্তু একবার এই বনের ভিতরে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে যাও, আর কোনও সৌন্দর্যই দেখতে পাবে না—তখন তোমাকে ঠেলে চলতে হবে অন্ধকার, মাড়িয়ে চলতে হবে অন্ধকার! এমন ঘন বন পৃথিবীর আর কোথায় আছে জানি না। কেবল কি অন্ধকার? তার মধ্যে আছে আবার কত ভয়! হাতি আছে, বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, অজগর আর বিষাক্ত সাপ আছে! এইটুকু একটা দ্বীপে যত হিংস্র পশু আছে, সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা খুঁজলেও তা পাওয়া যাবে না! তার উপরে আছে আবার নৃমুণ্ডশিকারী মানুষের দল! অথচ আমাদের এই বনের ভিতরেই ঢুকতে হবে, নইলে আমরা বন্য-কুক্কুটের দর্শন পাব না।'

—'বনমুর্গীরা কি অন্ধকারে বাস করতে ভালোবাসে?'

—'না। আমি বনের একটা পায়ে-চলা পথের সন্ধান জানি। সেই পথে মাইল দেড়েক এগুলে পর পাব চারিদিকে বন-দিয়ে-ঘেরা একটা ছোটো মাঠ আর একটা ছোটো পাহাড়েনদী। সেই জায়গাটা হচ্ছে বনমুর্গীদের প্রিয় বিচরণক্ষেত্র। চলো, দুর্গা বলে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ি।'

অরুণ কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বললে, 'কিন্তু আমি তো বনের ভিতরে ঢোকবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসিনি! আমি এনেছি একটা পাখিমারা দোনলা বন্দুক। অবশ্য এ বন্দুকেও চলে, সঙ্গে এমন গোটাকয়েক S.S.G. টোটা নিয়ে এসেছি—তার সাহায্যে বড়োজোর ছোটোখাটো জানোয়ারদের বাধা দেওয়া যাবে, কিন্তু কোনও বড়ো জন্তুর সামনে দাঁড়ানো চলবে না!'

বরুণ বললে, 'মাভৈ! আমারও অবস্থা তোমারই মতন! কিন্তু আজ তো আমাদের 'বিগ-গেম' শিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে না! একে দিনের বেলা, তায় আমরা থাকব বনের সীমান্তে, কোনও বাঘ-ভাল্লুক আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আসবে না বলেই মনে করি। চলে এসো।'

দুজনে বনের ভিতরে প্রবেশ করলে। প্রথম খানিকক্ষণ গাছপালার ঝিলিমিলির ভিতর দিয়ে আকাশের আলোকরেখাগুলো চারিদিক থেকে তাদের উপরে এসে পড়তে লাগল, তারপরেই দেখা গেল দিনের দীপ্তি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। আরও কিছুক্ষণ পরেই এল সেই চিরসন্ধ্যার রাজত্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারই মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে উঠেছে আবার নিরেট কষ্টিপাথরের মতন কালো, সেদিকে তাকালেও দৃষ্টি যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

অরুণ বললে, 'বরুণ, বনের সীমান্তের অবস্থাই তো দেখছি চূড়ান্ত! তোমার সেই ছোটো মাঠ আর ছোটো নদী আরও কতদূরে আছে?'

বরুণ বললে, 'এই তো আমরা পথের শেষে এসে পড়েছি।'

—'একেই কি তুমি পথ নামে ডাকতে চাও? কোথায় যে পথ, কোথায় যে তার ল্যাজা আর কোথায় যে তার মুড়ো, কিছুই আমি উপলব্ধি করতে পারছি

না। একে পথ বা বিপথ বা কুপথ বা অ-পথ কোনও নামেই ডাকা চলে না, এ পথই নয়।'

বরুণ হেসে বললে, 'বুঝো জন যে জানো সন্ধান! তুমি বনে এসেও শহুরে জীবনকে ভুলতে পারোনি, তাই বনপথের সন্ধান পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। দাঁড়াও, তোমার সামনেই একট মস্তবড়ো বাঁশঝাড় আছে। দেখতে পাচ্ছ?'

অরুণ বললে, 'আমি দুচোখে দেখছি খালি অন্ধকার।'

—'বেশ, তুমি আমার হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে এসো। এই বাঁশঝাড়টা বাঁদিকে রেখে আমাদের ঘুরে যেতে হবে। এই বাঁশঝাড় পর্যন্ত এসেই পথ শেষ হয়ে গিয়েছে। কই, আমার হাত ধরলে না?'

অরুণ কাতর স্বরে বললে, 'তোমার হাত ধরবার আগে আমি আর এক আক্রমণকারীর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছি।'

বরুণ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তার মানে? তুমি আবার কার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছ হে?'

—'একটা কাঁটাঝোপের। অন্ধের মতো আমি তার উপরে গিয়ে পড়েছি, আর সেও আমাকে চারিদিক থেকে আলিঙ্গন করে ধরেছে।'

বরুণ টর্চের আলো ফেলে দেখলে অরুণের জামা ও কাপড় একটা কাঁটাঝোপের কবলগত হয়েছে। সে অনেক কষ্টে তাকে কাঁটাঝোপের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে, 'তোমার হাতে, পায়ে, গায়েও যে কাঁটা বিঁধে গেছে দেখছি! আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে টর্চের আলোতে কাঁটাগুলো উৎপাটন করো, আমি একবার ওদিকটায় উঁকি মেরে আসি।'

অরুণ অভিযোগের স্বরে বললে, 'তোমার সঙ্গে টর্চ আছে তো এতক্ষণ জ্বালোনি কেন? তাহলে তো আমার এ-দুর্দশা হত না!'

বরুণ বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, তুমিও আমার মতন চক্ষুষ্মান!'

—'চুলোয় যাক তোমার চক্ষু আর তোমার বনের পথ আর তোমার বনমুর্গী! আর আমি এখান থেকে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'!'

বরুণ কৃত্রিম বিস্ময় ভরে বললে, 'অপরংবা কিং ভবিষ্যতি! আমার বন্ধু অরুণ কিনা আজ তুচ্ছ কাঁটার ঘায়ে বন্যকুক্কুটের মহিমা ভুলে গেল! এর পরেও কি বলতে ইচ্ছা হয়না, ভগবতী বসুন্ধরে, তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও?'

অরুণ খাপ্পা হয়ে বললে, 'যাও যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না!'

—'আচ্ছা ভাই, আমিই যাচ্ছি'। কাঁটাগুলো তুলে ফেলে টর্চ জ্বেলে আধ-মিনিট সোজা এগুলেই তুমি এই বনের অন্ধকার-প্রাচীর ভেদ করতে পারবে। ততক্ষণে আমি দেখে আসি আমার প্রিয় বনমুর্গীরা নদীর ধারে খোলা মাঠে বসে কি করছে! তাদের চোখ ভরে দেখবার জন্যে আমার আর তর সইছে না!' বলতে বলতে বরুণ পায়ে পায়ে অগ্রসর হল এবং দেখতে দেখতে শুকনো পাতার উপরে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল তার পায়ের শব্দ।

অরুণের দেহের অবস্থা হয়েছে অত্যন্ত করুণ। তার গায়ে এতগুলো কাঁটা বিঁধেছে যে তাকে এখন মানুষসজারু বললেও অত্যুক্তি হবে না। শরশয্যায় শুয়েও পিতামহ ভীষ্মের অঙ্গে এতগুলো ছিদ্রের সৃষ্টি হয়নি। থেকে থেকে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করতে করতে ও কাঁটা তুলতে তুলতে তার বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। তারপর তার দেহ যখন কণ্টকমুক্ত হল তখন তার সর্বাঙ্গ রীতিমতো রক্তাক্ত। মুখ টিপে একটুখানি হেসে সে নিজের মনেই বললে, 'বরুণ বলছিল, আজকের এই সুন্দর প্রভাতে তার রক্তপাত করবার সাধ হয়েছে! তা আজ বেশ রক্তপাতই হল বটে—বনমুর্গীর না হোক, অন্তত আমার......কিন্তু বরুণের আর কোনও সাড়া-শব্দ নেই কেন? বনমুর্গীদের দেখে সে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল নাকি? এগিয়ে দেখতে হল তো!'

সামনের দিকে টর্চের আলোকরেখা ফেলে অরুণ সবে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছে, এমন সময় বন্দুকের প্রচণ্ড গর্জনে সে একেবারে চমকে উঠল—বেশ বুঝলে কে একসঙ্গে বন্দুকের দুটো ব্যারেলই খালি করে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার বা হুঙ্কার! সেরকম বীভৎস চিৎকার অরুণ জীবনে আর কখনও শ্রবণ করেনি—সে চিৎকার যে কোন ভয়াবহ জীবের তাও সে আন্দাজ করতে পারলে না।

সে কয়েকমুহূর্ত স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো। তারপরেই শুনতে পেলে কে যেন সশব্দে ঝোপের পর ঝোপ দুলিয়ে এবং মড়মড় করে গাছের সব ডাল ভাঙতে ভাঙতে পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে দূরে চলে গেল!

তখন তার সাড় হল। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'বরুণ! বরুণ! বরুণ!'

কেউ সাড়া দিলে না। বরুণ বলে গেল সে আধমিনিটের বেশি এগিয়ে যাবে না। সে যদি এতই কাছে থাকে, তবে সাড়া দিচ্ছে না কেন?

সে আবার ডাকলে, 'বরুণ! বরুণ! তুমি কোথায় আছ? সাড়া দাও!'

উত্তরে কারুর কণ্ঠস্বরই সেই অন্ধকার বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে না।

উৎকণ্ঠায় অরুণের হৃদপিণ্ড যেন ধড়ফড় করে উঠল। সে আর ডাকাডাকি না করে প্রথমে নিজের দোনলা বন্দুকের ভিতরে দুটো S.S.G. টোটা ভরে নিলে। তারপর ডানহাতে বন্দুকের কুঁদোটা বগলদাবা করে ও বামহাতে টর্চের আলোটা সামনে ফেলে পরম সাবধানে অগ্রসর হল এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে।

চারিদিকে ঘোর জঙ্গল। পথের অস্তিত্ব দেখবার মতো দৃষ্টি তার নাকি নেই। কোথাও দু-দিক থেকে হেলে-পড়া মাথার উপরকার কাঁটাঝোপের তীক্ষ্ণ স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে এবং কোথাও কোনও সাধারণ ঝোপ ভেদ করে খানিকক্ষণ অগ্রসর হয়ে হঠাৎ সে যেখানটায় এসে পড়ল সেখানে গাছ বা ঝোপ বা অন্ধকারের কোনও বাধাই আর নেই।

প্রখর একটা সূর্যালোকের দীপ্তি যেন তার চক্ষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে সে দেখলে, সামনেই পড়ে আছে একটি তৃণশ্যামল ছোটো মাঠ এবং তারই একপাশ দিয়ে রবিকিরণের চিকমিকে হিরার হার বুনতে বুনতে বয়ে যাচ্ছে একটি তটিনী। তারই ওপার থেকে আবার আরম্ভ হয়েছে

মস্তবড়ো আর একটা অরণ্যদুর্গ এবং দূরে—বহুদূরে আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখা আবৃত করে অনন্তের স্বপ্ন দেখছে একটি বৃহৎ পর্বত!

তারপরেই অরুণের চোখে পড়ল আর একটা দৃশ্য। মাঠের উপরে শূন্যপথ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনেকগুলো বড়ো বড়ো পাখি। তাদের ওড়বার ধরণ দেখেই অরুণের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তারাই হচ্ছে বরুণের সেই কুক্কুটের দল। মাটি ছেড়ে তারা আকাশে উড়েছে নিশ্চয়ই বন্দুকের ডবল ব্যারেলের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে।

কিন্তু বরুণ কোথায়? বনমুর্গীরা আকাশে উড়ে গিয়েছে, মাঠে জনপ্রাণীর ছায়া নেই।

অরুণ আবার পিছন ফিরে জঙ্গলের দিকে তাকালে। সেই মহাবনের গাছপালার ভিতরে আর কোনও চঞ্চলতাই নেই—এমন কি একটা পাখির ডাক পর্যন্ত সেখানে শোনা যাচ্ছে না। অরুণ আবার চিৎকার করলে, 'বরুণ! বরুণ!' স্থির অরণ্য, স্তব্ধ চতুর্দিক।

আচম্বিতে অরুণের চোখ পড়ল নিচের দিকে। মাটি ও শুকনো পাতার উপরে রয়েছে টকটকে রাঙা টাটকা রক্তের ভয়াবহ প্রলেপ! অরুণ শিউরে উঠে ভাবলে, আমার বন্ধু বরুণ কোথায় গেল? এ কার রক্ত? কে বন্দুক ছুড়লে? কে অমন ভয়ানক চিৎকার আর হুঙ্কার করলে? সশব্দে ঝোপ দুলিয়ে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে বনের আঁধারে কে কোথায় মিলিয়ে গেল? কে সে? কে সে? বরুণ? না আর কেউ?

তার সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠতে চাইলে। কিন্তু সে অনেক কষ্টে আত্মসংযম করে নিজের মনে মনেই বললে, এ হচ্ছে সর্বনাশের স্বদেশ, মৃত্যুই হচ্ছে এখানকার মহারাজা! এখানে হতাশ ভাবে নারীর মতন হাহাকার করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা!

তারপরে এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে অরুণ লক্ষ্য করলে, সামনেকার একটা গাছের নিচের দিকের ডাল টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছে। একটা ভাঙা ডাল সে হাতে করে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বুঝলে, এ ডাল সদ্যই ভাঙা হয়েছে। আর এরকম ডাল যে ভাঙতে পারে সে মত্ত হস্তীরও চেয়ে কম ক্ষমতাশালী নয়।

তারপরেই আরো লক্ষ্য করলে, এখান দিয়ে সামনের ঝোপঝাপ উৎপাটন করতে করতে এবং মাথার উপরকার গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে কোনও আশ্চর্য অতিকায় জীব যেন নিজের চলবার পথ তৈরি করে নিয়ে গভীর বনের ভিতরে প্রবেশ করেছে।

অরুণ আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলে : কোনও অভাবিত জীব এমন অনায়াসে এত বড়ো বড়ো গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে এই নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছে? খুব সম্ভব তার বন্ধুই বন্দুক ছুড়েছে, কিন্তু এ-রক্ত কার? তার বন্ধুর না আর কোনও ভয়াবহ জীবের? কিন্তু তার বন্ধু এখানে নেই কেন? সে তার এত ডাকেও সাড়া দিচ্ছে না কেন? তবে কি তার বন্ধু বরুণ আর ইহলোকে বর্তমান নেই?'

ছিন্নভিন্ন ঝোপ ও ভাঙা ডালপালা ছড়ানো মাটির উপর দিয়ে তিন-চার পা অগ্রসর হয়েই অরুণ সভয়ে দেখলে, একটা বন্দুক দুই-খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে! অরুণের চিনতে বিলম্ব হল না, এ-বন্দুক তারই বন্ধুর!

বুঝেই প্রথমটা তার মাথা ঘুরে গেল। একটা গাছের উপরে ঠেস দিয়ে সে কোনো-রকমে নিজেকে মাটির উপরে পতন থেকে রক্ষা করলে। তারপর আত্মসংবরণ করে সেই ছেঁড়া ঝোপ আর ভাঙা ডালপালা ছড়ানো পথ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল, কোথাও বরুণের দেহ অচেতন বা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে কিনা।

সামনেই হঠাৎ একটা বিষাক্ত সর্প ফণা ধরে ফোঁস করে উঠল। কিন্তু অরুণ তখন উন্মত্ত! তার বন্দুকের কুঁদোর এক আঘাতেই সেই ফণাধারী সর্পের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং সে তার লটপটে দেহটা অনায়াসে দুপায়ে মাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটে অগ্রসর হতে লাগল।

ছিন্নভিন্ন ঝোপ, আর গাছের ভাঙা ডালপালা! এই হল অরুণের পথের নিদর্শন! অরুণ বুঝলে, বরুণের দেহ এবং তার শত্রু যখন এখানে নেই, তখন এই পথ দিয়েই তার বন্ধুর মৃত বা জীবন্ত দেহ নিয়ে কোনও অজ্ঞাত শত্রু অরণ্যের অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

অরুণ প্রতিজ্ঞা করলে, সে বরুণের মৃত বা জীবন্ত দেহকে উদ্ধার করবে এবং সেই সঙ্গে তার যে-কোনও শত্রুকে সামনে পাবে, তাকে দেখবামাত্রই হত্যা করবে! এ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে যদি তাকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়, তাতেও তার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কারণ, বরুণ নেই যে-পৃথিবীতে সে-পৃথিবী হচ্ছে অরুণের পক্ষে মরুভূমির মতো!

একাদশ

ভয়াবহ অভিনয়

বিচিত্র এক নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে।

দৃশ্যপটের দিকে তাকালে দেখা যাবে—বনের ভিতরেই আধা আলো আধা ছায়া-মাখা একটুখানি জায়গা, লম্বায়-চওড়ায় তিরিশ-চল্লিশ হাত। তার চারিদিকেই যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন বনস্পতির ভিড়। প্রত্যেক বৃক্ষই এমন প্রকাণ্ড ও এমন সুদীর্ঘ পত্রবহুল বাহু বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে যে, মাথার উপরকার আকাশ প্রায় অদৃশ্য বললেই চলে। এবং প্রত্যেক গাছের তলায় ও ফাঁকে ফাঁকে ছোটো বড়ো ঝোপঝাপ ও র‍্যাটান বেতের জঙ্গল মিলে সৃষ্টি করেছে একটি স্বাভাবিক ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

একটা বড়ো গাছের ছায়া যেখানটায় অন্ধকার আরও বেশি নিবিড় করে তুলেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে জন ছয়-সাত মালয়দেশীয় লোক। তাদের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, দলের একজন লোক যদিও মালয়দেশীয় পোষাক পরে আছে, কিন্তু আসলে সে হচ্ছে বিদেশি। লোকটার চেহারা রীতিমতো লম্বা-চওড়া এবং তার দেহও হচ্ছে অতিশয় পেশীবহুল, বলিষ্ঠ। তার ভাবভঙ্গির ভিতর দিয়েও ফুটে উঠছে একটা পাশবিক শক্তির ভয়াল উচ্ছ্বাস।

তাদের পায়ের তলায় মাটির লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের উপরে পড়ে আছে একটা

অচেতন ও সুবৃহৎ মানুষের দেহ। সকলেই সাগ্রহে তাকিয়েছিল সেই অচেতন দেহের দিকে।

সেই বিপুলবপু লোকটি বললে, 'মনে হয় একে যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারছি না।'

সঙ্গীদের একজন জবাব দিলে, 'তুয়ান, একে আমরা দেখেছি তিন-চার দিন আগেই। এ ব্যাটা হচ্ছে সেই নৌকোর মাঝি।'

বিপুলবপু বললে, 'আর দূর, এ-যে সেই মাঝি তা আমিও জানি! কিন্তু মনে হচ্ছে আমি একে দেখেছি আরও অনেক দিন আগে। কিন্তু কোথায়, কবে, কি সূত্রে সেসব কিছুই স্মরণ করতে পারছি না।'

—'একে সবাই এখানে তুয়ান গজ বলে ডাকে। আমরা জানি আপনার মতো এও এদেশের লোক নয়।'

—'এদেশের লোক নয়! আমার সন্দেহ যে আরও বেড়ে উঠল!'

এমনি সময়ে সেই ভূতলশায়ী দেহটির উপরে অল্প অল্প চেতনার লক্ষণ ফুটে উঠল। আর বোধহয় বলে দিতে হবে না যে এই লোকটি আমাদের বরুণ ছাড়া অন্য কেউ নয়।

বিপুলবপু বললে, 'ওরে, এর জ্ঞান হয়েছে! শীগগির এর হাত-পা বেঁধে ফ্যাল।'

দুজন লোক তাড়াতাড়ি দুগাছা দড়ি দিয়ে বরুণের দুই হাত ও দুই পা শক্ত করে বেঁধে ফেললে।

বরুণ কাতর, অর্ধআচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, 'অরুণ, অরুণ!'

বিপুলবপু সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে, ব্যাটা যে বাংলা বুলি বলে! অরুণ, অরুণ বলে কাকে ডাকছে? কে অরুণ? ওটাও তো বাংলা নাম!' বিস্ফারিত চক্ষে খানিকক্ষণ সে বরুণের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ সচকিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, 'চিনেছি, চিনেছি! যে শিকারের তল্লাসে আমি এতদূর ছুটে এসেছি, এ হচ্ছে সেই দীনু-ডাকাত নিজেই! অরুণ হচ্ছে দীনুর এক বন্ধুর নাম! জয় মা কালী! এ যে মেঘ না চাইতে জল!'

বরুণ তখন প্রশান্ত চোখে বিপুলবপুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিপুলবপু চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'কিহে দীনু, আমাকে চিনতে পার?'

মৃদু হাসি হেসে বরুণ বললে, 'পুরোনো বন্ধুকে কি ভোলা যায়? তুমি হচ্ছ শ্রীহীন শঙ্করলাল। তুমি হচ্ছ সরকাররের ভক্ত প্রজা। সরকার হুকুম দিয়েছে তোমাকে দ্বীপান্তরে বাস করতে, তাই তুমি এসেছ এই বোর্নিয়ো দ্বীপে।'

হো হো করে হেসে উঠে শঙ্করলাল বললে, 'আমাকে ভোলোনি দেখে খুশি হলুম। কিন্তু সত্যি বলছি বাঙালিবাবু, প্রথমটা তুমি আমার চোখকেও ফাঁকি দিয়েছিলে। দিব্যি সেজেছ যাহোক, বলিহারি! আমি দীনুডাকাতকে ধরবার জন্যে আজ ফাঁদ পাতিনি! বোর্নিয়োর সামান্য একটা মাঝি আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করলে কেন, সেইটে বোঝবার জন্যেই তোমাকে আজ গ্রেপ্তার করেছি। তুচ্ছ একটা কেঁচো খুঁজতে গিয়ে আমি যে এমন-

একটা অজগর সাপ শিকার করতে পারব, একথা আগে কে জানত? খুব আমার বরাত-জোর, কি বলো?'

বরুণ বললে, 'হ্যাঁ, শঙ্করলাল, তোমার অদ্ভুত সৌভাগ্য দেখে আমারই মনে হিংসার উদয় হচ্ছে। নাকুর বদলে নরুণ পেলুম তাক-দুমা-দুম-দুম!'

—'আবার মসকরা করা হচ্ছে?'

—'ভায়া, পুরোনো স্যাঙাতের সঙ্গে মসকরা করাই তো উচিত। তুমিও তো আমার সঙ্গে আজ কম ঠাট্টাটা করনি।'

—'আমি আবার তোমার সঙ্গে কি ঠাট্টা করলুম?'

—'এই যে আজ আমাকে বনমুর্গীর ঝোল খেতে দিলে না, চুপিচুপি যমদূত পাঠিয়ে ধরে আনলে, এখন আবার আদর করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছ, এসব ঠাট্টা নয় তো কি বলব দাদা?'

—'তুই কি এসব ঠাট্টা বলে মনে করছিস?'

—'আরে আরে, এত তাড়াতাড়ি নিজের স্বভাবের পরিচয় দিতে শুরু করলে কেন?'

—'মানে?'

—'হচ্ছিল ভদ্রলোকের মতন কথা, হঠাৎ তুই মুই ধরলে কেন?'

—'তুই কি ভাবছিস, তোর সঙ্গে আমি আজ্ঞে, আপনি, হুজুর বলে কথা কইব?'

—'ঠিক দাদা, ঠিক! আমারই বোঝবার ভুল হয়েছে। তুমি যে বেশিক্ষণ ভদ্রলোকের মতন কথা কইতে পারবে না, এটা আমার জানা উচিত ছিল।'

—'আমাকে আবার ছোটোলোক বলে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে? তোর মুখে থুতু দিই'—বলেই শঙ্করলাল বরুণের মুখের উপরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলে সজোরে।

বরুণের মুখে কোনোরকম ভাবান্তর হল না। তেমনই হাসতে হাসতেই সে বললে, 'লোকের গায়ে থুতু দেয় শিশুরা। তোমাকেও আমি শিশু বলেই ক্ষমা করছি।'

—'আমাকে তুই ক্ষমা করবি? সিংহকে ক্ষমা করবে ভেড়ার বাচ্ছা? হাসালে দেখছি!'

—'হেসো না শঙ্করলাল, হেসো না। হাসি মানায় না তোমার চাঁদমুখে!'

শঙ্করলাল অবরুদ্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দ্যাখ দীনুডাকু, তোর হাসি-ঠাট্টা রেখে দে। জানিস আমি কে?'

—'আমার যম!'

হঠাৎ চিৎকার করে শঙ্করলাল বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই! তোর সামনে আমি মূর্তিমান যমই বটে! আজ আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হবে! তোকে বারবার ধরেছি, তুই বারবার আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিস! কিন্তু আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাঁকিয়ে তুই কখনোই পালাতে পারবি না—দুনিয়ার যেখানে যাবি, নলরাজার পিছনে শানর মতো আমি থাকব তোর পিছনে পিছনে। মা কালীর কৃপায় আজ আমার প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে! আজ তোর আসন্নকাল উপস্থিত, এখন হাসি-মসকরা ভুলে, হরিনাম কর!'

বরুণ বললে, 'তোমার সামনে কেমন করে হরিনাম করব শঙ্করলাল? তোমাকে দেখলেই হরিভক্তি উড়ে যায় যে!'

শঙ্করলাল হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'ফের ঠাট্টা? নাঃ, আর সহ্য হচ্ছে না! একটা হেস্তনেস্ত করেই ফেলি! ওরে, একে ধরে দাঁড় করিয়ে দে তো!'

দুজন লোক দুদিক থেকে ধরে বরুণকে তুলে মাটির উপরে দাঁড় করিয়ে দিলে।

শঙ্করলাল বললে, 'মা কালীর কাছে দুটো বলি নিবেদন করেছি। আজ হবে প্রথম নরবলি!'

বরুণ তখনও হাসছে। বললে, 'দ্বিতীয় নরটি কে শঙ্করলাল?'

—'পুলিশের প্রশান্ত চৌধুরী!'

—'তাকে বলি দিয়ে কি সুখ পাবে?'

—'তাকে বলি দেব না? সে ব্যাটা এখানেও এসেছে আমাকে ধরতে! হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! বড়ো বড়ো হোমরা-চোমরাদের গোঁফ কামিয়ে দিলুম, আর সেই ক্ষুদে-পিঁপড়ে চায় কিনা আমাকে কামড়াতে? তোর পরেই আসবে তার পালা!'

—'বেশ তো, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি আজকের পালাটা শেষ করে দাও না কেন?'

উৎকট আনন্দে অট্টহাসি হাসতে হাসতে শঙ্করলাল বললে, 'তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব? না, তাড়াতাড়ি আমি শেষ করব না! আমি তোকে মারব একটু একটু করে জিরিয়ে জিরিয়ে। তবেই তো খেলা জমবে ভালো!'

—'বেশ, তাহলে খেলাটা আরম্ভই করে দাও না!'

শঙ্করলাল আশ্চর্য হয়ে বললে, 'দীনু, এখনও তোর ভয় হচ্ছে না?'

এইবারে দীনু হাসলে হা হা অট্টহাসি। তারপর বললে, 'নির্বোধ, সামান্য পতঙ্গরা আগুনে পুড়ে মরতে ভয় পায় না, আর মানুষ হয়েও মরতে আমি ভয় পাব কেন? মরতে ভয় পায় অমানুষরা, মরতে ভয় পায় কাপুরুষরা, মরতে ভয় পাবে তোমরা! আমি মরব হাসিমুখে!'

শঙ্করলাল তীব্র কণ্ঠে বললে, 'দেখনা, তোর হাসিমুখকে আজ আমি কাঁদিয়ে ছাড়ি কিনা!'

—'বেশ, সেই চেষ্টা করে দেখো। আমি প্রস্তুত।'

শঙ্করলাল বললে, 'আমি তোকে কেমন করে মারব সেটাও শুনে রাখ। আমি প্রথমেই কেটে নেব তোর ডান হাতখানা।'

—'তারপর?'

—'তার পাঁচ মিনিট পরে তোর ডান আর বাঁ কান, তারপর তোর নাক।'

—'বলে যাও ভায়া, বলে যাও।'

—'তার পাঁচ মিনিট পরে তোর বাঁহাত যাবে উড়ে। এমনি ভাবেই থেমে থেমে একে একে তোর পা-দুখানা কেটে নিয়ে আমরা করব রক্তারক্তির খেলা। কিন্তু তোর মুণ্ডটা আমরা কাটব না।'

—'এতটা দয়া কেন?'

—'দয়া নয় রে হনুমান, দয়া নয়! মুণ্ড কাটলে তো তুই তখুনি মরে যাবি! তোর

হাত-পা কাটা দেহটা এইখানে পড়ে পড়ে তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দিতে দেখব সেই সুখের দৃশ্যটা। বুঝেছিস?'

—'বুঝেছি। তাহলে শুভকার্যটা আরম্ভ করে দাও।'

—'তোর আপত্তি নেই?'

—'একটুও না।'

—'তবু তুই হাসি থামাবি না? দেখি, আমি তোর হাসি থামাতে পারি কিনা।'

বরুণ এইবারে আরও জোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

শঙ্করলাল দুই চোখ পাকিয়ে কুস্তিগীরের মতন পাঁয়তারা কষতে কষতে বললে, 'আমার গা জ্বলে যাচ্ছে তোর হাসি দেখে—মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব—ভয় হচ্ছে রাগ সামলাতে না পেরে শেষটা হয়তো গলা টিপেই তোকে বধ করে ফেলব! ওরে, একজন প্যারাং নিয়ে এদিকে এগিয়ে আয় তো, আর দেরি নয়—কাজ আরম্ভ করে দে!'

আগেই বলা হয়েছে প্যারাং হচ্ছে একরকম বড়ো ছুরি। আসলে তাকে ছোটো তরবারি বলাও যায়।

প্যারাং নিয়ে একজন লোক বরুণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে শঙ্করলালের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবারে কি করব তুয়ান?'

—'ঘ্যাঁচ করে ওর ডান হাতখানা কেটে নে!'

ফুরুলো না তখনও বরুণের হাসির ফোয়ারা। ঘাতক শূন্যে তুলে ধরলে তার শাণিত অস্ত্র—

—এবং সেই মুহূর্তে গর্জন করে উঠল কার বন্দুক! বিকট আর্তনাদ করে ঘাতক লুটিয়ে পড়ল মাটির উপরে। দু-একবার কাটা-পাঁঠার মতন ছটফট করে তার দেহটা স্থির, আড়ষ্ট হয়ে গেল।

দ্বাদশ

বিভীষণের আবির্ভাব

এক লাফে ফিরে দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল দেখলে, পিছনকার একটা বড়ো ঝোপ ভেদ করে আবির্ভূত হয়েছে দশ-এগারোটা মনুষ্যমূর্তি! অসম্ভব বিস্ময়ে তার দুই চক্ষু হয়ে উঠল ছানাবড়ার মতো।

আগন্তুকদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করে বন্দুক। একজনের বন্দুকের নল থেকে তখনও ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল। প্রশান্ত। সে কঠিন স্বরে চিৎকার করে বললে, 'সকলেই মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো। কেউ একটু নড়লেই গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

শঙ্করলাল ও তার দলের প্রত্যেকেই উপলব্ধি করলে, এ কথাগুলো মিথ্যা শাসানি নয়। তারা মাথার উপরে হাত তুললে বিনাবাক্যব্যয়ে।

বরুণের মুখের হাসি তখনও অদৃশ্য হয়নি। সে বললে, 'আমাকে মাপ করবেন প্রশান্তবাবু! দেখতেই পাচ্ছেন, আমার দুটো হাতই বাঁধা?'

প্রশান্ত কোনও জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসলে। তারপর নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করলে। তারা সকলেই অগ্রসর হয়ে শঙ্করলাল ও তার দলের লোকদের পিছন দিকে গিয়ে বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর প্রশান্ত নিজে গিয়ে দাঁড়াল বরুণের সামনে। সহাস্যে বললে, 'আসুন বরুণবাবু, আগে আপনাকে বন্ধনমুক্ত করি।'

বরুণের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে সে বললে, 'এইবারে আমাকে দ্বিতীয় কর্তব্য পালন করতে হবে। ওহে, তোমাদের কেউ এগিয়ে গিয়ে এই হতভাগাদের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দাও তো।'

যখন তার কথামতো কাজ করা হল, তখন বরুণ বললে, 'প্রশান্তবাবু, এবারে আমার জীবন রক্ষা করে আপনি খুব তাড়াতাড়ি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করে ফেললেন দেখছি! অতঃপর আমার কি ব্যবস্থা করবেন? এক ঢিলেই দুই পাখি মারবেন নাকি?'

প্রশান্ত বললে, 'মানে?'

—'শঙ্করলালের সঙ্গে কি দীনুডাকাতকেও নিয়ে আপনি ভারতবর্ষের দিকে ধাবমান হতে চান?'

প্রশান্ত জিভ কেটে বললে, 'ছিঃ বরুণবাবু, শয়তানকে আপনি অতবেশি কালো করে আঁকতে চান কেন? আপনাকে গ্রেপ্তার করবার ওয়ারেন্ট আমার কাছে নেই। আমি অনধিকার চর্চা করব না।'

বরুণ বললে, 'শুনে আশ্বস্ত হলুম। আমি ভাবছিলুম, তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়লুম বুঝি? যাক, ও-দুশ্চিন্তা যখন দূর হল তখন আপনাকে দুএকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

—'জিজ্ঞাসা করুন।'

—'আপনি আজকের ঘটনাস্থলের সন্ধান পেলেন কেমন করে?'

—'সন্ধান আমি পাইনি, সন্ধান দিয়েছেন ভগবান!'

—'কি রকম?'

—'এই গোলকধাঁধার মতন বনের ভিতরে পথ হারিয়ে কাল থেকে আমরা অন্ধের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। ঘুরতে ঘুরতে দৈবগতিকেই এখানে এসে পড়েছি।'

—'বড়োই ভালো কাজ করেছেন মশাই, বড়োই ভালো কাজ করেছেন! আপনি দয়া করে পথ না হারালে এতক্ষণে হয়তো আমার আত্মার সঙ্গে দেহের কোনও সম্পর্কই থাকত না। পথ হারিয়ে আপনি যে শুধু আমারই প্রাণ রক্ষা করলেন তা নয়, সেই সঙ্গে নিজেরও কার্যোদ্ধার করবার মস্ত-এক সুযোগ পেয়ে গেলেন। আপনি পথ না হারালে শঙ্করলালকে আজ গ্রেপ্তার করতে পারতেন না।'

প্রশান্ত একগাল হেসে বললে, 'সবই ভগবানের দয়া বরুণবাবু! অসাধুকে শাস্তি দেওয়া আর সাধুকে রক্ষা করা হচ্ছে তাঁরই কাজ। কিন্তু শঙ্করলাল আপনাকে বন্দী করলে কি করে?'

—'যেভাবে বনের ভিতরে সে আপনাকে বন্দী করেছিল, ঠিক সেই ভাবেই।'

প্রশান্ত শিউরে উঠে বললে, 'বলেন কি? কোথায় সেই ভয়ঙ্কর শত্রু?'

—'জানি না।'

—'আপনি তাকে দেখেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কে সে?'

—'শঙ্করলালকেই জিজ্ঞাসা করুন না!'

প্রশান্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'এই শঙ্করলাল! কাকে লেলিয়ে দিয়ে তুই বরুণবাবুকে ধরে এনেছিস?'

শঙ্করলাল তখন একটা হেলেপড়া গাছের গুড়ির উপরে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। প্রশান্তের কথায় সে জবাব দিলে না। নিজের মনেই হঠাৎ শিস দিতে শুরু করলে।

প্রশান্ত রুক্ষ স্বরে বললে, 'হঠাৎ তোর শিস দেবার শখ হল কেন রে? এইবারে গান-টান ধরবি নাকি?'

—'তা ধরতে পারি বইকি!'

—'হাতকড়ি পরে তোর শিস দেবার ইচ্ছেও হচ্ছে?'

—'কেন হবে না?'

—'আজ বুঝি তোর ভারি আনন্দের দিন?'

—'মরতে বসে দীনু যখন হাসতে পারে, হাতকড়ি পরে আমিও-বা শিস দিতে পারব না কেন?'

—'ও, আমাদের সামনে বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে? বরুণবাবুকে তুই নিজের সমকক্ষ বলে মনে করিস নাকি?'

শঙ্করলাল সে প্রশ্ন যেন কানেই তুললে না। নিজের মনেই শিস দিতে লাগল। তার শিসের আওয়াজ ক্রমেই হয়ে উঠল উচ্চতর।

বরুণ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'প্রশান্তবাবু, এখনি ওর শিস বন্ধ করবার ব্যবস্থা করুন!'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আমার মনে হচ্ছে, ও শিস দিচ্ছে বিশেষ কোনও কারণে।'

—'মানে?'

—'ওর শিস হয়তো সঙ্কেতধ্বনি।'

উত্তরে প্রশান্ত কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আবার উপর-উপরি দুইবার বন্দুকের শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল এবং পরমুহূর্তেই একটা অতিকায় কৃষ্ণবর্ণ জীব উপর থেকে বিষম শব্দে মাটির উপরে পড়ে কাঁপিয়ে তুললে পৃথিবীর বুক!

বরুণ বিদ্যুতের মতন হাত চালিয়ে স্তম্ভিত প্রশান্তের কাছ থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিলে এবং সেই বিপুলকায় দানবের মতন জীবটা নিজেকে সামলে নেবার আগেই তার দিকে করলে দুই-দুইবার বুলেট-বৃষ্টি!

সেই বিভীষণ জীবটা বিকট স্বরে আর্তনাদ করে একবার উঠে বসেই সুদীর্ঘ দুই বাহু দুইদিকে ছড়িয়ে আবার মাটির উপরে আছড়ে পড়ল—তার একখানা বিস্তৃত হাত

গিয়ে ধরলে শঙ্করলালের দেহখানা এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেখা গেল, শঙ্করলালের দেহটা শূন্যে উঠেই আবার এসে পড়ল মাটির উপরে সশব্দে!

শঙ্করলাল একবার চিৎকারও করলে না, তালগোল পাকিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে রইল!

কয়েক মুহূর্ত সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিতের মতো।

তারপর প্রথমে কথা কইলে বরুণ। বললে, 'প্রশান্তবাবু, ওই জীবটাই আমাদের বন্দী করেছিল!'

—'ও যে দেখছি প্রকাণ্ড একটা ওরাং-উটান।'

—'হ্যাঁ, একটা পোষমানা, শিক্ষিত ওরাং-উটান! এই বোর্নিয়ো হচ্ছে ওরাংদের স্বদেশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শঙ্করলাল শিস দিয়ে একেই আহ্বান করছিল।'

—'কিন্তু দু'দুবার বন্দুক ছুড়ে উপর থেকে ওকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে কে?'

—'এখন সেইটেই তো হচ্ছে প্রশ্ন!'

পিছন থেকে শোনা গেল : 'সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি আমি!'

বরুণ ও প্রশান্ত ফিরে দেখলে, বন্দুক হাতে করে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অরুণ!

অরুণ বললে, 'বরুণকে খুঁজতে খুঁজতে আমি এখানে এসেই দেখি, ওই ভীষণ ওরাংটা খুব সন্তর্পণে আর নিঃশব্দে গাছের উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে। দেখেই আমি একেবারে বন্দুকের দুটো নলই খালি করে দিয়েছি।'

বরুণ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'ভ্যালা মোর ভাই, আচ্ছা মদ্দ! তুমি এসে না পড়লে আমাদের পটোল তোলা ছাড়া আর কিছুই করবার উপায় ছিল না! একেই বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

অরুণ বললে, 'কিন্তু যদিও আমি এস-এস-জি মার্কা গুলি ছুড়েছি, তবু আমার হচ্ছে পাখিমারা বন্দুক, ওরাং গাছ থেকে পড়ে গিয়েও মরেনি, তাকে বধ করেছে বন্ধুবর বরুণই।'

বরুণ মাথা নেড়ে বললে, 'না ভাই অরুণ, ওরাং-বধের জন্যে বাহাদুরি নিতে পারো তুমিই। কারণ তুমি ওটাকে গাছ থেকে পেড়ে কাবু না করে ফেললে আমি বন্দুক ছোড়বার ফুরসৎই পেতুম না।'

প্রশান্ত বন্দুকে আবার টোটা ভরে ওরাংকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়বার চেষ্টা করছে দেখে বরুণ হেসে বললে, 'মড়ার ওপরে আবার খাঁড়ার ঘা কেন প্রশান্তবাবু? নিজের প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে ওরাং করেছে মহাপ্রস্থান! শঙ্করলাল এবার সত্যিসত্যিই আপনাকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে পেরেছে! তা যাক, শঙ্করলালের জন্যে আমরা কেউই বোধহয় অশ্রু বিসর্জন করব না। কি বলেন?'

প্রশান্ত বললে, 'সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, পোষমানা ওরাং তার প্রভুকেই বধ করলে কেন?'

—'মৃত্যু-যন্ত্রণায় অন্ধের মতো হয়ে সে হাতের কাছে যাকে পেয়েছে, তাকেই তুলে আছাড় মেরেছে।'

প্রভাত
রক্তমাখা

প্রথম

হাওয়া খাওয়ার মানে দুধের সর খাওয়া

প্রস্তাবটা আমাদের নয়।

ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু সারা বছর গাধার খাটুনি (বাপ রে, উপমাটা আমাদের নয়, তাঁর নিজেরই) খাটবার পর একমাস ছুটির এক হুকুমনামা হস্তগত করেছেন। তিনি এই দুর্লভ ছুটিটার সদ্ব্যবহার করতে চান। অতএব এসে প্রস্তাব বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি কলকাতার বাইরে দৌড় মেরে একমাস ধরে হাওয়া খাবার চেষ্টা করি, তাহলে তোমরাও কি আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবে?'

আমি বললুম, 'আমার আপত্তি নেই। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করুন ওর কী মত?'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর মতন পেশাদার গোয়েন্দা যখন বায়ু ভক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত, তখন আমার মতো শৌখীন গোয়েন্দাই বা অপ্রস্তুত হবে কেন?'

সুন্দরবাবু প্রীত হয়ে বললেন, 'হুম্! তাহলে প্রস্তুত হও। আগামী পরশুই আমরা যাত্রা করব।'

—'কিন্তু কোথায়? যেখানে-সেখানে নাকি?'

—'পাগল না মাথা খারাপ! পুরীতে।'

—'তথাস্তু।'

পুরীর সমুদ্রের ধারে সুন্দরবাবুর এক বন্ধুর চমৎকার একখানি বাড়ি ছিল, আজ সাত দিন সেইখানেই বাসা বেঁধে লবণাক্ত বায়ু ভক্ষণ ও দিগন্তব্যাপ্ত সমুদ্র-নীলিমা দর্শন করছি।

ঘরমুখো হয়েও বাঙালি অকবি ও সুকবিরা হাতের কাছে তাণ্ডবমত্ত, মন্দ্রমুখর ও দিগন্তব্যাপ্ত সমুদ্রকে পেলেই উচ্ছ্বসিত প্রাণে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্য ও গদ্য লিখে ফেলেছেন। কাজেই আমি আর সেই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটব না। সেখানে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রাতেও তেমন কিছু নূতনত্ব ছিল না। সামান্য যেটুকু ছিল এখানে তার অল্পস্বল্প নমুনা দেওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যখন—রাত্রি এসে মিশতে চায় দিনের পারাবারে—জয়ন্ত তখনই সাজপোশাক পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত প্রাতঃকালীন ভ্রমণে। আমি তার স্বভাব জানতুম, কাজেই ডাকাডাকি করবার আগেই উঠে প্রস্তুত হয়ে থাকতুম।

কিন্তু ভারি ঝামেলা পোয়াতে হত সুন্দরবাবুকে নিয়ে। তাঁকে জাগ্রত করবার জন্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের মতো অসাধারণ আয়োজন করতে হত। তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে উচ্চরবে যে অদ্ভুত তন্দ্রাবন্দনার মন্ত্রধ্বনি নির্গত হত অনর্গল, আমাদের তুচ্ছ ডাকাডাকি বা চেঁচামেচি তা কিছুমাত্র আমলে আনত না। ধাক্কা মারলে তিনি 'উঃ', 'আঃ' প্রভৃতি শব্দ

উচ্চারণ করে এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুতেন এবং তাঁর বিরক্ত নাসিকা তখন আরও জোরে করতে থাকত তর্জন-গর্জন।

অবশেষে তাঁর চ্যাটালো পৃষ্ঠদেশে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করলে তাঁর নাসিকার সঙ্গীতসাধনা বন্ধ হত বটে, কিন্তু তবু তিনি নিদ্রাদেবীর আঁচল ছাড়তে চাইতেন না। তখন বাধ্য হয়েই প্রয়োগ করতে হত অব্যর্থ ঘুমতাড়ানিয়া ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ এক বা একাধিক ঘটি কনকনে ঠাণ্ডা জল!

এক-একদিন তিনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে উত্তপ্ত বাক্য-উদ্গার করতেন, 'বেরোও তোমরা—দূর হও, চুলোয় যাও! আমি বেড়াতে যাব না—রাত্রির এই অন্ধকারে উন্মত্ত ছাড়া কেউ হাওয়া খেতে যায়?'

আমি হয়তো বলতুম, 'রাত্রি নয়, দাদা—এটা হচ্ছে উষাকাল। এই সময়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হাওয়া খাওয়ার মানে দুধ থেকে সরটুকু তুলে নিয়ে টুক করে খেয়ে ফেলা।'

জয়ন্তও বেশ গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে উঠত, 'চলো হে মানিক, আজ আমরা দুই বন্ধুতেই দুধের সরের সঙ্গে তুলনীয় প্রাতঃসমীরণ ভক্ষণ করি গে—দরকার নেই বেতো, গেঁতো, ঘুম-কাতুরে বুড়ো সুন্দরবাবুকে।'

কিন্তু তারপর আমরা দুই বন্ধু বাইরের দিকে পদচালনা করতে না করতেই সুন্দরবাবু শশব্যস্ত হয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেন, বলে উঠতেন, 'দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও! অতটা মেজাজ না দেখালেও চলবে! হুম্, নিজের হাতে যখন খাল কেটে কুমির এনেছি, তখন আর উপায় কী? মরি বাঁচি—তোমাদের সঙ্গে যেতেই হবে!'

তারপর বেড়াতে বেরুনো। সমুদ্র ধারে তখন আলো-আঁধারির ফিনফিনে পর্দা ছিঁড়ে চোখ চালালেই আবছা-আবছা খানিক দেখা যায় এবং অনেকটাই দেখা যায় না। সে এক অভাবিত, অদ্ভুত দৃশ্য। দিকচক্রবাল জুড়ে বিরাজ করছে যেন কোনো বিশ্বব্যাপী হিংস্র, ক্ষুধার্ত ও মহাকায় দানব,—সে যেন গোটা পৃথিবীটাই এক গ্রাসে উদরস্থ করতে চায় এবং কণ্ঠে তার শত শত বজ্রের গর্জনে বারংবার ফুটে ফুটে ওঠে কী এক অজানা নিষ্ঠুর বুভুক্ষার বীভৎস প্রলাপ! আতঙ্কে বুক কাঁপে, সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে ওঠে।

সর্বোপরি আর একটা ব্যাপার অনুভব করা যায়। এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির জগতে আর সব ছাড়িয়ে বেজে বেজে ওঠে যেন এক মহা অমঙ্গলের ভয়াবহ মৌন সঙ্গীত—অশ্রান্ত তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে সে যেন সর্বদাই কানে কানে বলতে চায়—সর্বনাশ করব, সর্বনাশ করব, আমি তোমার সর্বনাশ করব!

সুন্দরবাবু খুঁতখুঁত করেন, বলেন, 'তোমরা ভালো করে আলো ফোটবার আগে বেরিয়ে পড়ো কেন বলো দেখি? আমার একটুও ভালো লাগে না। গা ছমছম করে, মনও ভয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে।'

এমনই কাণ্ড প্রায় প্রত্যহই। আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়

রক্তাক্ত প্রভাত

তখন নীলসায়রের আলোর শতদল তার পাপড়িগুলি মেলিয়ে দিয়েছে, চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে।

সমুদ্রসৈকতের বালুকাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত বললে, দেখ মানিক, সমুদ্রতীরের বালুতটের দিকে ভালো করে তাকালে দেখতে পাবে শত শত পদচিহ্নের কত বিচিত্র কাহিনী! শিশু, বালক, যুবা, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষেরা পদচিহ্নে পদচিহ্নে তাদের, আত্মকাহিনী রচনা করে চোখের সামনে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে। তাদের কেউ ছুটেছে, কেউ সাবধানে সন্তর্পণে পা ফেলেছে, কেউ লাফালাফি করেছে, কেউ আছাড় খেয়েছে, কেউ বা মনের আনন্দে বালির উপরে গড়াগড়ি দিয়েছে, আবার একাধিক ব্যক্তি করেছে পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ! এসব তো খুব সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নবিশারদরা পায়ের ছাপ দেখে অনায়াসেই ব'লে দিতে পারেন কেউ রোগা না মোটা, তার আন্দাজি বয়স, সে কেন দৌড়েছে বা দাঁড়িয়েছে বা বসে পড়েছে—এমনই আরও অনেক কথা। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর আফ্রিকার বুনো আদিবাসীরা এ বিষয়ে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়ে বিখ্যাত হয়েছে। নাগরিক সভ্য ও শিক্ষিত গোয়েন্দারা বহু চেষ্টা করেও তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। এখনও অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যপ্রদেশে তাই পলাতক অপরাধীদের সন্ধান ও গ্রেপ্তার করবার জন্যে নিয়মিত মাহিনা দিয়ে সরকার থেকে সেইসব পদচিহ্নবিশারদ আদিবাসীদের নিযুক্ত করা হয়।'

সুন্দরবাবু বিকৃত মুখে বললেন, 'গোয়েন্দার পেশা কিছুদিনের জন্যে ভুলব বলেই ছুটিতে পুরীর সমুদ্রতীরে ছুটে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু এখানে এসেও কি তোমরা গোয়েন্দা আর অপরাধীদের নিয়ে সেই পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে আমায় জ্বালিয়ে মারবে? এইজন্যেই তো বলে থাকে—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে! থো কর বাবা, ওসব কথা থো কর!'

আমি বললুম, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই। বন্ধুবর জয়ন্ত আজ অন্তত পদচিহ্ন নিয়ে কোনো মৌলিক গবেষণা করতে পারবে না।'

—'কেন পারবে না?'

—'সমুদ্রতীরে কোনও পদচিহ্নই নেই। কাল রাত্রে অত যে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল—সে কথা ভুলে গেলেন নাকি? রাত তিনটে সাড়ে তিনটের আগে ঝড়-জল থামেনি। সমুদ্রতীরে সমস্ত পায়ের দাগ নিশ্চয়ই ধুয়ে-মুছে গেছে।'

—'বাঁচা গেল বাবা!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'মোটেই বাঁচলেন না সুন্দরবাবু! বালির উপরে ওই দেখুন পদচিহ্ন! মানিক, তুমিও দেখ।'

তখন ভোরের কাঁচা আলো চিরমুখর সফেন তরঙ্গভঙ্গের উপরে ঝলমল করছে।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি আমাদেরও আগে—অন্তত ভোর পাঁচটার সময়ও লোকে সমুদ্রতীরে বেড়াতে আসে! আর একজন নয়, আর-একজনেরও পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে যে! প্রথম পদচিহ্নগুলো বালির উপরে গভীর ভাবে বসে গিয়েছে—নিশ্চয়ই কোনও হৃষ্টপুষ্ট ভারি ওজনের লোকের পায়ের ছাপ। লক্ষ্য করে দেখ, মানিক—দ্বিতীয় ব্যক্তির পদচিহ্ন অপেক্ষাকৃত অগভীর। দেখে মনে হয় সে রোগা আর মাথায় খাটো। আরও সন্দেহ হয়, সে খুব আলতো ভাবে পা ফেলে সন্তর্পণে প্রথম ব্যক্তির পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কেন?'

পদচিহ্নগুলো ধরে তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়েই জয়ন্ত আবার বললে, 'প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ব্যক্তি এই পর্যন্ত এসেই আর এগুতে পারেনি, ধড়াস করে বালির উপরে আছাড় খেয়ে পড়েছে। এই দেখুন সুন্দরবাবু, বালির উপরে একটা মানুষের দেহের ছাপ। সে আর উঠে দাঁড়ায়নি, কারণ তার পদচিহ্ন আর চোখে পড়ে না—কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নগুলো বরাবর সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছে—আর সেই সঙ্গে বালির উপরে পড়েছে, একটা ভারি মোট বা দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। তাই তো, ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে!'

এতক্ষণ জয়ন্তের চক্ষু বালির উপরেই নিবদ্ধ ছিল। এইবারে সে সোজা হয়ে সমুদ্রের দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেই সচমকে বলে উঠল, 'দেখুন সুন্দরবাবু, দেখুন, দেখুন! মাণিক, দেখ—জলের কাছ-বরাবর একটা মানুষের দেহ পড়ে আছে না?'

সুন্দরবাবু সেদিকে না তাকিয়েই নির্বিকারের মতো বললেন, 'বোধহয় কেউ আরাম করে বালির বিছানায় শুয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'বাড়িতে নিজের বিছানাতেও অমন অস্বাভাবিক ভাবে হাত-পা দু-দিকে ছড়িয়ে কেউ শুয়ে থাকে না। তারপর দেখছেন, ওর মাথা দিয়ে এখনও হু-হু করে রাঙা রক্তের মতো কি যেন বেরিয়ে আসছে?'

সুন্দরবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'হুম্! আমি কিছুই দেখব না—আমি কিছুই দেখতে চাই না। এ মামলা আমার ঘাড়ে চাপবে না—এ হচ্ছে দস্তুরমতো উড়িষ্যা। সত্যি ভাই জয়ন্ত, তুমি দয়া করে ফিরে চলো—উড়িয়া পুলিস তাদের মামলা নিয়ে যত খুশি মাথা ঘামিয়ে মরুক, আমরা এখানে এসেছি খালি ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে। তা ছাড়া আমি আর কিছুই করব না। তুমি মাথা খুঁড়লেও নয়!'

কিন্তু জয়ন্ত তো পেশাদার পুলিস নয়—তার মাথার টনক নড়েছে, জাগ্রত হয়েছে তার আগ্রহ ও কৌতূহল! সুন্দরবাবুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল ভূপতিত নরদেহের দিকে।

আমিও এগিয়ে গেলুম।

একটা মোটাসোটা লম্বাচওড়া দেহ পড়ে রয়েছে জলের ধারবরাবর বালির উপরে উপুড় হয়ে এবং তার মাথার পিছন দিকে একটা বৃহৎ ও ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন—মস্তকের অনেকখানি অংশ যেন উড়ে গিয়েছে এবং দরদর ধারে নির্গত হচ্ছে রক্তের ধারা। দেখলে বুক শিউরে ওঠে।

জয়ন্ত নিজের মনেই বলে উঠল, 'বালির উপরে সন্তর্পণে পা ফেলে আসছিল যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, চুপিচুপি এসে পিছন থেকে নিশ্চয় সে গুলি ছুড়েছে। তারপর প্রথম ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ বালিতে আছড়ে পড়তে সেটাকে টানতে টানতে সে সমুদ্রে বিসর্জন দেবার জন্যে নিয়ে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ এইখানেই লাশ ফেলে গা-ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কেন?'

তারপর বালির উপর পদচিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে আবার জয়ন্ত বললে, 'রহস্যটা যেন বুঝতে পারছি। এখান থেকে ফিরতি পদচিহ্নগুলো হঠাৎ লাশটা ফেলে খানিকটা দৌড়ে গিয়েই আবার থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর হনহন করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আর দৌড়োয় নি। মানিক, পদচিহ্নগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে তুমিও সব বুঝতে পারবে। কিন্তু খুনি হঠাৎ লাশ ফেলে দৌড় মেরেছিল কেন? খুব সম্ভব অন্য কারুর সাড়া পেয়েছিল।'

আমি বললুম, 'জয়ন্ত, লাশের ভয়ানক ক্ষতচিহ্নটা তুমি ভালো করে দেখেছ কি?'

—'দেখেছি। অসাধারণ ক্ষতচিহ্ন আর তার মূলে আছে কোনও অসাধারণ অস্ত্র।'

সুন্দরবাবু রাগে ভারি গলায় বললেন, 'ভেবেছিলুম মুখ খুলব না, কিন্তু তোমাদের এই সব ছেলেমানুষি কথা শুনে মুখ না খুলে আর করি কি?'

—'আপনি মুখ খুলে কী বলতে চান?'

—'খুব কাছ থেকে কেউ ছররা-ভরা বন্দুক ছুড়লেও এমনই ভয়ঙ্কর ক্ষত হওয়া অসম্ভব নয়।'

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, 'সম্ভব-অসম্ভবের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু মনে রাখবেন কোন সময়ে এই খুনটা হয়েছে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। সে সময়ে সমুদ্রতীরে কারুর উপস্থিতি সম্ভবপর নয়। লাশের জামা-কাপড়ও শুকনো। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়—মৃত ভদ্রলোক নিশ্চয়ই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ধরুন, ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা, কেননা—লাশের ক্ষতস্থানের রক্ত এখনও বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ খুন হয়েছে অল্প খানিকক্ষণ আগেই। ভোরবেলায় সমুদ্রের ধারে কিছু লোক চলাচল হতে পারেই। এ সময়ে একটা বন্দুক ঘাড়ে করে বাইরে বেরুবে, কোনও অপরাধীই এতটা নির্বোধ নয়।'

—'তাহলে তোমার মতে খুনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে?'

আমি বললুম, 'রিভলবার।'

জয়ন্ত বললে, 'হতে পারে।'

—'হতে পারে কেন? তুমিও তাহলে নিশ্চিন্ত নও?'

—'আমি নিশ্চিন্ত।'

—'মাথার অতখানি অংশ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে, এমন শক্তিশালী রিভলবার আমি দেখিনি।'

—'আমি দেখেছি।'

—'তুমি দেখেছ?'

—'357 ক্যালিবারের ম্যাগনাম রিভলবারের নাম আপনি শুনেছেন?'

—'উহুঁ।'

—'আমি এক সাহেবের কাছে দেখেছিলুম। তার চেয়ে শক্তিশালী রিভলবার পৃথিবীতে আর নেই। তার গুলি ছোটে ২৭০০ গজ পর্যন্ত। তার গুলি ইটের দেওয়ালও ভেদ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এমন ভয়াবহ অস্ত্র এদেশি অপরাধীদের হাতে আসবে কেমন করে?'

—'হুম্, তোমার ম্যাগনাম রিভলবারের প্রতাপ শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে!'

আমি সুন্দরবাবুকে একটু ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'আক্কেল গুড়ুমের কথা কী ভাবছেন দাদা, একবার টাক-গুড়ুমের কথাটা ভাবুন দেখি!'

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'টাক-গুড়ুম? টাক-গুড়ুম আবার কী দ্রব্য?'

—'টাক-গুড়ুম কী দ্রব্য জানেন না? মনে করুন সেই ম্যাগনাম রিভলবারের একটা গুলি মহাশয়ের মাথাজোড়া ওই টাকের উপরে যদি ছিটকে এসে পড়ে, তাহলে ওই বিরাট টাকের সামান্য একটি টুকরোও কি আর পারবে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে?'

বলেই আমি চট করে পাশের দিকে ঝাঁপ খেলুম, কারণ সুন্দরবাবু হঠাৎ সগর্জনে 'মানিক!' বলে চেঁচিয়ে এবং দুই হাতে দুই ঘুষি পাকিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

জয়ন্ত হাত তুলে বললে, 'শান্ত হোন সুন্দরবাবু, আমার অনুমান সত্য নাও হতে পারে।'

সুন্দরবাবু রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, 'চুলোয় যাক তোমার অনুমান। যখন-তখন ওই হনুমান মানিকের মুখনাড়া আর আমি সহ্য করব না, করতে পারব না। ওই পাজির-পা-ঝাড়া লক্ষ্মীছাড়াকে আমি খুন করে ফেলব!'

আমি বললুম, 'হা ভগবান, শেষটা কি গোয়েন্দারাজ সুন্দরবাবু আসামি ধরা পেশা ছেড়ে দিয়ে নিজেই খুনি আসামি হবার চেষ্টা করবেন?'

জয়ন্ত বললে, 'স্তব্ধ হও মানিক! অসময়ে রসিকতা ভালো লাগে না। এখানে এখনই একটা নৃশংস নরহত্যা হয়ে গেছে—চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে আসামির টাটকা পদচিহ্ন। অবহেলা বা বিলম্ব করলে শত শত লোকের অসংখ্য পদচিহ্নের চাপে সমস্ত প্রমাণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি দেখা যাক, আসামির পদচিহ্নগুলো কোন দিকে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে।'

তৃতীয়

নুলিয়াদের কাহিনী

বিস্তৃত বালুতটের তলার দিকে নীল সমুদ্রের ফেনিল লাফালাফি এবং উপর দিকে একটি সংকীর্ণ পথের রেখা।

সেই পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে পদচিহ্নগুলো। কিন্তু তার অনুসরণ করে চোখ তুলতেই দেখা গেল, পথের উপরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন প্রায়-নগ্ন জেলে—এদেশে যাদের বলে 'নুলিয়া'।

নুলিয়াদের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বললে, 'তোমরা এখানে অমন ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে কেন?'

—'পুলিসের জন্যে!'

—'পুলিসের জন্যে?'

—'হ্যাঁ। এখানে খুন হয়েছে।'

—'পুলিসে কোনও খবর দিয়েছ তোমরা?'

—'খবর দেবার জন্যে আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিয়েই তবে আমরা অপেক্ষা করছি।'

—'লাশ দেখেছ?'

—'এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। ভয়ে আমরা লাশের কাছে যাইনি।'

—'কারুকে দেখেছ এখানে? মানে কোনও মানুষকে?'

—'হ্যাঁ হুজুর, একটি বাবুকে দেখেছি।'

—'মাথায় খাটো, রোগা?'

—'হ্যাঁ। ছোটো-খাটো, রোগা চেহারা।'

—'গায়ের রং?'

—'কালো।'

—'বয়স?'

—'বলতে পারি না। বাবুর মুখ ততটা বুড়োটে নয়, তবে মাথার চুল আর গোঁফ দেখলে মনে হয় বুড়ো।'

—'গোঁফ আর মাথার চুল পাকা বুঝি?'

—'একেবারে পাকা।'

—'দাড়ি নেই?'

—'না, বাবুজি।'

—'পোশাক?'

—'কালো রঙের পাঞ্জাবি আর পা-জামা।'

—'আচ্ছা, এইবারে তোমরা লাশটা কী ভাবে এসে দেখলে সেকথা বলো।'

—'আমরা পাঁচজনে খুব ভোরে রোজ যেমন বেরুই আজকেও তেমনি কাজে বেরিয়েছিলুম। তখনও চারিদিক ভালো করে ফরসা হয়নি, খানিক তফাতে নজর চলে না। আমরা ক-জন গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে আসছিলুম। হঠাৎ যেন মনে হল, একটু দূরে কে একজন ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরই দেখি, সে তাড়াতাড়ি হন হন করে পা চালিয়ে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'একটু থামো। একটা কথা জানতে চাই!'

—'কী কথা?'

—'বন্দুকের শব্দ শুনেছ কেউ?'

—'না শুনিনি তো!'

—'ভালো করে ভেবে দেখো।'

—'উঁহুঁ, কিছুই শুনিনি।'

—'লোকটির হাতে বন্দুক-টন্দুক কিছু দেখেছিলে?'

—'না।'

—'কিন্তু বন্দুকের শব্দ নিশ্চয়ই হয়েছিল।'

—'তাহলে দূর থেকে আমরা শুনতে পাইনি। হুজুর, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সুমুদ্দুর এখানে গুড়ুম গুড়ুম করে সর্বদাই যে-রকম কামান দাগছে, তাতে কোনও বন্দুকের শব্দ তার ভেতর শোনা যাবে না!'

—'তা বটে। আচ্ছা, তারপর কী হল, বলো।'

—'এক ভদ্রলোক যেন ভয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—বাপরে, একটা লোক এখানে খুন হয়েছে।

'খুন! কোথায় খুন হয়েছে—কে খুন হয়েছে?

'কে খুন হয়েছে জানি না, কিন্তু তার লাশ ওইখানে পড়ে রয়েছে। উঃ, সে কি দৃশ্য!

'আমরা ভালো করে দেখলুম, একটা মানুষের দেহ বালির উপরে পড়ে রয়েছে বটে।

'ভদ্রলোক তখন বললেন—তোমাদের মধ্যে চারজন এইখানে পুলিস না আসা পর্যন্ত লাশ আগলে দাঁড়িয়ে থাকো—নইলে বিপদে পড়বে। আর একজন ছুটে গিয়ে থানায় খবর দাও।

'আমি বললুম, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, থানায় গিয়ে খবরটা আপনিই দিন না!

'বাবু আঁৎকে উঠে বললেন—ও বাবা, যা দেখেছি তাইতেই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেছে, তার ওপরে আবার ওই নিয়ে থানায় ছুটোছুটি আমার সহ্য হবে না—দেখছ না, আমি বুড়োসুড়ো মানুষ! এই বলে আঙুল তুলে দেখালেন নিজের মুখের পাকা গোঁফ আর মাথার পাকা চুল। তারপরই—আমাদের আর কিছু বলবার ফাঁক না দিয়েই তাড়াতাড়ি—প্রায় একরকম দৌড়েই ওইদিকে কোথায় যেন চলে গেলেন।'

জয়ন্ত বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে বালুতটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখছি বাবুটি পথের ওপরে ওঠেনি, বালির ওপর দিয়েই হেঁটে গিয়েছে।'

—'হ্যাঁ হুজুর। বোধহয় তাঁর সামনের দিকে পথ জুড়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম, তাই।'

—'আচ্ছা, লক্ষ্য করে দেখেছ কি বাবুটির জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল কিনা?'

—'একে অল্প আলো, তায় বাবুটির জামা-পায়জামা কালো রঙের। রক্তের দাগ থাকলেও সহজে ধরা যায় না। তবে আপনি বললেন বলে খন মনে হচ্ছে, বাবুর জামার হাতা আর তলার দিক ভেজা-ভেজা ছিল।'

আমার দিকে ফিরে জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'খুনি কী-রকম চালাক লোক, বুঝেছ? সে কালো রঙের পোশাক পরে এসেছিল। তার ফলে একসঙ্গে দুই উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছে। প্রথম, আবছা আলো বা প্রায় অন্ধকারে কারুর চক্ষু সহজে তাকে আবিষ্কার করতে পারবে না। দ্বিতীয়, কালো জামায় রক্ত লাগলেও হঠাৎ কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। জামা ভিজে হলেও হতে পারে—সমুদ্রের তীর, জলে ভিজে গেছে। সতর্ক হয়েও কিন্তু তবু সে কিছু কিছু বোকামি করে ফেলেছে।'

—'কী রকম?'

—'সব বলবার সময় নেই। একটা বোকামি হচ্ছে, এখানে এসে উপরের রাস্তায় না উঠে, বালির উপরে পায়ের দাগ এঁকে সে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, তার গন্তব্যস্থল কোন দিকে। এস, আমরা সেই বোকামির সুযোগ গ্রহণ করি।'

আচম্বিতে সুন্দরবাবু আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল!'

—'তার মানে?'

—'আর আমাদের পরের চরকায় তেল দিতে হবে না!'

পায়ের দাগ থেকে চোখ তুলে এবার জয়ন্তও শুধোলে, 'আপনার এতটা বিকট আনন্দের কারণ কী সুন্দরবাবু?'

—'তারা এসে পড়েছে।'

—'তারা? কারা?'

—'উড়িয়া পুলিসবাহিনী।'

—'তাতে হয়েছে কী? আমরা তো তাদের কাজে বাধা দিচ্ছি না। এসো মানিক, আমরা নিজেদের কাজ করি।'

—'যেয়ো না জয়ন্ত, যেয়ো না! আমার সঙ্গে এতদিন ঘর করেও দেখছি পুলিসকে তোমরা আজও ভালো করে চেনোনি। এসব হাঙ্গামা একটু আগেই চুকিয়ে দিয়ে পালাতে যখন পারোনি, পুলিস এখন আর তোমাদের অকুস্থল থেকে এক পা নড়তে দেবে না!'

তখন সমুদ্রতীরে বায়ুভক্ষক ও স্নানার্থীর দল বেড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। সুন্দরবাবুর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে জয়ন্ত ও আমি চেষ্টা করলুম তাদের দলে মিশে যেতে।

পথের উপর দিয়ে আসছিল আট-দশজন পুলিসের লোক। পিছনে পিছনে ভয়ে ভয়ে দু-জন নুলিয়া।

জয়ন্তের সঙ্গে আমি কয়েক পা এগুতে না এগুতেই ইনস্পেক্টারের পোশাক পরা এক ব্যক্তি চড়া গলায় কড়া স্বরে হুকুম দিলে, 'কোথা যাও? দাঁড়াও!'

অগত্যা আমাদের গতি রুদ্ধ হল। সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তাঁর মুখ বেশ প্রফুল্ল।

চতুর্থ

তুড়ির তালে ভৈরবী রাগিণী

ইনস্পেক্টার কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'কে তোমরা?'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি ইনস্পেক্টারের দিকে এগিয়ে চাপা গলায় কী সব বলতে লাগলেন। বোধহয় নিজের ও আমাদের পরিচয় দিলেন—কারণ সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেক্টারের মৌখিক ভাবের বড়ো একটা পরিবর্তন হল।

তিনি দুহাত তুলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে, বিনীত ভাবে মোলায়েম স্বরে বললেন, 'এ মামলায় আপনাদের মতো লোকের সাহায্য পাব,—এ আমার সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য! তারপর? আপনারা কী কোনও বিশেষ সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন এই হত্যাকাণ্ডের?'

জয়ন্ত অল্প কথায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করলে।

—'যা বললেন তা তো ভয়ানক কথা! দাঁড়ান, আগে স্বচক্ষে লাশটা দেখি।'

জয়ন্ত বললে, 'তারও আগে একটা কাজ করলে ভালো হয়। ক্রমেই ভিড় জমতে শুরু হয়েছে, পায়ের দাগগুলো রক্ষা করতে না পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

—'ঠিক বলেছেন। দাঁড়ান, আগে সেই ব্যবস্থাই করি।'

ফিরে এসে ইনস্পেক্টার বললেন, 'এইবারে চলুন, লাশটাকে পরীক্ষা করা যাক। হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনারা কেউ লাশটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেননি তো?'

সুন্দরবাবু উত্তপ্ত স্বরে বললেন, 'মশাই, ভেবেছেন কি? আমরা কলকাতা পুলিসের লোক কি নিরেট বোকা? আমরা কি জানি না, এ হচ্ছে আপনাদের মামলা, লাশ ছোঁবার অধিকার আমাদের নেই?'

ইনস্পেক্টার লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, ভুলে গিয়েছিলুম।'

তারপর লাশের ক্ষতস্থান দেখেই তাঁর চক্ষু স্থির! প্রায় এক মিনিট কাল বোবার মতো দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফারিত চক্ষে তিনি বললেন, 'ভয়ানক, ভয়ানক! কেউ কি ভদ্রলোকের মাথা লক্ষ্য করে কামান ছুড়েছিল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম 'সট-গান'—অর্থাৎ ছররাভরা বন্দুক।'

—'তাও অসম্ভব নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'উঁহুঁ! রিভলবার।'

—'বলেন কি মশাই? এমন রিভলবার আছে নাকি—মানুষের মাথাটা প্রায় যা উড়িয়ে দিতে পারে?'

—'আছে। ৩৫৭ ক্যালিবারের ম্যাগনাম রিভলবার। পৃথিবীতে ওর চেয়ে শক্তিশালী রিভলবার আর নেই। গুলি ছোটে ২৭০০ গজ পর্যন্ত। ইটের দেওয়ালও ভেদ করতে পারে।'

—'বাবা। ও রকম রিভলবার আমি কখনও চোখেও দেখিনি।'

এতক্ষণ পরে লাশটাকে উল্টে দেওয়া হল। সুন্দরবাবু তার মুখ দেখেই সচমকে বলে উঠলেন, 'এ কি! ইনি যে আমার চেনা লোক!'

ইনস্পেক্টার ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, 'আপনি এঁকে চেনেন? কে ইনি?'

—'মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। পাকিস্তানের জমিদার, এখন কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা। আমাদের মতন এখানে হাওয়া খেতে এসেছেন।'

—'তাহলে ঠিকানাটা বলুন, আমাদের খবর দিতে হবে। এঁর সংসারে কে কে আছেন?'

—'কেউ নেই। বিবাহ করেননি। ভাই-বোন কেউ নেই। একমাত্র ভগ্নি পরলোকে। ভগ্নির এক ছেলে আছে, কিন্তু সে কোথায় কেউ তা জানে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কেন?'

—'সেই-ই মহেন্দ্রবাবুর অবর্তমানে সম্পত্তি লাভ করবে বটে, কিন্তু মাতাল, বখাটে আর জুয়াড়ি বলে অনেকদিন আগেই মহেন্দ্রবাবু তাকে বিদায় করে দিয়েছেন!'

—'তাকে আপনি দেখেছেন?'

—'না।'

—'তার নাম শুনেছেন?'

—'হ্যাঁ। মোহিতলাল।'

—'তার বয়স কত হবে বলতে পারেন?'

—'শুনেছি ত্রিশ-পঁইত্রিশ।'

—'তাহলে প্রায় যুবক?'

—'তা ছাড়া আর কি? বুঝেছি ভায়া, তুমি তার বয়স জানতে চাইছ কেন? সে বুড়ো হলে তুমি তার উপরে সন্দেহ করতে পারতে! কিন্তু সে বুড়ো নয়, তাকে সন্দেহ করবার কোনও উপায়ই নেই তোমার।'

—'নেই নাকি?'

—'না। আমার মতে অর্থলোভে কেউ এই খুন করেছে। মহেন্দ্রবাবুর হাতের আঙুলে দুটো আংটি ছিল,—একটা হিরার, আর একটা পান্নার। ওঁর হাতে ছিল সোনার দামী কবজি-ঘড়ি, পাঞ্জাবির বুকে ছিল মুক্তো-বসানো সোনার বোতাম। সে সমস্তই লোপাট হয়েছে দেখছি। মানিব্যাগটা বালির উপরে পড়ে আছে বটে, কিন্তু ভিতরে একটা আধলাও নেই। এসব গিয়ে ঢুকেছে হত্যাকারীর পকেটে।'

ইনস্পেক্টারও বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে অর্থলোভেই কেউ এই দুষ্কর্মটি করে এখান থেকে চটপট পিঠটান দিয়েছে।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সকলের মতেই আমার মত। এই খুনের কারণ অর্থলোভ। এখন কী করা উচিত?'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'এখন খুনিকে অন্বেষণ করতে হবে আর কি!'

—'সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দিকে যাত্রা করবেন?'

—'আপাততঃ মহেন্দ্রবাবুর বাসার দিকে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মতে, সর্বপ্রথমেই অপরাধীর পায়ের ছাঁচ তুলে রাখা উচিত।'

—'আহা, সে তো রাখবই। আপনি না বললেও রাখব—ও তো রুটিন-বাঁধা কাজ।'

—'দেখুন, সমুদ্রের বালির উপরে যারা খুন বা রাহাজানি করে, তারা হচ্ছে একান্ত নির্বোধ। বালির পট তাদের সমস্ত গতিবিধির নিখুঁত নক্সা তুলে রাখে। হয়তো অপরাধী এ বোকামি করত না! সময় থাকলে সমস্ত পদচিহ্ন বিলুপ্ত করে দিয়ে যেত। হঠাৎ ঘটনাস্থলে নুলিয়াদের আবির্ভাবে সে চটপট চম্পট দিতে বাধ্য হয়েছে। তার পদচিহ্ন এখান থেকে বাঁদিকে গিয়েছে। আসুন, আগে আমরা সেই চিহ্ন অনুসরণ করে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাই—কারণ পরে এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

—'ঠিক কথা। এ জায়গা হচ্ছে স্বাস্থ্যার্থী ও স্নানার্থীদের তীর্থক্ষেত্র। হাজার হাজার লোক এখানে আনাগোনা করে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সমুদ্রতিরে জনাকীর্ণ হয়ে যাবে। তখন তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব।'

তখনও প্রথম ঊষার ঘোর ঘোর ভাবটা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ফিনফিনে চাদরের মতো। দূরের দিকে তাকাতে গেলেই দৃষ্টি যেন হোঁচট খেতে চায়। অনতিদূরেও ভালো করে নজর চলে না।

বালুকাতটের উপরেই আমাদের চেয়ে খানিক তফাতে একটা লোক পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিসের গতিবিধিই লক্ষ্য করছিল এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

একটা নুলিয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'হুজুর, দেখুন!'

ইনস্পেক্টার সুধোলে, 'কী দেখব?'

—'ওই ভদ্দরলোককে।'

—'হ্যাঁ, দেখছি। কে ও?'

—'যে ভদ্দরলোক আমাদের থানায় খবর দিতে বলে গেলেন, তাঁর পরণে ওই-রকম জামা আর পা-জামা ছিল।'

ইনস্পেক্টার আচম্বিতে জাগ্রত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দৃষ্টিচালনা করলেন। তারপর দেখতে দেখতেই বললেন, 'ওর জামা আর পা-জামা রঙিন বটে, কিন্তু কালো কি অন্য কোনো গাঢ় রং, এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'লোকটা মাথায় গান্ধী-টুপির মতন একটা সাদা টুপি পরে আছে। কিন্তু টুপির তলায় আছে পাকা কি কাঁচা চুল—তাও আন্দাজ করবার জো নেই। গোঁফ তো এত দূর থেকে দেখবার উপায়ই নেই। কিন্তু হাবভাব দেখে লোকটাকে সন্দেহজনক বলেই বোধ হচ্ছে।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'কোনও মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিসের চোখে সকলেই সন্দেহজনক।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক কথা। ডাক দিন তবে লোকটাকে, আসতে বলুন এগিয়ে।'

ইনস্পেক্টার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব ভারিক্কি করে তুলে হাঁক দিলেন, 'এইও! কে তুমি? কী দেখছ? এদিকে এসো!'

লোকটা তটস্থ হয়ে উঠল সেই ডাকে। তারপর শুনতে পায়নি—এইরকম অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে সুড় সুড় করে অন্যদিকে চলে যেতে লাগল।

ইনস্পেক্টার ব্যস্ত ভাবে বললেন, 'আরে আরে, আবার সরে পড়তে চায় যে! এই সেপাই! জলদি! আসামি ভাগতা হায়! পাকড়ো, পাকড়ো!'

দু-জন পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ দৌড় মেরে লোকটাকে ধরতে গেল।

কিন্তু সে মোটেই ধরা দিতে রাজি নয়। সেও দৌড় মারলে তৎক্ষণাৎ।

পাহারাওয়ালাদেরও গতি দ্রুত হয়ে উঠল অধিকতর। পলাতকও পদচালনা করলে প্রাণপণে। তারপর ধাবমান লোকগুলো ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে সূর্যকরহীন উষাকালের ক্ষীণ আলোর আমেজমাখা ছায়ালোকের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু উত্তেজিতভাবে ইনস্পেক্টারকে বার বার বলতে লাগলেন, 'সন্দেহজনক! খুবই সন্দেহজনক! ও ব্যাটা খুনে না হয়ে যায় না!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সন্দেহজনক তো বটেই। নইলে ওভাবে পালাবে কেন?'

জয়ন্ত নির্লিপ্তের মতন শিস দিয়ে ধরলে ভৈরবী রাগিণী এবং আমি দিতে লাগলুম তার তালে তালে তুড়ি।

সুন্দরবাবুর বিশ্বাস হল জয়ন্ত ও আমি তাঁকে ব্যঙ্গ করছি। অভিমানে ফুলতে ফুলতে তিনি বললেন, 'এই ডামাডোল, এখন কি শিস আর তুড়ি দেবার সময়?'

কিন্তু সুন্দরবাবুর এই গুরুতর অভিযোগ জয়ন্ত ও আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করবার পথ পেলে না। সুর-সাধনায় আমরা তখন মেতে উঠেছি।

ইনস্পেক্টার হঠাৎ আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে—আসামিকে নিয়ে ওই ওরা ফিরে আসছে!'

দেখা গেল দুই পাহারাওয়ালা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে জনৈক আসতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে। দেখতে দেখতে তারা কাছে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু আসামির গান্ধীটুপির তলায় দেখা যাচ্ছে কুচকুচে কালো চুল।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'আর এর ঠোঁটের উপরে গোঁফের নামমাত্র চিহ্নও নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আর এর জামা বা পা-জামার রংও কালো নয়। সবুজ!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'ধেৎ, কিচ্ছু মিলছে না।'

বন্দী ততক্ষণে আমাদের সামনে এসে হাজির।

জয়ন্তের শিস এবং আমার তুড়ি থামল। ইনস্পেক্টার বললেন, 'কে তুমি? ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে?'

—'আজ্ঞে, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসে পুলিস দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম।'

—'পালাচ্ছিলে কেন?'

—'খামোকা পুলিস ধরতে এলে ভয়ে কে না পালায়?'

নুলিয়ারা এসে একসঙ্গে মতপ্রকাশ করলে, বন্দীকে এর আগে তারা চোখেও দেখেনি।

বালির উপরকার পদচিহ্নের সঙ্গে বন্দীর পদচিহ্নও মিলল না। না মাপে, না ছাপের বিশেষত্বে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্।'

ইনস্পেক্টার মাথা চুলকোতে লাগলেন।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, 'তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। এইবারে আসুন, পদচিহ্নের অনুসরণ করা যাক।'

আমি বললুম, 'সুন্দরবাবুর হয়ে আমিই বলছি জয়ন্ত,—তথাস্তু।'

পঞ্চম

মাথার চুল কাঁচা নয়

পদচিহ্নের সারি ধরে সকলে অগ্রসর হলাম। এখানে একটা নরহত্যা হয়েছে, এর মধ্যেই সে কথা কেমন করে দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখবার জন্যে জনসাধারণের—বিশেষত অশিক্ষিত লোকের মনে একটা বিকৃত ও অভব্য কৌতূহল জাগ্রত হয়, তাই চারিদিক থেকে শত শত লোক ব্যগ্রভাবে কাতারে কাতারে ছুটে আসছে।

তাদের এড়িয়ে সবাই যেখানে এসে থামলুম, পদচিহ্নের সারি শেষ হয়েছে সেইখানেই। তারপর আসামি পথের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোনও পদচিহ্নের সাহায্য পাবার উপায় নেই।

পথের ঠিক ওপাশে একখানা বাড়ি, তার উপরে সাইনবোর্ডে লেখা—পুরুষোত্তম পান্থনিবাস।

ইনস্পেক্টার বললেন, 'এখন আমরা কী করব? দিগ্বিদিকে পদচালনা?'

ইনস্পেক্টারের ঠাট্টার সুরটা আমলে না এনে জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'এখানে দুটো সম্ভাবনা থাকতে পারে।'

—'যথা—?'

—'এক, অপরাধী রাস্তায় উঠে বাঁদিকে—অর্থাৎ 'স্বর্গদ্বারে'র দিকে অগ্রসর হয়েছে।'

—'আর?'

—'আর একটা সম্ভাবনা আছে। এতখানি পথ বালির উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে সে হঠাৎ এইখানেই রাস্তায় উঠল কেন?'

—'এর উত্তর দিতে পারে অপরাধীই।'

—'কিন্তু কিছুটা আমরাও অন্তত অনুমান করতে পারি। হয়তো সে সামনের ওই 'পুরুষোত্তম পান্থনিবাসে' এসে উঠেছে। হয়তো তার বাসা ওইখানেই।'

—'খুব সহজেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

—'হ্যাঁ, খুব সহজেই। আসুন, আমরা পান্থনিবাসে প্রবেশ করি।'

পাছে পুলিস দেখে পান্থনিবাসের লোকেরা প্রথমেই ভড়কে যায়, সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম জয়ন্ত আর আমি। তারপর জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে ডাক দিলে—'পান্থনিবাসের মালিক কোথায়?'

একজন ভুঁড়িওয়ালা আধাবয়সী লোক উঠানের প্রান্তে উবু হয়ে বসে দাঁতের উপরে দাঁতনকাঠি ঘর্ষণ করছিল। থুতু ফেলে মুখ তুলে সে সুধোলে, 'মালিক হচ্ছি আমি। মশাইদের কী দরকার?'

—'বাইরে আসুন, বলছি।'

হোটেলের নূতন অতিথি ভেবে সে হাসতে হাসতে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং পর মুহূর্তে দলবদ্ধ পুলিস দেখে তার মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে গেল, সচমকে বললে, 'ব্যাপার কী? পুলিস কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার কোনও ভয় নেই। যা জিজ্ঞাসা করি, সঠিক জবাব দিন।'

—'কী জানতে চান, বলুন।'

—'সকালে আপনার ঘুম কখন ভেঙেছে?'

—'ভোর পাঁচটার অনেক আগেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। আমি হোটেলের মালিক, আমার অনেক কাজ।'

—'বেশ। পাঁচটার আগেই যদি কেউ আপনার এই পান্থনিবাস থেকে আজ বাইরে বেড়াতে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন?'

—'নিশ্চয়! পাঁচটার আগে আজ বেড়াতে গিয়েছিলেন কেবল একজন।'

—'তাঁর নাম?'

—'আনন্দবাবু।'

—'তিনি কি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা?'

—'না মশাই, স্থায়ী বাসিন্দা এখানে কেউ নেই। আনন্দবাবু তিনদিন আগে এসেছেন—ঘরভাড়া নিয়েছেন মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।'

—'তিনি কি বুড়োমানুষ?'

—'তাঁর মুখ তেমন বুড়িয়ে না গেলেও মাথার চুল আর গোঁফ বেশ পাকা। যখন-তখন গোঁফ আর মাথার চুল দেখিয়ে তিনি নিজেই যখন নিজেকে বুড়ো-হাবড়া বললেন, তখন আমরাও তাঁকে বুড়ো বলতে পারি নিশ্চয়।'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? তা মালিক-মশাই, আনন্দবাবু লোকটি কি রোগাসোগা আর মাথায় ছোটখাটো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'গায়ের রং কালো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক মিলে যাচ্ছে।'

—'আজ তিনি কালো পাঞ্জাবি আর পাজামা পরেছিলেন?'

—'কী আশ্চর্য, সবই যদি জানেন তো আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

—'তিনি কি বেড়িয়ে ফিরে এসেছেন?'

—'এই একটু আগে এসেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।'

—'তাঁর ঘর কোন দিকে?'

—'এই যে, বাইরে থেকেই দেখা যায়। দোতলার ওই কোণের ঘরখানা।'

—'চুপি চুপি আমাদের ওপরে নিয়ে চলুন। আমরা তাঁকে ডাকব না, আপনি ডাকবেন।'

জয়ন্ত ও উৎকল পুলিসের লোকজনদের সঙ্গে আমিও যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পান্থনিবাসের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

কিন্তু সুন্দরবাবু সেইখানেই গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি জানতুম তিনি আসবেন না, তবু মুখ টিপে হেসে বললুম, 'আরে আপনি হচ্ছেন নৈবেদ্যের উপরে চুড়ো-সন্দেশের মতন, আপনি আসবেন না দাদা?'

—'মানিক, তোমার পোড়ার মুখে হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়! পরের ধান্দা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? যাব না, যাব না, আমি যাব না!'

আমি আর কিছু বললুম না। তবে এটুকু বুঝে নিলুম, সুন্দরবাবুর মগজে তখন গজ গজ করছে ম্যাগনাম রিভলবারের দেওয়ালভেদী প্রচণ্ড গুলি!

সবাই একসঙ্গে টিপে টিপে পা ফেলে দোতলার বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। তারপর একটা বন্ধদ্বার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার একপাশে আমি আর জয়ন্ত, আর একপাশে উৎকল পুলিসের চারজন লোক, মাঝখানে পান্থনিবাসের মালিক।

জয়ন্তের ইঙ্গিতে ইনস্পেক্টার রিভলবার বার করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

বিস্ফারিত চক্ষে এই সব অভাবিত আয়োজন দেখে মালিক ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন, 'আনন্দবাবু!'

সাড়া নেই।

মালিক আবার ডাকলেন, 'অ আনন্দবাবু! আমি পান্থনিবাসের কর্তা কথা বলছি।'

উত্তরে একটি টুঁ শব্দও শোনা গেল না।

জয়ন্ত সন্দিগ্ধভাবে তখন এগিয়ে ঠেলা মারতেই দরজাটা খুলে গেল।

মালিক ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে বিস্মিত স্বরে বললে, 'আরে, ঘরের ভেতরে তো জনপ্রাণী নেই! আনন্দবাবুকে তো আমি এ-বাড়ির বাইরে যেতে দেখিনি!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'কেউ বাইরে যাবে কী করে? সদর দরজা তো আগলে ছিলুম আমরা।'

মালিক বললেন, 'বাড়ির পিছনে যে খিড়কির দরজা একটা আছে।'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, তবেই হয়েছে! আর কিছু বলতে হবে না। আপনি যখন বাইরে গিয়ে কথা কইছিলেন, সেই অবসরে আনন্দ টেনে চম্পট দিয়েছে।'

ইনস্পেক্টার হতাশভাবে বললেন, 'অপরাধীকে হাতের কাছে পেয়েও হারালুম। কপাল দেখছি নিতান্ত খারাপ! যাক গে, কী আর করা যাবে, তবে একবার ঘরের ভিতরে ঢুকে খানাতল্লাস করা দরকার।'

মালিক বললেন, 'কী খানাতল্লাস করবেন? আনন্দবাবু সঙ্গে এনেছিলেন তো একটা ছোটো সুটকেশ—তার জন্যে মুটেরও দরকার হয় না। আনন্দবাবু যখন নেই, সুটকেশটা কি আর আছে?'

মালিক ভুল বলেননি, ঘরের ভিতরে কিছুই পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে, 'ভয় নেই ইনস্পেক্টার মশাই, হাল ছাড়বেন না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা খুব বেশি অগ্রসর হয়েছি। অপরাধের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তদন্ত সুরু করেছি বলেই এই হোটেল পর্যন্ত আসা সম্ভবপর হয়েছে। এখানে আমাদের হাত এড়ালেও অপরাধী যে এখনও পুরীধামেই অবস্থান করছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এই পুরী তার কাছে এখন শত্রুপুরী হয়ে উঠেছে। প্রথম সুযোগেই সে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয় ত্যাগ করবে—সেটাও নিশ্চয় করে ধরে নিতে পারেন।'

ইনস্পেক্টার জোর-গলায় বললেন, 'কিন্তু কোথায় সে পালাবে? কোথা দিয়ে পালাবে? পুরী হচ্ছে রেলপথের শেষ স্টেশন। আমার লোকজনরা এখনই স্টেশনে গিয়ে ঘাঁটি আগলে শিকারী বাঘের মতন ওত পেতে বসে থাকবে।'

—'সকলে তার চেহারার বর্ণনা জানে তো?'

—'আমি বলে দেব। মাথায় খাটো। রোগা। রং কালো। গোঁফ আর মাথার চুল পাকা—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'গোঁফ আর মাথার চুল পাকা না হতেও পারে।'

মালিক বললেন, 'না মশাই, পাকাই বটে।'

—'পাকা হতেও পারে, না হতেও পারে।'

—'আপনি যদি বলেন আনন্দবাবু পাকা পরচুল ধারণ করেছিলেন তাহলে আমি আপত্তি করব। দিনের বেলায় পরচুল পরে কেউ আমার চোখকে ফাঁকি দিয়েছে এ আমি মানতে পারব না।'

—'না, অপরাধী পরচুল ধারণ করেনি।'

আমি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ কী?'

—'যথাসময়ে শুনতে পাবে। এখন নিচের দিকে চল। আগে সুন্দরবাবুকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, আজ আর ম্যাগনাম রিভলবার গর্জন করবে না। তারপর একবার বাড়ির খিড়কির দিকেও চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।'

ষষ্ঠ

গুড়ুকখোরের নল

আমরা সকলে খিড়কির দিকে অগ্রসর হলুম—সুন্দরবাবু আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না—যেন আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত তিনি বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

আমি ঠাট্টা করবার ফাঁক পেলে ছেড়ে কথা কই না, সুন্দরবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম, 'বলি, ও মশাই!'

—'হুম!'

—'আপনি কি প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছেন?'

—'উঁহুম!'

—'দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা ওদিকে যাচ্ছি?'

—'তোমরা চুলোয় গেলেও আমার মাথাব্যথা হবার কারণ নেই।'

—'কিন্তু আমরা চলে গেলে যদি ম্যাগনাম রিভলবার এখানে এসে আবির্ভূত হয়?'

একটু চমকে উঠে তিনি বললেন, 'এলেও আমাকে দেখতে পাবে না।'

—'কেন? আপনি কি অদৃশ্য মানুষ?'

—'আমি আর এখানে সঙের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নই। আমার পা টনটন করছে। এই আমি প্রস্থান করলুম—মরগে তোমরা ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়িয়ে।'

তখন পুরীর সাগর-কোলাহলের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়েছে জনতাসাগরের প্রচণ্ড কোলাহল। 'জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। তীর্থযাত্রীরা নেমেছে সাগরস্নানে এবং অনেকেরই দুর্দশার সীমা নেই—বিশেষত স্ত্রীলোকদের। বিষম বেগে ভীমনাদী, ফেনায়িত, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা বারে বারে তেড়ে আসছে এবং অনেক স্নানার্থীকে তুচ্ছ নগণ্য পদার্থের মতন উল্টেপাল্টে আছাড় মারছে বালুকাতটের উপরে। সূর্যকিরণ তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে পরিপূর্ণ গৌরবে।

পান্থনিবাসের পিছনদিকে একটা সরু গলি।

জয়ন্ত সুধোলে, 'এ গলির দুটো মুখ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?'

—'গলির উত্তরে আছে আর একটা এর চেয়ে চওড়া গলি আর দক্ষিণে আছে পুরীর প্রধান রাজপথ 'বড়ো ডাণ্ডি'। দুটো রাস্তারই একদিকে আছে জগন্নাথদেবের মন্দির, আর একদিকে সমুদ্র।'

—'আসামি পুলিসের ভয়ে নিশ্চয়ই সমুদ্রের দিকে আসবে না। তার গতি জগন্নাথের মন্দিরেরই দিকে।'

—'কিন্তু কোথায়?'

—'এখানে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও পাণ্ডার বাড়ি যখন খুশি আশ্রয় নিতে পারে—তীর্থক্ষেত্রের ওই এক মস্ত সুবিধা।'

মানিক বললে, 'বেশ খানিকটা দূর থেকে একটা লোক একটা বাড়ির পাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে বলে মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত দেখে বললে, 'হুঁ। ওই যাঃ—মুখখানা সাঁত করে সরে গেল!'

ইনস্পেক্টার বললে, 'অত্যন্ত সন্দেহজনক। একবার দেখে আসি।'

—'পুলিসের হাতে ধরা দেবার জন্যে আসামি কোনোদিন অপেক্ষা করে না। আর ব্যাপারটা সন্দেহজনক না হওয়াই সম্ভব! পাড়ায় পুলিস দেখলে সাধারণ লোকের মনে একসঙ্গে ভয় আর কৌতূহল জেগে ওঠে। তারা দূর থেকে উঁকিঝুঁকি না মেরে থাকতে পারে না।'

—'তবু ওদিকটা একচক্কর ঘুরে এলে ক্ষতি কি?'

—'যান। আমরা ততক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য সাগরের গর্জন-গীতা-পাঠ শ্রবণ করি।'

ইনস্পেক্টার হন হন করে এগিয়ে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার এদিক, একবার ওদিক, তারপর নানাদিকে তাকালে, তারপর আবার হন হন করে ফিরে হতাশ ভাবে বললে, 'বেটা চম্পট দিয়েছে।'

—'সুতরাং?'

—'আপনারা বাসায় ফিরে যান, আমার সঙ্গে থেকে মিথ্যে কষ্ট পাবেন কেন?'

—'আপনি কি করবেন?'

—'মামলা আমার, ভাবনাও আমার। আমি একবার শ্রীমন্দিরের আশপাশটা টহল দিয়ে দেখে আসতে চাই।'

—'উত্তম প্রস্তাব।'

—'কখন চা-টা না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি, এখন জঠরানলকে কিঞ্চিৎ তুষ্ট না করলে আর চলে না। আগে উদরচিন্তা, তারপর আর যা কিছু।'

—'আপনিও দেখছি আমাদের সুন্দরবাবুর দলে। তা পাশেই তো পান্থনিবাস—ভাবনা কি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে আবার সমুদ্রের দিকে গেল। কিন্তু সুন্দরবাবুকে আর দেখতে পাওয়া গেল না, বোধহয় তাঁরও জঠরানল প্রদীপ্ত হয়েছে। আমি কৌতূহলী হয়ে ইনস্পেক্টারের পিছনে পিছনে চললুম।

পান্থনিবাসের মালিক আবার ইনস্পেক্টারকে দেখে মৌখিক আনন্দের ভাবাভিনয় করে শুধোলে, 'এই যে, আসুন, আসুন! আনন্দবাবুর পাত্তা পেলেন?'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'ও কথা রাখুন। দু-চারখানা পুরি কি লুচি, দু-চারখানা ভাজাভুজি আর এক পেয়ালা চা হবে কি? আমি বিনামূল্যে খেতে চাই না।'

মালিক তাড়াতাড়ি জিহ্বাদংশন করে বললে, 'দামের কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না, আপনার কাছ থেকে দাম নেবে কে? উঠে এসে ভালো করে বসুন। (চিৎকার করে) ওরে কে আছিস, পুলিসের বড়োবাবুর ক্ষিদে পেয়েছে, চটপট লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা, এক প্লেট হালুয়া আর চা নিয়ে আয়!'

উদরের দাবি মিটিয়ে ইনস্পেক্টার আবার সদলবলে ধাবিত হল মন্দিরের দিকে। ওদিককার অপেক্ষাকৃত বড়ো রাস্তাতেও ছিল একাধিক ছোটো বড়ো হোটেল, যেতে যেতে সে সব জায়গাতেও সন্ধান নিতে ভুললে না। তারপর ঘিঞ্জি গলিঘুঁজি ছেড়ে সকলে এসে পড়লুম জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে।

সেখানেও নানা শ্রেণীর দোকানের পর দোকান এবং ভক্তদের ও ভিখারিদের জনতা। এক একটি যাত্রীদলের সঙ্গে আছে এক-একজন পাণ্ডা—তাদের অধিকাংশেরই মাথা কামানো এবং পেট মোটা। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রে তারা অপরিহার্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আপদেরও মতন। কিন্তু কেবল হিন্দুদের নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও প্রধান প্রধান তীর্থে এই শ্রেণীর জীবের অভাব নেই।

এখানটা হচ্ছে শ্রীক্ষেত্রের সর্বপ্রধান স্থান। দিকে দিকে কর্মব্যস্ততা। দোকানের পর দোকান, ছোটো বড়ো, নানা শ্রেণীর। খাবার, বাসন, মণিহারী, জামা-কাপড়, ফলমূল প্রভৃতি তাবৎ জিনিসপত্র এখানে বিক্রী হয়—দোকানে দোকানে স্ত্রী-পুরুষ খরিদ্দারের আনাগোনা। পাণ্ডা, যাত্রী, ক্রেতা-বিক্রেতা ও ভিখারি প্রভৃতি সে জায়গাটা সর্বদাই মুখরিত করে রাখে।

মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে রাজপথের উপরেই রেলিং দিয়ে ঘেরা কণারক থেকে আনীত অপূর্বসুন্দর বরুণ-স্তম্ভ। সেইখানে দাঁড়িয়ে ইনস্পেক্টার প্রত্যেক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,— আজ সকালে তার বাসায় কোনো নতুন যাত্রী এসেছে কিনা?

কয়েকজন জানালে, 'হ্যাঁ, এসেছে।'

অমনি ইনস্পেক্টারের আগ্রহ-বহ্নি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সাগ্রহে প্রশ্নের পর প্রশ্ন হয়, কিন্তু উত্তর মোটেই সন্তোষজনক হয় না।

অবস্থা যখন হল ছাড়ি-ছাড়ি, তখন একজন পাণ্ডা বললে, 'ঘণ্টাদেড়েক আগে আমার বাসায় একজন নতুন যাত্রী এসেছে।'

—'কেবল একজন?'

—'হ্যাঁ।'

—'বয়স কত?'

—'বলা শক্ত।'

—'কেন?'

—'তার মুখ দেখলে বয়স বেশি বলে মনে হয় না, কিন্তু তার মাথার চুল পাকা। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

—'সঙ্গে মালপত্তর কি আছে?'

—'খালি একটা ছোটো হাতব্যাগ।'

ইনস্পেক্টার বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাণ্ডার হাত চেপে ধরে বললে, 'এখনই চলো তোমার বাসায়।'

পাণ্ডা বললে, 'সে কি হুজুর, যাত্রীদের নিয়ে আমি এখন মন্দিরে—'

বাধা দিয়ে ইনস্পেক্টার মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'রাখো তোমার যাত্রী! খুনীকে বাসায় আশ্রয় দিয়েছ, তোমারও শাস্তি হতে পারে তা জানো?'

পাণ্ডা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'খুনি?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুনি! তার সেই হাতব্যাগে আছে গুলিভরা রিভলবার আর রক্তমাখা জামা-কাপড়।'

—'ওরে বাবা!'

—'শীগগির চলো। কোথায় তোমার বাসা?'

—'মন্দিরের পাশেই।'

—'উত্তম। চলো।'

মন্দিরের চারিদিকেই পথ। পাণ্ডা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হল দক্ষিণদিকের পথে। অল্প এগিয়েই আরও ডাইনে ছোট্ট একটা গলি। বাইরের জনতা ও গোলমালের সঙ্গে গলির নির্জনতা ও নীরবতা যেন খাপ খাচ্ছিল না। পুলিস দলের জুতোগুলোর দুপদাপ শব্দে সে স্তব্ধতা ভেঙে গেল।

বাঁ দিকের একখানা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পাণ্ডা বললে, 'এই আমার বাড়ি।'

দোতলা বাড়ি। বড়ো নয়। উপরে একটা দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। তারপরই তারস্বরে চিৎকার শোনা গেল—'ও মশাই, ও মশাই! এ কিরকম গুণ্ডামি?'

ইনস্পেক্টার দুইজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে এবং বাকি সবাইকে দরজায় পাহারায় মোতায়েন রেখে বেগে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে। ডানপাশেই সিঁড়ি। তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলে, 'চ্যাঁচায় কে? কি হয়েছে?'

একটা আধবুড়ো লোক খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা মুখ নেড়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'গুণ্ডামি! ভয়ানক গুণ্ডামি!'

—'ব্যাপারটা কি?'

—'পাশের ঘরের লোকটা আচমকা আমার ঘরে ঢুকে গড়গড়ার কাঠের নলটা খুলে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।'

—'তার মাথার চুল পাকা?'

—'হ্যাঁ, পাকা। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলুম—এ কি মগের মুলুক?'

—'তাহলে আরও খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকুন—বেশি চেঁচাবেন না! পাণ্ডা ঠাকুর, আপনার নতুন যাত্রী কোন ঘর ভাড়া নিয়েছে?'

পাণ্ডা কিছু বলবার আগেই আধবুড়ো লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই ঘর! হায় হায়, আমার এতকালের শখের গড়গড়ার নল মশাই, তেলে-ধোঁয়ায় পাকা কাঠের নল!'

ইনস্পেক্টার ধমক দিয়ে বললে, 'আরে গেল, খালি বাজে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে!' তারপরে ফিরে বন্ধ দরজায় করাঘাত করতে করতে বললে, 'ওহে বাপধন, ঘরের ভেতরে আর ঘাপটি মেরে থাকতে হবে না! ভালো চাও তো সুড়সুড় করে বাইরে এসো!'

সুড়সুড় করে কেউ বাইরে এল না, ইনস্পেক্টার তখন ফিরে বললে, 'এই সেপাই, আমার পায়ে বাতের ব্যথা। তোমরা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফ্যালো তো! রোসো রোসো,

একটু সবুর কর—আমি তৈরি হয়ে নি! আসামি বেটার কাছে নাকি দেয়ালভেদী কি এক ভয়ানক অস্ত্র আছে!' এই বলে সে কোমরের খাপ থেকে নিজের রিভলবার বার করে ফেললে এবং ঘরের ভিতরে বুলেট বৃষ্টি করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দস্তুরমতো রুখে দাঁড়াল।

দড়াম, দড়াম, দড়াম! দুই সেপাইয়ের ডবল লাঠির চোটে মট করে দরজার কাঠের খিল ভেঙে গেল, ভিতরে কারুকে দেখা গেল না।

দুই সেপাইয়ের দ্বারা অগ্রভাগ রক্ষা করে ইনস্পেক্টার অতি সন্তর্পণে রিভলবার বাগিয়ে ধরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

ঘরে নেই জনপ্রাণী।

ইনস্পেক্টার গর্জন করে হাঁক দিলে, 'পাণ্ডা, এই পাণ্ডা! তুমি আবার সময় বুঝে কোথায় সরে পড়লে?'

অতঃপর রিভলবারের গুলিবৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে বুঝে গড়গড়ার নলহারা লোকটি এবং পাণ্ডা দুজনেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একতলায় পালিয়ে গিয়েছিল, এখন ইনস্পেক্টারের গর্জন শুনে তাড়াতাড়ি উপরে এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বললে, 'এই যে আমি হুজুর, এই যে আমি!'

ইনস্পেক্টার রাগত কণ্ঠে বললে, 'এ কি রকম ঘর তোমার? ঘরে মানুষ ঢোকে, অথচ তাকে চোখে দেখা যায় না?'

পাণ্ডা অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে ফিক করে হেসে ফেলে বললে, 'সে নেই? ও, বুঝেছি!'

ইনস্পেক্টার আরও খাপ্পা হয়ে বললে, 'হাসছ যে বড়ো?'

—'আজ্ঞে, ব্যাপারটা বোঝা গেছে!'

—'বোঝা গেছে? কিচ্ছু বোঝা যায়নি। আসামি কোথায় গেল?'

—'লম্বা দিয়েছে হুজুর, লম্বা দিয়েছে।'

—'লম্বা দিলেই হল? দরজা বন্ধ, তবু লম্বা দিলে কেমন করে?'

—'আজ্ঞে, ওইদিকের জানলার একটা গরাদে যে ভাঙা!'

—'গরাদে ভাঙা!'

—'আজ্ঞে!'

—'এতক্ষণ বলনি কেন?'

—'হুজুর, দোতলার উপর থেকে কেউ লাফ মেরে পালাতে পারে, এটা কেমন করে বুঝব?'

—'চোপরাও, কেন বুঝবে না? একি যে সে আসামি? খুনি আসামি, মরিয়া আসামি!'

—'এমন সর্বনেশে আসামি ভালোয় ভালোয় বিদায় হয়েছে বলে আমি কিন্তু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি হুজুর!'

—'ইডিয়ট, আজ আমি তোমাকেই গ্রেপ্তার করব!'

—'কেন হুজুর, আমি তো খুন করিনি।'

—'কিন্তু তুমি খুনে আসামি পালাবে বলে পথ খোলা রেখেছিলে।'

সেই আধবুড়ো লোকটা এগিয়ে এসে বললে, 'আসামি তো লম্বা দিয়েছে, তবে আমার গড়গড়ার নলের কি হবে হুজুর?'

প্রচণ্ড ক্রোধে ইনস্পেক্টারের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'সেপাই, এর পিঠে বেশ কষে দু-চার ঘা বসিয়ে দাও তো!'

লোকটা বেগে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেল।

কোনরকমে ক্রোধ দমন করে ইনস্পেক্টার সেই গরাদেভাঙা জানলাটার দিকে এগিয়ে গেল এবং বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখলে, খানিকটা ফর্দা জায়গা আর তার একপ্রান্তে একটা ইঁদারা।

জিজ্ঞাসা করলে, 'ইঁদারাটা কাদের?'

পাণ্ডা জবাব দিলে, 'গলির সকলেই ঐ ইঁদারার জল ব্যবহার করে।'

—'তাহলে বারোয়ারী ইঁদারা?'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

—'গলিটা কি কানাগলি?'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

—'কেউ যদি এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ে, তাহলে গলির বাইরে যেতে গেলে তাকে তোমার বাড়ির সদর দরজার সামনে দিয়েই যেতে হবে?'

—'তা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।'

ইনস্পেক্টার কতকটা আশান্বিত হয়ে বললে, 'চলো চলো, নিচে চলো।'

সদরে ছিল অন্যান্য সেপাইরা।

ইনস্পেক্টার শুধোলে, 'গলির ভিতর থেকে কেউ বাইরে গিয়েছে?'

জনৈক সেপাই জানালে, কোনও কোনও লোক যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কারুকে যেতে দেয়নি।

ইনস্পেক্টার দ্রুতপদে আগে ইঁদারার ধারে গিয়ে হাজির হল, তারপর ভিতরে উঁকি মেরে দেখলে, অনেক নিচে কালো জল টল টল করছে। কোনও মানুষ সেখানে আশ্রয় নেয়নি। তবু সে কয়েক মিনিট সেখান থেকে নড়ল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জলের দিকে। তারপর নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললে, 'এতক্ষণ কোনও মানুষ জলে ডুবে থাকতে পারে না।'

পাণ্ডা বললে, 'হুজুর, খুনে-ব্যাটা কোনও বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে আছে।'

—'লুকিয়ে থাকলেই পার পাবে নাকি? এই তো একরত্তি কানাগলি, বাড়ি আছে মোটে খান-কয়। আমি সহজে ছাড়ব নাকি, সব বাড়িতে খানাতল্লাস করব। সেপাই, তোমরা প্রত্যেক বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ—আসামিকে দেখতে পেলে চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনবে। কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান, ম্যাগনাম রিভলবারের কথা ভুলো না—যদিও আমার বিশ্বাস জয়ন্তবাবু অত্যুক্তি করেছেন।'

আমি এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের মতন এই সব ট্র্যাজিডি-কমেডির দৃশ্য উপভোগ করছিলুম আর ভাবছিলুম, হত্যাকারী এত জিনিস থাকতে তুচ্ছ একটা গড়গড়ার কাঠের নল কেড়ে নিয়ে সরে পড়ল কেন? এইখানে কেমন একটা খটকা আছে।'

সেপাইরা সব বাড়ি খানাতল্লাস করেও আসামি আনন্দের পাত্তা পেলে না।

ইনস্পেক্টার শ্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'হায়রে অদৃষ্ট, এত ধুমধামের পরেও আমার ভাগ্যে পর্বত একটা মূষিক পর্যন্ত প্রসব করলে না!'

আমি তার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারলুম না—আমার মনের ভিতরে এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে গড়গড়ার কাঠের নলের কাহিনী। এই সব ব্যাপারের মধ্যে একটা একহাত লম্বা গড়গড়ার নলের কি সার্থকতা থাকতে পারে? কিন্তু সার্থকতা আছে একটা নিশ্চয়ই। হয়তো জয়ন্ত থাকলে বললে পারত।

ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ফিরে এলুম।

ইনস্পেক্টারকে বললুম, 'একবার জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করে খবরটা দিয়ে যান।'

ইনস্পেক্টার বললে, 'ভগ্নদূতের মতন নিজের পরাজয়ের কহিনী বলতে আমার ভালো লাগছে না। তবে বলছেন যখন, চলুন।'

আমাদের দেখে জয়ন্ত বললে, 'এস বিজয়ী বীরের দল ঃ বন্দী কোথায়?'

ইনস্পেক্টার বললে, 'বন্দী? হট্টমন্দিরে।'

—'অর্থাৎ?'

—'আনন্দকে ধরতে গিয়ে আমরা নিরানন্দ নিয়ে ফিরে আসছি।'

—'সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয়।'

—'আপনি হাজির থাকলেও সুবিধা করে উঠতে পারতেন না।'

—'সে কথা পরে বিবেচ্য। আগে সব কথা বলতে আজ্ঞা হয়।'

ইনস্পেক্টার একে একে সব ঘটনা বর্ণনা করে গেল। জয়ন্ত ভাবহীন মুখে সমস্ত শ্রবণ করে গম্ভীর স্বরে বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, কি আর বলব, আমি সঙ্গে থাকলে আনন্দকে বোধহয় বন্দী করতে পারতুম।'

ইনস্পেক্টার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'মশাই, যা তা বাজে বকবেন না! কেন, আপনাদের মানিকবাবু তো সঙ্গে ছিলেন, উনিও তো সব দেখেছেন!'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমিও কি ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা গোপন সত্যের ইঙ্গিত পাওনি।'

আমি বললুম, 'গোপন সত্যের ইঙ্গিত? হয়তো পেয়েছি—কিন্তু তা ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়।'

ইনস্পেক্টার বললে, 'ইঙ্গিত আবার কি? ওসব হেঁয়ালি-ফেয়ালি বুঝি না মশাই, সোজা ভাষায় কথা বলুন।'

—'বলছি। আগে মানিকের কথা শুনি।'

আমি বললুম, 'ধরা পড়লে যাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে, প্রাণ নিয়ে পালাবার সময়েও সে তুচ্ছ একটা গড়গড়ার নল চুরি করতে যাবে কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর কি?'

—'উত্তরটা এখনও খুঁজে পাইনি।'

—'উত্তরটা খুঁজে পেলেই আনন্দকে পাকড়াও করতে পারতে।'

ইনস্পেক্টার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'খালি খালি হেঁয়ালি! আরে মশাই, সমুদ্রের ধারে হল হত্যাকাণ্ড, আর একটা পাণ্ডার বাড়িতে গেল নগণ্য গড়গড়ার কাঠের নল চুরি। এর মধ্যে আবার কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে সোজা কথায় সেইটেই বুঝিয়ে দিন।'

—'আনন্দ সেই ইঁদারার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল, আপনি দেখতে পাননি।'

—'কোনও মন্ত্রশক্তিতে আনন্দ কি নিজেকে অদৃশ্য করে রেখেছিল?'

—'না।'

—'তবে? আমি পাঁচমিনিট ধরে ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, তবু তাকে দেখতে পাইনি কেন? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডুবুরিও জলের তলায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ডুবে থাকতে পারে না।'

—'পারে না তা জানি।'

—'জেনে-শুনেও বাজে কথা বলছেন?'

—'না। ইঁদারার জলের তলায় ডুব মেরে আনন্দ যে কাঠের নলে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল সেটা আমি এইখানে বসেই অনুমান করতে পারছি।'

—'সে কি!'

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, 'গড়গড়ার কাঠের নল নিয়ে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল, এতক্ষণ পরে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল।'

জয়ন্ত বললে 'ইনস্পেক্টার মশাই! সেকালের ডাকাতরা পুষ্করিণীর জলের তলায় ডুব মেরে তুচ্ছ একগাছা খড়ের ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ ডুবে থেকে লোকের চোখকে ফাঁকি দিত, এ কথা কি আপনি শোনেননি?'

ইনস্পেক্টার অপরাধীর মতন কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'শুনেছি।'

—'আনন্দ সেই প্রাচীন পদ্ধতিটাকেই নতুন করে কাজে লাগিয়েছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ইনস্পেক্টার বললে, 'বড়োই কসুর হয়ে গেছে দেখছি। এখন উপায়?'

—'দেখি কতদূর কি করতে পারি।' —এই বলে আবার বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেসব কিছুই প্রকাশ করলে না বা আমাদের কারুর দিকে ফিরেও তাকালে না।

সপ্তম

আজই এসপার কি ওসপার

ঘণ্টাদুয়েক পরে বাসায় ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, 'এখানকার প্রধান পাণ্ডা আমার পরিচিত। তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে বলে এলুম, আনন্দ অন্য পাণ্ডার আশ্রয়ে রয়েছে

কিনা সেই খবরটা খোঁজ নিয়ে আমাকে যেন আজই সে জানায়। আর অন্য কোনও পথ দিয়ে গাড়ি চড়ে পুরীর বাইরে যাচ্ছে কিনা, সে খোঁজটাও লোকজন লাগিয়ে তাকে রাখতে বলে এসেছি।'

সুন্দরবাবু বেজায় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হুম্! পরের মামলা নিয়ে কেন তুমি এ-সব বাড়াবাড়ি করছ? এর জন্যে বাহাদুরি পাবে কে সেটা ভেবে দেখছ কি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'বাহাদুরি অর্জন করবে উৎকল পুলিস। জানি দাদা, জানি। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আমি হচ্ছি শখের গোয়েন্দা। শখ মিটলেই আমি খুশি। কত তাড়াতাড়ি একটা জটিল খুনের মামলার জট খুলতে পারি, সেইটেই আমি পরীক্ষা করতে চাই। সে ব্যাপারের সফলতাই আমার পুরস্কার।'

সুন্দরবাবু ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললেন, 'আ মরি মরি! তোমার শখের আধিক্যতা দেখে আর বাঁচি না!'

আজ হঠাৎ জয়ন্তের মুখ খুলে গেল, সে স্পষ্ট ভাষায় বললে, 'এই যে আমি আপনাকে প্রায়ই সাহায্য করি। এ কি আমার নিজের যশের জন্যে?'

সুন্দরবাবু একেবারে স্তব্ধ।

—'আসল কথা কি জানেন দাদা? আমি নিজের, অন্যের বা আপনার যশের জন্যে একটুও মাথা ঘামাই না। আমি হচ্ছি অপরাধবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী মাত্র—সুযোগ হলেই যতটা পারি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ভালোবাসি।'

সুন্দরবাবু হাঁ—না কিছুই বলবার ভাষা খুঁজে পেলেন না, খুব মৃদুস্বরে যেন বললেন, 'হুম্!'

সন্ধ্যা উৎরে যাবার পরেই শুকনো মুখে ইনস্পেক্টার এসে হাজির। জানা গেল, কলকাতার এবং অন্যান্য জায়গায় যাবার নানা ট্রেন পুরী স্টেশন ছেড়ে যাত্রা করেছে বটে, কিন্তু আনন্দের মতন দেখতে এমন কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে সে গাড়িগুলোর মধ্যে আবিষ্কার করা যায়নি।

জয়ন্ত বললে, 'মুষড়ে পড়বেন না মশাই। এখনই পুরোপুরি হতাশ হবার মতন অবস্থা হয়নি।'

তেমনই মুখভার করেই ইনস্পেক্টার বললেন, 'দেখছি, এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে পাণ্ডাদের বাসায় এখন গিয়ে খবর নিতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'সে খবর সন্ধ্যার আগেই পেয়েছি।'

—'পেয়েছেন? কী খবর?'

জয়ন্ত বললে, 'আনন্দ কোনও পাণ্ডার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়নি।'

ইনস্পেক্টার এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, এবার ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন। বললেন, 'তাহলে আর কোন আশায় বুক বাঁধি বলুন?'

—'আমি আরও খবরের প্রত্যাশায় আছি। সিঁড়ির উপরে ভারি পায়ের শব্দ শুনছি

না? হ্যাঁ, তাই তো! ওই যে বড়ো পাণ্ডাঠাকুর আসছেন—মুখ ওঁর হাসি-হাসি। নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য নতুন খবর এনেছেন!'

জয়ন্ত উঠে তাড়াতাড়ি পাণ্ডার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে দুজনে চুপি চুপি কথা কইতে লাগল।

ঘরের ভিতরে একলা ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, একখানা মোটরে চারজন বন্দুকধারী সেপাই নিয়ে আপনি কতক্ষণের মধ্যে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবেন?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, আনন্দের মতন দেখতে একটা লোক একখানা গোরুর গাড়িতে চেপে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই কোণারকের দিকে যাত্রা করেছে।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সে খবর আমরা জানি। আড়াই ঘণ্টা আগে পেয়েছি।'

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, 'সে কি ইনস্পেক্টার মশাই,—খবরটা এতক্ষণ আমাদের বলেননি কেন?'

ইনস্পেক্টার উত্তর করলেন, 'আমাদের তদন্তের সঙ্গে খবরটার কোনও সম্পর্ক নেই বলে। এ জায়গা ছেড়ে যে লোক তাড়াতাড়ি পালাতে চায়, তার পক্ষে এত ট্যাক্সি থাকতে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে ঢিমে-তেতালায় রওনা হওয়াটা কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয় বলে!'

—'যেটা স্বাভাবিক নয় বলে ভাবছেন, একটু চিন্তা করে দেখলে সেটাই আবার আপনার অস্বাভাবিক নয় বলে মনে হবে। স্কন্ধে খুনের অপরাধ নিয়ে কেউ যদি চুপিচুপি পুরী ত্যাগ করতে চায় তাহলে ট্রেন ও ট্যাক্সির চেয়ে বুদ্ধিমান হলে গোরুর গাড়ির সাহায্যই সে নেবে। ঠিকই অনুমান করবে যে আপনাদের নজর ট্রেন ও ট্যাক্সির উপর যতটা প্রখর হয়ে পড়বে—গোরুর গাড়ির উপর কখনই অতটা পড়বে না।'

জয়ন্তের কথায় ইনস্পেক্টার অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি এখনই গাড়ি ও সেপাইয়ের ব্যবস্থা করছি।'

—'হ্যাঁ, তাই করুন। কোণারকের দিকে যখন গেছে তখন মনে হয় মোটরে গেলে আমরা নেয়া-খেয়া নদীর কাছ-বরাবর তার নাগাল ধরতে পারব।'

—'কিন্তু সে যদি আনন্দ না হয়?'

জয়ন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তাহলে ব্যর্থ হয়ে আমাদের ফিরে আসতে হবে। তবে এ খবরটা—এ সম্ভাবনাটা অবহেলা করা উচিত নয়।'

ইনস্পেক্টার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি আধঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হতে পারব।'

—'আর একটা জবর খবর আছে। প্রস্তুত হতে যাবার আগে জেনে যান।'

—'কী, কী?'

—'একটা সোনা-রূপোর দোকানে আনন্দের মতন দেখতে কোনও লোক এই পান্নার আংটিটা বাঁধা রেখে আজ একশো টাকা ধার করেছে।'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ শুধু শ্রোতার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। জয়ন্তের কথা শুনে

এইবার সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আংটিটা দেখেই বলে উঠলেন, 'আর কোনও সন্দেহ নেই। জীবিত অবস্থায় মহেন্দ্রবাবুর হাতে আমি এই আংটিটাই দেখেছি।'

জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, যান, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হোন। আমার মনে হচ্ছে হয়তো আজই আপনার তদন্তের এসপার কি ওসপার হয়ে যাবে!'

অষ্টম

খালি হাতে হরিণ শিকার

পুরীর নোংরা শহরতলির ধূম-ধুলোর ধূসরিমা ছাড়িয়ে পুলিসের বড়ো জিপ-গাড়িখানা যখন বাইরে গিয়ে পড়ল, তখন নির্মেঘ নীলাকাশে প্রতিপদের প্রায়-পূর্ণ চাঁদ, বাতাসের কণ্ঠে অবিশ্রাম সঙ্গীত, দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যেন এক অনাহত উদারতা, ধূ-ধূ-ধূ-ধূ মরুভূমির মতন নিরালায় নিষুপ্ত চাঁদের আলো এবং বহুদূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে চিরজাগ্রত সাগরের অস্পষ্ট বাণী।

পুলিসের চোখ আর মন হয়তো প্রকৃতির মধুর রস থেকে বঞ্চিত, তাই তারা সাধারণ কথা নিয়েই মশগুল হয়ে রইল, আমি আর জয়ন্ত কিন্তু এই জ্যোৎস্নায় ধোয়া, অস্ফুট সাগরকল্লোলের পাড় দিয়ে বোনা নিস্তব্ধতা চোখ আর মন দিয়ে উপভোগ করতে লাগলুম।

এই চিরন্তন স্বাভাবিকতার অন্তঃপুরে বেসুরো ধ্বনি সৃষ্টি করছিল কেবল পুলিসের জিপ-গাড়িখানা। কেমন একটা রূঢ় ধাক্কায় মন যেন চমকে চমকে উঠতে থাকে।

মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো পাহাড়ের মতন বালিয়াড়ি অর্থাৎ বালির স্তূপ। তারই মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় হরিণরা বিচরণ করছে দলে দলে। ঝিমিয়ে-পড়া সুন্দরবাবুকে চাঙ্গা করবার জন্যে জয়ন্ত বলে উঠল, 'অ দাদা, আপনি তো মরুভূমি দেখেননি, একবার ভালো করে চোখ চেয়ে দেখুন—এই হচ্ছে মরুভূমি বা তার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।'

সুন্দরবাবু মরুবালুকারও চেয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আমি মরুভূমি দেখতে চাই না, কালকেই কলকাতায় লম্বা দিতে চাই।'

—'কেন দাদা, কেন?'

—'এই কি অবসর যাপন, না বায়ুসেবন? না জোর করে খুনখারাপির মধ্যে আকর্ষণ এবং আমার মুণ্ডচ্ছেদন?'

আমি বললুম, 'সে কি দাদা, কার এত স্পর্ধা যে আপনার মুণ্ডচ্ছেদন করবে? আমি দৃঢ়কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, নিজের মুণ্ড কাঁধের উপরে যথাস্থানে নিয়ে যথাসময়েই আপনি পরমানন্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন—কেননা প্রথমত আপনার ওই সটাক মুণ্ডটি হচ্ছে অকাট্য। দ্বিতীয়ত আমাদের পূজনীয়া বউদিদিঠাকুরাণী নিত্য মা কালীর উদ্দেশে জোড়া পাঁঠা মানত করেন ওই অদ্বিতীয় টেকো মুণ্ডটিকে অখণ্ডনীয় রাখবার জন্যে!'

—'মানিক, তুমি বিলক্ষণ জানো, তোমার কথা আমার এখন একটুও ভালো লাগছে না? অতএব নীরব হও।'

খালি মানিক নয়, আর সকলেও একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। দুইদিকে দূরবিস্তৃত বালুকাশয্যার মাঝখানে একটি ঘুমন্ত ছোটো পথের রেখা, গাড়ি ছুটতে লাগল তারই উপর দিয়ে।

আচম্বিতে ইনস্পেক্টার বলে উঠলেন, 'দূরে পথের উপরেই একখানা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না?'

জয়ন্তও গোরুর গাড়িটা লক্ষ্য করেছে। সে গম্ভীরভাবে বললে, 'হুঁ।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সবাই হুঁসিয়ার!'

ধবধবে জ্যোৎস্নায় বেশ দেখা যাচ্ছিল, একখানা ছই-দিয়ে-ঢাকা গোরুর গাড়ি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের উপরে। গাড়ির ওপাশে আরও দেখা যাচ্ছিল চন্দ্রকিরণের রূপালী পালিশ মেখে নেয়া-খেয়া নদীর জল রত্নধারার মতন চকমক চকমক করছে।

জয়ন্ত বললে, 'এই খোলা জায়গায়, এই স্তব্ধ রাতে আমাদের মোটরের শব্দ নদীর ধার থেকে নিশ্চয়ই শোনা যাচ্ছে। ওখানা যদি আনন্দের গাড়ি হয়, তবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কেন?'

আমি বললুম, 'আনন্দ কি শেষটা মরিয়া হয়ে এইখানে দাঁড়িয়েই আমাদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ করতে চায়?'

সুন্দরবাবু একটু নড়েচড়ে বসে খালি বললেন, 'হুম্!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'ব্যাপারটা একটু অন্যরকম আন্দাজ করা যাচ্ছে। সাধারণত নেয়া-খেয়া নদীতে অল্প জল থাকে—তখন গোরুর গাড়ি আরোহী নিয়েই অনায়াসে নদী পার হয়ে যায়। কিন্তু কাল গিয়েছে তুমুল ঝড়-বৃষ্টির রাত্রি, ফলে অগভীর শীর্ণ নদী আজ এখনও ফুলে-ফেঁপে রয়েছে, পার হতে গেলে গোরুর গাড়ি জলের তলায় ডুবে যাবে—তাই তার গতি হয়েছে রুদ্ধ!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আনন্দ বেটা রিভলবার বাগিয়ে ছইয়ের কোনও ছ্যাঁদা দিয়ে আমাদের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে না তো?'

জয়ন্ত বললে, 'কিছুই আশ্চর্য নয়। ইনস্পেক্টার মশাই, আমাদের জিপ এখন গোরুর গাড়ির যথেষ্ট কাছে এসে পড়েছে, আর এগিয়ে কাজ নেই—গোঁয়ার্তুমিকে সাহস বলে ভাবলে মস্ত ভুল করা হবে।'

জিপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে ডাকলে, 'গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ান!'

গোরুর গাড়ি থেকে সাড়া পাওয়া গেল—'হুজুর!'

—'ভাড়া যাবে?'

—'না, হুজুর। সওয়ারী আছে।'

—'কোথায়?'

—'তিনি হরিণ শিকারে গিয়েছেন।'

—'গাড়িতে কেউ নেই?'

—'না, হুজুর!'

—'আমরা পুলিস। তুমি এখানে এসো।'

গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে জোড়হাতে ভয়ে ভয়ে জিপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'পুলিস কেন হুজুর? আমি তো কোনও অন্যায় কাজ করিনি!'

—'না, তুমি কোনও অন্যায় করনি, তোমার তাই কোনও ভয়ও নেই। এখন বলো দেখি, তোমার সওয়ারীকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

—'কোণারকের মন্দিরে।'

—'তারপর?'

—'কিন্তু নদীতে এত জল যে পার হবার উপায় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে।'

—'তোমার সওয়ারী কি বাঙালি?'

—'হ্যাঁ, হুজুর।'

—'তাঁকে দেখতে কেমন?'

—'রং কালো, রোগা, বেঁটে, বয়স বেশি নয়।'

—'গোঁফ আর মাথার চুল পাকা?'

—'না, হুজুর। ঠিক উল্টো। কালো কুচকুচে!'

—'হঠাৎ তিনি হরিণ শিকারে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কি বন্দুক ছিল?'

—'না হুজুর, কী দিয়ে শিকার করবেন, কে জানে! তিনি বললেন, চুপ করে হাত গুটিয়ে সকাল পর্যন্ত বসে না থেকে একটা হরিণ-টরিণ মেরে আনা যাক। এই বলে একটা ছোটো ব্যাগ নিয়ে নেমে গেলেন।'

—'গাড়িতে তাঁর আর কোনও মালপত্তর আছে?'

—'না, হুজুর!'

—'কতক্ষণ আগে তিনি গিয়েছেন?'

—'মিনিট কুড়ির বেশির হবে না।'

—'কোনদিকে তিনি গিয়েছেন?'

—'ওইদিকে যাচ্ছিলেন। তারপর ওই বালিয়াড়ির আড়াল পড়ে গেল, তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না।'

নবম

সুন্দরবাবু ভীরু নন

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ইনস্পেক্টারের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'একটু তফাতে আসুন। জরুরি পরামর্শের দরকার।' তারপর আমাকেও ইসারা করলে।

আমি সঙ্গে যেতে যেতে বললুম, 'তুমি সুন্দরবাবুকে ডাকলে না? তিনি ভীষণ অভিমান করবেন কিন্তু।'

—'অভিমান করবেন না হে, বরং খুশিই হবেন। তা ছাড়া তাঁর ভাবভঙ্গি যে-রকম গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে, ডাকতে গেলেই মুখঝামটা খেতে হবে—আর সব সময়ে সেটা আমার বরদাস্ত নাও হতে পারে। আজকের অ্যাডভেঞ্চার থেকে সুন্দরবাবুকে বাদ দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করা হবে।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'কেন মশাই, উনি ভয় পেয়েছেন নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'ভয়? মোটেই নয়, মোটেই নয়! সুন্দরবাবু ভীরু নন, আমি স্বচক্ষে বার বার ওঁকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ছুটে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। তবে সময়ে সময়ে তিনি অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে ওঠেন বটে। অর বর্তমান ক্ষেত্রে উনি একটু বেশি ক্ষেপে রয়েছেন, পরের ঝঞ্ঝাট নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে আমরা ওঁর ছুটির আরাম মাটি করে দিচ্ছি বলে।'

—'আপনি কী পরামর্শের কথা বলছিলেন?'

—'হ্যাঁ। শুনুন।'

তারপর জয়ন্তের সঙ্গে ইনস্পেক্টারের যে পরামর্শ হল এখানে তাঁদের কথাবার্তায় প্রকাশ না করে পরের ঘটনাবলীর দ্বারাই প্রকাশ হওয়া ভালো।

আমি সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললুম, 'দাদা, এবারে আমি ফাজলামি করছি না, গম্ভীর ভাবেই কথা বলছি। এখনই অশান্তিকর কাণ্ড-কারখানা ঘটতে পারে, আপনাকে আর তার ভেতরে অকারণে টেনে নিয়ে যেতে চাই না, আপনি বরং নিশ্চিন্তে গাড়িতে বসেই বিশ্রাম করুন!'

উত্তরে 'হাঁ' কি 'না'—কোনও জবাবই পাওয়া গেল না সুন্দরবাবুর কাছ থেকে।

ওদিকে পরামর্শমত ইনস্পেক্টার হুকুম দিলেন—'এই সেপাইরা, এগিয়ে চলো!'

আগে ইনস্পেক্টার, তারপর চারজন বন্দুকধারী পুলিস এবং সকলকার পিছনে যতটা সম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে গুটিসুটি মেরে এগোচ্ছিলাম জয়ন্ত আর আমি। নিচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হঠাৎ জয়ন্ত বললে, 'এখানেও পদচিহ্নের উপাখ্যান লেখা রয়েছে। দেখো মানিক, দেখো। একজোড়া পদচিহ্ন বালির উপর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে ওই বালিয়াড়ির দিকে। সুতরাং কোন দিকে যাব তা নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

তারপর ধীরে ধীরে ওই ভাবে অগ্রসর হয়ে চললুম আমরা মরুবালুকার উপর দিয়ে। আমাদের লক্ষ্য দূরের ওই বালিয়াড়ি।

অখণ্ড স্তব্ধতাকে যেন জাগাবার চেষ্টা করছে অশ্রান্ত ঝিল্লীঝঙ্কার। চাঁদ যেন আকাশে উঠে অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছে আমাদের এই নৈশ অভিযান। বাতাস যেন হাঁপাতে

হাঁপাতে হু-হু করে ছুটে আসছে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তাই দেখবার জন্যে।

আনন্দের পাত্তা নেই। সে কি এখান থেকে আরাও অনেকদূর এগিয়ে অন্য কোনও দিকে চলে গিয়েছে? না, ওই বালিয়াড়ির পিছনে কোথাও ঘাপটি মেরে শিকারী বাঘের মতন আমাদের কার্যকলাপ সমস্ত লক্ষ্য করছে?

হাতে হয়তো তার উদ্যত রয়েছে ম্যাগনাম রিভলবার!

জয়ন্তের বিশ্বাস—সে বেশিদূর যায়নি। আমারও তাই। ইনস্পেক্টার চুপচাপ।

সুদূর থেকে সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষও শুনছি, আবার অদূর থেকে নেয়া-খেয়া নদীর মৃদু মৃদু কলতানও কানে আসছে। একসঙ্গে যেন চলছে ধ্রুপদ ও ঠুংরি গানের সাধনা।

দেখতে দেখতে একেবারে বালিয়াড়ির কাছে এসে পড়লুম।

জয়ন্ত ফিসফিস করে বললে, 'মানিক, টুক করে বালিয়াড়ির ছায়ায় সরে এসো। এখানে ছোটো ছোটো চার-পাঁচটা বালির ঢিপি রয়েছে। লুকিয়ে থাকতে অসুবিধা হবে না।'

একে চাঁদের কিরণকে বাধা দিয়ে মস্তবড়ো ছায়ার অস্পষ্টতা রচনা করেছে প্রকাণ্ড সেই বালিয়াড়ি, তার উপরে ছোটো ছোটো বালির টিবির পিছনে আশ্রয় নিয়ে আমরা দুজন একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেলুম। লুকোবার আগে জয়ন্ত সেপাইদের কাছ থেকে একটা বন্দুক ও গোটাকয়েক কার্তুজ চেয়ে নিয়েছিল।

ইনস্পেক্টার হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উচ্চস্বরে চিৎকার করে সঙ্গের সেপাইদের বললেন, 'ধ্যেৎ, আসামি চুলোয় যাক! ব্যাটা কোনদিকে কতদূরে ভেগেছে কে জানে? আমরা তো আর সারারাত ছুটোছুটি করে মরতে পারি না! তার চেয়ে আজ ফিরে চলো, কাল আবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে!'

সেপাইরা সবাই একসঙ্গে আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে প্রত্যাগমন করতে লাগল। আর তাদের পিছু পিছু যেতে লাগলেন ইনস্পেক্টার।

বালিয়াড়ির ছায়ায় টিবির আড়ালে রয়ে গেলুম শুধু জয়ন্ত ও আমি।

বেশ খানিকক্ষণ কাটল। তারপর শোনা গেল পুলিসের জিপ-গাড়িখানার দ্রুতধাবনধ্বনি। আমাদের চোখের সামনেই গাড়িখানা ক্রমশ একটি কৃষ্ণবিন্দুতে পরিণত হয়ে তারপর চন্দ্রিকাধৌত রূপোলী রাত্রির মধ্যে হারিয়ে গেল কোথায়!

জয়ন্ত সেইরকম ফিস ফিস করে বললে, 'আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে এইবারে শ্রীমান আনন্দ আমাদের সামনে সশরীরে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দবর্ধন করবে!'

তার মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বালিয়াড়ির অন্তরাল থেকে আবির্ভূত হল যেন এক অবাস্তব ছায়ামূর্তি।

সেইখানেই দাঁড়িয়ে সে এদিকে ওদিকে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল, তারপর

কোনোদিকেই জনপ্রাণীর দেখা বা সাড়া না পেয়ে যেন খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আবার পথের দিকে অগ্রসর হল—দ্রুতপদে নয়, ধীরে ধীরে।

প্রায় জয়ন্তের গা ঘেঁষেই সে এগিয়ে গেল—দূরের নদীপথ তার দৃষ্টিকে এমন একান্ত ভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে পার্শ্ববর্তী বিপদের অস্তিত্ব সে আবিষ্কার করতে পারলে না।

কিন্তু সে দু-চার পদের বেশি অগ্রসর হবার সময় পেলে না,—জয়ন্ত আচমকা বিদ্যুতের মতন উঠে দাঁড়িয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহবিক্রমে। সে কিছু বোঝবার আগেই প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাতে তাকে একেবারে পেড়ে ফেললে বালুকাশয্যার উপরে।

পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই জয়ন্ত তার কণ্ঠদেশ দুই হাতে চেপে ধরে তাকে একটানে সশরীরে শূন্যে তুলে ধরে বারংবার প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে লাগল। অসাধারণ দীর্ঘদেহের অধিকারী জয়ন্তের দুই বলিষ্ঠ বাহুতে লম্বমান খর্বদেহী ও রোগা-টিকটিকি আনন্দকে দেখাচ্ছিল যেন মার্জারের কবলগত নেংটি ইঁদুরের মতন!

জয়ন্ত ঝাঁকানি দিতে দিতে গর্জন করে বললে, 'রাসকেল, এই শিশুর মতন দুর্বল দেহ নিয়ে তুই মানুষ খুন আর রাহাজানি করতে চাস?'

কাতর স্বরে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আনন্দ বললে, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—নইলে এখুনই আমি মরে যাব!'

—'না, আমি তোকে মারব না—তুই মরবি ফাঁসিকাঠে ঝুলে! মানিক, এর দুটো হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও তো! তারপর এর পরনের কাপড় আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে পা দুটোও শক্ত করে বেঁধে ফ্যালো!'

হাত-পা বাঁধা আসামি বালির উপরে চিৎপাত হয়ে বললে, 'আপনারা আমার ওপরে এ রকম অত্যাচার করছেন কেন কিছুই বুঝতে পারছি না?'

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে জয়ন্ত হেঁট হয়ে তার হাত থেকে ছিটকেপড়া দুটো জিনিস ভূমিতল থেকে তুলে নিলে।

একটা হচ্ছে ছোটো একটি সুটকেস এবং আর একটা হচ্ছে বৃহৎ এক রিভলবার।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, এই দেখ বিখ্যাত ম্যাগনাম রিভলবার—আসামি এই সাংঘাতিক অস্ত্র দিয়েই মহেন্দ্রবাবুকে খুন করেছিল।'

রিভলবারটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম। আকারে বড়ো ও নলচেটা একটু বেশি মোটা, চোখে দেখে ওপর থেকে এর চেয়ে বেশি কোনও বিশেষত্ব এবং ভীষণত্ব আবিষ্কার করতে পারলুম না।

জয়ন্ত বললে, 'ওহে বাপু আনন্দ, এই রিভলভার দিয়ে তুমি আরও কতগুলো মানুষকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ?'

আনন্দ বললে, 'আমি কারুকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিইনি।'

—'বেশ, সেটা কাল বোঝা যাবে—আজ রাত হয়ে গিয়েছে। দেখছ মানিক, আমার প্ল্যান বা পরিকল্পনা সফল হয়েছে—এই নেংটি ইঁদুরটাকে ধরতে গিয়ে আর রক্তপাত

করতে হল না! ওদিকে উৎকল পুলিস আর সুন্দরবাবু আমাদের শুভাশুভের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছেন—তুমি তিনবার বন্দুক ছুড়ে সঙ্কেতধ্বনি কর। এখনই সবাই আবার আত্মপ্রকাশ করবেন।'

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম—একবার, দুবার, তিনবার। গুড়ুম, গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে রাতের আকাশ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

তারপরই দূরে একটা আওয়াজ শোনা গেল—জিপ গাড়ির বেগে ছুটে আসার শব্দ! গাড়িখানা চোখের আড়ালে গিয়ে এতক্ষণ এই সঙ্কেতধ্বনির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলাবাহুল্য, এসবই জয়ন্তের নির্দেশ। পরে পরে যা ঘটবে, আগে থাকতেই সে আন্দাজ করে রেখেছিল। কিছুমাত্র রক্তপাত হল না—ম্যাগনাম রিভলবার তার মারাত্মক ধমক দেবার সুযোগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল এবং অপরাধী পরলে পুলিসের গড়া লৌহবলয়।

দশম

পদচিহ্নের উপাখ্যান

পরদিনের সকালবেলা।

'পুরুষোত্তম পান্থনিবাসে'র মালিক থানার ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের কোণে মেঝের উপরে উপবিষ্ট হাতকড়াপরা আসামির উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'এই লোকটিকে দেখতে অনেকটা আনন্দবাবুর মতন বটে, কিন্তু আনন্দবাবুর গোঁফ আর মাথার চুল ছিল পাকা।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আসামির গোঁফ আর চুল পাকা হলেই একে হুবহু আনন্দের মতন দেখতে হবে?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত এগিয়ে একটান মেরে আসামীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ওহে বাপু, একবার পাশের ঘরে চলো তো!'

জয়ন্তের পিছনে পিছনে আসামি পাশের ঘরে গেল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

কিছুক্ষণ পরে তারা আবার যখন ফিরে এল তখন আসামির গোঁফ ও মাথার চুল রীতিমতো পাকা। বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে পান্থনিবাসের কর্তা বললেন, 'এ কি ব্যাপার?'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপার কিছুই নয়—জিঙ্ক-অক্সাইড অয়েন্টমেন্টের মহিমা!'

ইনস্পেক্টার শুধোলেন, 'তাহলে আপনি গোড়া থেকেই এই সন্দেহ করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ মশাই, প্রায় তাই। আপনাদেরও সন্দেহ করা উচিত ছিল। নুলিয়াদের কাছে, পান্থনিবাসের লোকজনদের কাছে আসামি অকারণেই গায়ে পড়ে বারবার হাত দিয়ে নিজের গোঁফ আর চুল দেখিয়ে আপনাকে বুড়ো বলে জাহির করবার চেষ্টায় ছিল। অথচ সবাই বলে তার মুখখানা বুড়োর মতন দেখতে নয়। এই সব শুনেই আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়।'

ইনস্পেক্টার একটা সুটকেস খুলে বললে, 'আনন্দের এই সুটকেসের ভেতরে অন্যান্য বাজে খুচরো জিনিসের সঙ্গে এই কালো রঙের পাঞ্জাবি আর পাজামা পাওয়া গিয়েছে।'

জয়ন্ত সে দুটো পরীক্ষা করে বললে, 'দেখছি পাঞ্জাবি আর পাজামা জলে কাচা হয়েছে।'

আসামি অস্ফুট স্বরে বললে, 'জামা-কাপড় ময়লা হলেই কাচতে হয়।'

—'কী-রকম জলে কেচেছ? ঠাণ্ডা, না গরম?'

—'গরম জলে।'

হা হা করে হেসে উঠল জয়ন্ত। বললে, 'ওরে নির্বোধ, তুই কি জানিস না যে গরম জলে রক্তের ছোপ ভালো করে নিশ্চিহ্ন হয় না? এখন বল, তোর জামায় আর পাজামায় এসব অস্পষ্ট দাগ কিসের? রক্তের?'

আনন্দ জোরগলায় প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'ওসব রক্তের দাগ নয়।'

—'উত্তম। পুলিসের পরীক্ষাগারে এ দুটো জিনিস পাঠিয়ে দিলেই অচিরে জানা যাবে, এ মানুষের রক্তের দাগ কিনা—আর তা কোন টাইপের রক্ত, মহেন্দ্রবাবুর রক্তের টাইপের সঙ্গে মিল আছে কিনা!'

আনন্দ আর কথা বলল না—ঘাড় হেঁট ক'রে চুপচাপ ব'সে পড়ল মেঝেতে।

জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, আর একটা কথা, সমুদ্রতীরের পদচিহ্নের ছাঁচের সঙ্গে আনন্দের জুতো মিলিয়ে দেখেছেন কি?'

ইনস্পেক্টার বললে, 'দেখেছি। হুবহু মিলে গেছে।'

জয়ন্ত আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বৎস আনন্দ, একটি চলতি গানের ভাষায় এইবারে তোমায় প্রশ্ন করা যেতে পারে—কোনটি তোমার আসল নাম সুধাই তোমারে! আনন্দ না মোহিতলাল?'

আসামি চমকে বলে উঠল, 'আমার নাম আনন্দগোপাল মিত্র।'

জয়ন্ত এবার গম্ভীরমুখে বললে, 'উহু! তোমার নাম মোহিতলাল, তুমি হচ্ছো নিহত মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে একদা বিতাড়িত ভাগিনেয়। আমার বিশ্বাস, তোমাকে সনাক্ত করবার লোকের অভাব হবে না।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সুন্দরবাবু কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'তিনি গোঁসা করে বাসায় ফিরে গেছেন। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, পরের মামলার ঝামেলা পোয়াবার আগ্রহ তাঁর নেই। তিনি স্রেফ বেড়াতে আর হাওয়া খেতে এসেছেন এখানে।'

ইনস্পেক্টার তারপর জয়ন্তর কাছে এগিয়ে এসে গদগদ হয়ে বললেন, 'মশাই, আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা! এত তাড়াতাড়ি মামলার কিনারা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অবাক কাণ্ড!'

জয়ন্ত বললে, 'কিছু না, কিছু না! অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নিযুক্ত হওয়ার অনেক সুবিধা! তারপর প্রথমেই আমাদের পথনির্দেশ করেছে বালুকাবিতানে লেখা পদচিহ্নের উপাখ্যান। এসো মানিক, এখনও আমাদের প্রভাতী বায়ু সেবনের যথেষ্ট সময় আছে। নমস্কার মশাই, নমস্কার!'

হত্যাকারী-হত্যাকাহিনী

এক

নতুন মামলা

সবে ফুটিফুটি করছে ভোরের আলো। কলকাতার গড়ের মাঠ।

গাছে-গাছে বিহঙ্গদের ঐকতান। এখানে ওখানে অশ্বচালনা করছে ইংরেজ ঘোড়সওয়াররা। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে আরও অনেকে এবং তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের পরিচিত তিনটি মানুষকে—শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর মানিক ও পুলিসকর্মচারি সুন্দরবাবু।

শরৎ ঋতুর জন্যে আসর ছেড়ে দেবার আগে শেষ-বর্ষা যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে গিয়েছে গতকল্য রাত্রে। সারা শহরটা ঘণ্টাকয়েক ধরে স্নান করেছে এমন ঘন বৃষ্টিধারায় যে, পথের আর মাঠের অনেক জায়গাতেই এখনও থইথই করছে ঘোলাটে জল। রাত দুটোর পরে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু গড়ের মাঠ এখনও প্রাতর্ভ্রমণের উপযোগী হয়ে ওঠেনি।

তবু প্রভাতী ভ্রমণে যারা অভ্যস্ত, এ সময়টার তারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। জয়ন্ত ও মানিক হচ্ছে এই জাতীয় জীব। কেবল সূর্যোদয়ের আগে নয়, সূর্যাস্তের পরেও এক বার করে মুক্ত আকাশ-বাতাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তারা যেন আত্মস্থ হ'তে পারে না।

এ বাতিক কোনোদিনই ছিল না সুন্দরবাবুর। কিন্তু ইদানীং তাঁর উদরদেশের বিপুলতা এতটা বেড়ে উঠেছে যে, চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম—অর্থাৎ অন্তত মাইল দুয়েক পদব্রজে ভ্রমণ করতে। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আজ-কাল তাঁকে হতে হয়েছে জয়ন্তদের ভ্রমণসঙ্গী।

ভুঁড়ির দ্বারা ভারাক্রান্ত সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ পদচালনা করবার পর শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'মানিক, পথের আর মাঠের অবস্থা দেখছ তো?'

—'দেখছি।'

—'আজ আমি কিছুতেই বেড়াতে আসতুম না।'

—'তবে এলেন কেন?'

—'তোমাদের উৎপাতে দায়ে পড়ে। ভোর না হতেই, কাক-চিল না ডাকতেই বাসায় ঢুকে তুমি গাধার মতো যে ডাকাডাকি শুরু করলে! বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত চমকে জেগে উঠল। তোমার গর্দভকণ্ঠকে রুদ্ধ করবার জন্যেই আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।'

মানিক মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'আমাকে গাধা বলে আপনি যদি খুশি হন, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু বাইরে এসে কি দেখছেন না, আজকের দিনটির বিশেষত্ব?'

—'হুম্! বিশেষত্বের মধ্যে তো দেখছি কেবল জল, কাদা আর পিছল পথ!'

—'আর কিছুই দেখছেন না?'

—'উঁহুম্!'

—'তাহলে আপনার চোখের দোষ হয়েছে!'

—'চোখের কিছু দোষ হয়নি। তাহলে আমি চশমা পরতুম।'

মানিক এদিকে-ওদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'দেখছেন?'

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতভম্বের মতো বললেন, 'কিছুই দেখছি না তো!'

—'ভালো করে চেয়ে দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে স্বর্গ নেমে এসেছে মাটির কোলে।'

—'মানে?'

—'স্বর্গ বললে আমরা কোন দিকে তাকাই? আকাশের দিকে। দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে নেমে এসেছে টুকরো আকাশের সুন্দর নীলিমা। একটু পরেই দেখতে পাবেন ওখানে সাঁতার কাটছে কচি রোদের কাঁচা সোনালী। আবার সন্ধ্যার পরে হয়তো ওখানে ফুটে উঠবে নতুন চাঁদের রূপোলী জ্যোৎস্নাও!'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু তুলে বললেন, 'উঃ, ভয়ঙ্কর কাব্যি!'

জয়ন্ত এতক্ষণ নির্বাক মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'সুন্দরবাবু!'

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'কি জয়ন্ত?'

আঙুল দিয়ে এক দিক দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ওই গাছটার তলায় কি পড়ে আছে দেখছেন?'

—'একটা মানুষ শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। না, না, ওটা যে রক্তাক্ত দেহ!'

—'হুঁ। খুব সম্ভব ওটা মৃতদেহ! গড়ের মাঠে এমনধারা দৃশ্য নতুন নয়। এগিয়ে চলুন, ব্যাপারটা কি দেখা যাক।'

সুন্দরবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ব্যাপার আর কি, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। মানিক এতক্ষণ আমাকে গড়ের মাঠে মাটির উপরে স্বর্গে দেখাবার চেষ্টা করছিল। এখন সামলাও বাবা স্বর্গের ঠেলা, স্বর্গের বদলে ঘাড়ে হয়তো চাপল একটা নতুন খুনের মামলা!'

মানিক বললে, 'সত্যি সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। এমন বৃষ্টিস্নাত অম্লান প্রভাত, মনে মনে করছিলুম কাব্যালোচনা, চোখের সামনে দেখছিলুম মাটির ফ্রেমে বাঁধানো জলের পটে নীলিমার ছবি, হঠাৎ কিনা রক্তাক্ত মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে বিলুপ্ত করে দিলে সমস্ত সৌন্দর্য! নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে!'

সকলে তখন গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের নিশ্চেষ্ট দেহ। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সেটা মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তার মুখের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়—কপালের তলা থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের সমস্ত অংশটা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল চাপবাঁধা রক্তের মধ্যে খানিকটা ছিন্ন-ভিন্ন মাংস! বীভৎস দৃশ্য!

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, আত্মহত্যার নয়, হত্যার মামলা!'

জয়ন্ত বললে, 'কেউ ছররা ভরা সট-গান ছুড়ে এই বেচারার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে। আর বন্দুকটা ছোড়া হয়েছে কাছ থেকেই, নইলে মুখটা অমন ভাবে উড়ে যেত না।' সে বসে পড়ে মৃতদেহের উপরে হাত রেখে আবার বললে, 'দেহটা এখনও একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। খুব সম্ভব এর মৃত্যু হয়েছে ঘণ্টা-কয়েক আগেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চারিদিকে কত রক্ত দেখেছ?'

—'তার মানে একে হত্যা করা হয়েছে এইখানেই। ঘটনাটা ঘটেছে বৃষ্টি থামবার পরে কোনও এক সময়ে। নইলে কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতে মৃতদেহের সমস্ত রক্ত ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রাত দুটোর আগে বৃষ্টি থামেনি। আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি সকাল সাড়ে পাঁচটার পরে। হত্যাকারী কাজ সেরেছে এরই মধ্যে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এটা হচ্ছে যুবকের লাশ। জুতো আর পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রবংশের যুবক। কিন্তু ওর গায়ে রয়েছে কেবল একটা গেঞ্জি। গভীর রাতে কেবল গেঞ্জি পরে ভদ্রবংশের কোনও যুবক কি গড়ের মাঠে বেড়াতে আসে?'

—'হত ব্যক্তিকে বোধহয় কোনও গাড়িতে করে এখানে আনা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের পর হয়তো তার উপরকার জামাটা অপরাধী খুলে নিয়ে গিয়েছে।'

—'কেন?'

—'সহজে যাতে সনাক্ত করা না যায়।'

মানিক হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একখানা খাম তুলে নিয়ে তার উপরে চোখ বুলিয়ে বললে, 'কিন্তু খুব সম্ভব হত্যাকারী দেখতে পায়নি যে, এই খামখানা মৃত ব্যক্তির জামার পকেট থেকে এখানে পড়ে গিয়েছে।'

—'খামের উপরে কারুর নাম আর ঠিকানা আছে?'

—'হ্যাঁ। শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট। কলিকাতা।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা একটা বড়ো সূত্র। ওটা হয় হত ব্যক্তির, নয় হত্যাকারীর নাম আর ঠিকানা। খামের ভিতরে কোনও চিঠি আছে?'

'আছে। এই যে!' চিঠিখানা পড়ে মানিক বললে, 'বাজে চিঠি। শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোড থেকে এক চন্দ্রনাথ রায় মণিমোহনকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেছে।'

'বাজে চিঠি নয়, ওটাও কাজে লাগবে। সুন্দরবাবু, আপনার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে না?'

সুন্দরবাবু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! কিন্তু ব্যাগের ভিতরে খালি ঢু-ঢু!'

জয়ন্ত আশেপাশে জমি পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'দেখছি এখানে বৃষ্টিভেজা মাটির উপরে তিন জন লোকের আলাদা আলাদা পায়ের ছাপ আছে। ধরলুম তিন জনের এক জন হচ্ছে নিহত মণিমোহন। তাহলে আর দুজন কে? নিশ্চয়ই হত্যাকারী! সুন্দরবাবু, পদচিহ্নগুলোর প্লাস্টারের ছাপ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সুন্দরবাবু খুশি মুখে বললেন, 'প্রথমেই যখন এতগুলো সূত্র পাওয়া গেল, মামলাটার কিনারা করতে বেশি বেগ পেতে হবে না বোধহয়।'

জয়ন্ত বললে, 'আরও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। হত ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের চিনত, তাদের বিশ্বাস করত, নইলে রাত দুটোর পর গড়ের মাঠে এমন নির্জন জায়গায় তাদের সঙ্গে বিনা বাধায় আসতে রাজি হত না! আপাতত এই পর্যন্ত। সূর্য উঠেছে, চারিদিকে লোকের ভীড়, চলো মানিক, স্থানান্তরে প্রস্থান করি!'

দুই
হেঁয়ালির মামলা

মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট।

সুন্দরবাবু যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন।

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সুন্দরবাবুর ধরাচূড়াপরা চেহারা দেখেই চমকে উঠল তাঁর দুই চক্ষু।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'এ বাড়িতে মণিমোহন বসু বলে কেউ থাকে?'

—'থাকে। মণি আমার ছেলে।'

—'আপনার নাম কি?'

—'মহেন্দ্রমোহন বসু।'

—'মণিবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

—'মণি কাল থেকে বাড়িতে ফেরেনি। তার জন্যে আমরা বড়ো ভাবছি। সে তো না বলে বাইরে কখনও রাত কাটায় না!'

—'বটে! আপনার ছেলের বয়স কত?'

—'আটাশ।'

—'গায়ের রং?'

—'উজ্জ্বল শ্যাম।'

—'একহারা, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বাইরে যাবার সময়ে সে কি রকম পোষাক পরেছিল?'

—'সিল্কের পাঞ্জাবি। সরু কালাপেড়ে মিলের ধুতি। পায়ে ব্রাউন রঙের জুতো।'

—'আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু আসবেন?'

—'কোথায়?'

—'মর্গে।'

মহেন্দ্রের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সবিস্ময়ে বললেন, 'মর্গে!'

—'আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু না বলেও আর উপায় নেই। আজ আমরা একটা লাশ পেয়েছি। সেটা আপনার ছেলের দেহও হতে পারে।'

মহেন্দ্র টলে পড়ে যাচ্ছিল, সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দুইহাতে তাকে ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, 'স্থির হোন মহেন্দ্রবাবু! আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের অনুমান হয়তো সত্য নয়।'

শবাধারে গিয়ে সন্দেহ কিন্তু সত্য বলেই প্রমাণিত হল। যদিও শবের মুখ চেনবার উপায় নেই, তবু দেহটা পরীক্ষা করেই মহেন্দ্র সক্রন্দনে বলে উঠল, 'এ আমারই মণিমোহন!'

খানিক পরে শোকের প্রথম ধাক্কাটা সে যখন কতকটা সামলে নিলে, সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ছেলে কি কাজ করত?'

—'মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করত, কিন্তু আপাতত বেকার হয়ে বসেছিল।'

—'দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আমাদের ধারণা, মণিমোহন যাদের হাতে মারা পড়েছে, সে তাদের চিনত। সে কি রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, আপনি কি তা জানতেন?'

—'যতদূর জানি, আমার ছেলের অসৎ সংসর্গ ছিল না। সে নিজেও ছিল শান্ত-শিষ্ট, অতি ভদ্র, মেলামেশাও করত সেই রকম সব লোকের সঙ্গে।'

—'তার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আপনি চেনেন?'

—'চিনি। কিন্তু তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল একজনের সঙ্গে। তার নাম নন্দলাল মিত্র।'

—'ঠিকানা?'

—'পাঁচ নম্বর রায় রোড।'

—'তার সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন?'

—'নন্দ বড়ো ভালো ছেলে। মণিরই সমবয়সী। কে, সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের কেসিয়ার।'

—'হুম্। মণিমোহনের আর কোনও বন্ধুর কথা বলতে পারেন?'

—'বিশেষ কিছু খবর রাখি না। নন্দের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে আর কারুকে জানি না। তবে হালে—'

—'বলুন, থামলেন কেন?'

—'হালে মণির সঙ্গে একটি লোকের আলাপ হয়েছে বটে। লোকটিকে আমার ভালো লাগত না।'

—'ভালো লাগত না! কেন?'

—'প্রকৃতির কথা জানি না, তবে আকৃতি ছিল তার বিরুদ্ধে। অত্যন্ত কাঠখোট্টা চেহারা!'

—'তার নাম?'

—'চন্দ্রনাথ রায়।'

নাম শুনেই সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন অধিকতর। ঘটনাস্থলে যে পত্র পাওয়া গিয়েছে, তারও লেখকের নাম চন্দ্রনাথ রায়। তিনি বললেন, 'চন্দ্রনাথ কি শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোডে থাকে?'

—'ঠিক ঠিকানা জানি না, তবে সে শালিখাতেই থাকে বটে।'

—'তার চেহারাটা বর্ণনা করুন।'

—'রং কালো। আর এক পোঁচ বেশি কালো হলেই সে আফ্রিকার কাফ্রিদের দলে গিয়ে ভিড়তে পারত। মাথায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। রীতিমতো বলবান দোহারা দেহ। খ্যাঁদা নাক, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গোঁফ-দাড়ি কামানো। সর্বদাই কোট-প্যান্ট পরে আর হাতে থাকে একগাছা মোটা বাঘমারা লাঠি। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আধখানা নেই।'

—'হুম্! যে বর্ণনা পেলুম, ভিড়ের ভিতর থেকেও চন্দ্রনাথকে চিনে নিতে দেরি লাগবে না। আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, কেবল চেহারার জন্যেই কি আপনার চন্দ্রনাথকে ভালো লাগত না?'

—'না। তার গলার আওয়াজ যেমন কর্কশ কথাবার্তাও তেমনই রুক্ষ। তার সঙ্গে মেলামেশার পর থেকেই মণির প্রকৃতিও যেন একটু একটু বদলে গিয়েছিল।'

—'কি রকম?'

—'তার হাবভাব-ব্যবহার কিঞ্চিৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।'

—'তার মানে?'

—'সে যেন সর্বদাই কি চিন্তা করত। বাড়ির কারুর সঙ্গে বেশি কথা কইত না, আমাকেও যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত। আমরা ভাবতুম বেকার বসে আছে বলেই সে এমন মনমরা হয়ে আছে।'

—'তাও অসম্ভব নয় তো!'

—'খুব সম্ভব তাই। কিন্তু মণির আরও একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছিলুম।'

—'বলুন।'

—'মণি আগে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরে আসত। কিন্তু ইদানিং বাড়ি ফিরতে তার রাত দশ-এগারোটা হয়ে যেত।'

—'কত দিন থেকে এটা লক্ষ্য করেছেন?'

—'চন্দ্রনাথের সঙ্গে মণির আলাপ হওয়ার পর থেকেই।'

—'চন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছে কত দিন?'

—'সে প্রথমে আমার বাড়িতে আসে মাস পাঁচেক আগে।'

—'মহেন্দ্রবাবু, মৃতদেহের মুখ নেই বললেই হয়। ও দেহ যে আপনারই পুত্রের, সেটা ঠিক চিনতে পেরেছেন তো?'

মহেন্দ্র ভগ্ন স্বরে বললে, 'কোনও সন্দেহ নেই—কোনও সন্দেহ নেই! আমি বাপ, নিজের ছেলের দেহ চিনতে পারব না! সেই রং, সেই গড়ন, আঙুলে পলার আংটি,

পায়ে সেই জুতো! পরনের কাপড়েও আমাদের ধোপার মার্কা! বেশ বুঝেছি মশাই, আমারই কপাল পুড়েছে!' বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

সুন্দরবাবু মমতাভরা গলায় বললেন, 'নিয়তি বড়ো নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই মহেন্দ্রবাবু! আপাতত আমার আর কোনও জিজ্ঞাস্য নেই, আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

মহেন্দ্রের প্রস্থান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবুর চিন্তা ঃ হুম্! শালখের চন্দ্রনাথ! রঙে কাফ্রি, নামে চন্দ্র—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! আকৃতি-প্রকৃতি নাকি সন্দেহজনক! এইবারে তোমার দিকেই আমি পদচালনা করব!

কিন্তু সুন্দরবাবুকে বেশি দূর পদচালনা করতে হল না। শবাগারের বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন, একখানা মোটর এসে সেইখানে দাঁড়ালো এবং গাড়ির ভিতর থেকে নেমে পড়ল একটি যুবক। তার মুখের ভাব উদ্বিগ্ন।

সে বললে, 'আপনিই তো সুন্দরবাবু?'

—'হুম্।'

—'আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

—'কেন?'

—'আমার ছোটো ভাই নন্দলাল কাল সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। থানায় সেই খবর দিতে গিয়ে শুনলুম, আপনারা না কি একটি মৃতদেহ পেয়েছেন। আমি কি দেহটা একবার দেখতে পাই না?'

সুন্দরবাবু শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'সেটা দেখে কি হবে?'

—'দেহটা যদি নন্দের হয়?'

—'অসম্ভব! তা সনাক্ত হয়ে গিয়েছে।'

—'কে সনাক্ত করেছে?'

—'যার লাশ, তার বাপ নিজে।'

—'ভগবান করুন, ও দেহ যেন অন্যেরই হয়! তবু দয়া করে আমাকে কি একটি বার দেখবার সুযোগ দেবেন না?'

—'আরে বাবা, খুনের মামলা—যা আমার চোখের বালি! আমার মগজে এখন বোঁ-বোঁ করে চরকি ঘুরছে, এসব বাজে ব্যাপার ভালো লাগছে না, আমি চললুম।' বিরক্ত মুখে সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত হলেন।

যুবক হাত জোড় করে বিনীতভরে বললে, 'দয়া করুন, একটি বার দেখতে দিন!'

সুন্দরবাবু নাচার ভাবে বললেন, 'আপনি তো ভারি ছিনে জোঁক দেখছি! বেশ চলুন, নয়ন সার্থক করুন!'

মৃতদেহের উপরে অর্ধ মিনিট কাল চক্ষু বুলিয়েই যুবক চিৎকার করে কেঁদে উঠল!

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আরে গেল, খামোকা কান্নাকাটি কেন?'

—'এই তো আমার ভাই নন্দলালের দেহ! যা ভেবেছি তাই, আমাদেরই সর্বনাশ হয়েছে?'

—'আরে, আপনি পাগল না কি!'

—'আমি পাগল নই মশাই, পাগল নই! বিশ্বাস না হয় ওর কাপড় তুলে দেখুন, জানুর উপরে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ আছে!'

অবিশ্বাস ভয়ে সুন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন। কাপড় সরানো হল। জানুর উপরে সত্য সত্যই রয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের চিহ্ন!

ধাঁ করে তাঁর মাথায় জাগল একটা নূতন সন্দেহ! আগ্রহের সঙ্গে তিনি শুধোলেন, 'আপনার ভাইয়ের নাম নন্দলাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নন্দলাল মিত্র?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বাড়ি পাঁচ নম্বর রায় রোডে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তার এক বিশেষ বন্ধুর নাম মণিমোহন বসু?'

—'হ্যাঁ।'

সুন্দরবাবু টুপি খুলে নিজের টাক চুলকোতে চুলকোতে হতভম্বের মতো বললেন, 'এ কি কাণ্ড রে বাবা! এটা খুনের মামলা, না হেঁয়ালির মামলা?'

তিন

চন্দ্রনাথ রায়

প্রভাতী চায়ের আসরের জন্যে দুজনে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে হন্তদন্তের মতো সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

জয়ন্ত শুধোলে, 'এ কি সুন্দরবাবু, হাঁপাচ্ছেন কেন?'

—'দৌড়ে দৌড়ে আসছি যে!'

—'দৌড়ে দৌড়ে?'

—'প্রায়! পাছে চা-পানের মাহেন্দ্রক্ষণটি উৎরে না যায়, সেই ভয়ে সবেগে পদচালনা করেছিলুম। গেল তিন দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ভয় হল আসর থেকে বুঝি নাম কাটা যায়!'

—'তাহলে গেল তিন দিন বাড়িতে বসে চা-পান করেছেন?'

—'পাগল! আমার বাড়ির চা ছুঁই না। সে যেন নালতের মতন, আর দোকানের চা-ও খাই না, সে যেন ঘোলাটে গঙ্গাজল। আজ তিন দিন আমার চা খাওয়াই হয়নি।'

—'ব্যাপার কি?'

—'গড়ের মাঠের সেই হত্যাকাণ্ডের ঠেলা। হন্তদন্তের মতো খালি তদন্ত আর

তদন্ত আর তদন্ত করতে হয়েছে। সূত্রও পেয়েছি ঢের, কিন্তু সব সূত্র জোট পাকিয়ে গিয়েছে।'

—'আচ্ছা, আগে চেয়ারাসীন হোন। উদরদেশের চায়ের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করুন। তার পর সব কথা শুনব।'

সুন্দরবাবু আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আজ চায়ের সঙ্গে নতুন কোনও বিশেষত্ব আছে না কি?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বিস্কুট, টোম্যাটো-ওমলেট আর কলাইসুটির কচুরি।'

—'ব্যাস, ব্যাস, ব্যাস! ওইতেই আমি খুশি হতে পারব, সত্যি বলতে কি ভায়া, বাড়ির চা আরও ভালো লাগে না কেন জানো? তোমাদের বউদিদিটি দ্রৌপদী নন, নূতন-পুরাতন যে কোনও রন্ধনে তিনি একেবারে মূর্তিমতী নিরাশা! হুম্, কথায় বলে চা-টা! চায়ের সঙ্গে কিছু-কিছু 'টা' না থাকলে চা কখনও সুপেয় হয়?

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আমাদের বউদিদি দ্রৌপদী হলে আপনি কি তাঁকে সহ্য করতে পারতেন?'

—'মানে?'

—'দ্রৌপদীর ছিল পাঁচ জন স্বামী।'

—'ধ্যেৎ, খালি কথার ছল ধরা! আচ্ছা জয়ন্ত, টোম্যাটো-ওমলেট পদার্থটা কি?'

—'ওমলেটের ভিতরে মাখনে ভাজা কুচি কুচি পেঁয়াজ আর টোম্যাটো পুর। খুব সহজ রান্না।'

—'কিন্তু খেতে মজা তো? নাম শুনেই জিভে জল আসছে! কোথায় হে শ্রীমধুসূদন, শীঘ্র দেখা দাও।'

ট্রে হাতে মধু-ভৃত্যের প্রবেশ। চা-পর্ব শেষ হবার আগে সুন্দরবাবু আর বাক্যালাপ করবার চেষ্টা করলেন না।

জয়ন্ত বললে, 'অতঃপর?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমরা মর্গের ব্যাপারটা তো আগেই শুনেছ? বেশ, তারপর থেকেই আরম্ভ করি। শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের সন্ধানে গিয়েছিলুম। কিন্তু তার বাসা খালি, বাহির থেকে তালাবন্ধ। খবর নিয়ে জানলুম, হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকালে একখানা কালো রঙের বুইক সিডান গাড়িতে চড়ে সে চলে গিয়েছে।'

—'গাড়িখানা তার নিজের।'

—'হ্যাঁ। গাড়ি চালাত নিজেই।'

—'বাসায় কি সে একলা থাকত?'

—'হ্যাঁ। অর্থাৎ চাকর-বামুন-দারোয়ান নিয়ে একলা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও অদৃশ্য হয়েছে। এইটেই সন্দেহজনক।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে বললে, 'অসাধারণ মামলা বটে!

মহেন্দ্রবাবু লাশ দেখে বলছেন সেটা তাঁর পুত্র মণিমোহনের মৃতদেহ। আর এক জন বলছে, সে দেহটা হচ্ছে তার দাদা নন্দলালের। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথামতো লাশের জানুর কাপড় তুলে দেখা গিয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাই ঠিক। কারণ লাশের মুখ নেই, মহেন্দ্রবাবুর ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনলুম মণিমোহনের আর নন্দলালের দেহের রং, উচ্চতা আর গড়ন-পিটন না কি প্রায় একই রকম।'

—'এখানে প্রশ্ন ওঠে অনেকগুলো। ধরলুম হত ব্যক্তি হচ্ছে নন্দলাল। তাহলে হত্যাকারী কে? মণিমোহন? কিন্তু মহেন্দ্রের মুখে প্রকাশ, নন্দ ছিল তার সব চেয়ে বড়ো বন্ধু। সে অমন বন্ধুকে হত্যা করবে কেন? ঘটনাস্থলে আর এক ব্যক্তির পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সেইই বা কে? শালিখার চন্দ্রনাথ? সে এখানে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছে? নিশ্চয়ই মহাত্মার ভূমিকায় নয়, কারণ সেও গা-ঢাকা দিয়েছে। হ্যাঁ, ভালো কথা। যে তিন জন লোকের পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে, তার প্লাস্টারের ছাঁচ তোলা হয়েছে?'

—'হয়েছে।'

—'তারপর?'

—'একজোড়া ছাপের সঙ্গে হত ব্যক্তির—অর্থাৎ নন্দের জুতো অবিকল খাপ খেয়ে গিয়েছে। মণিমোহনের বাসা থেকে তার জুতোও সংগ্রহ করেছি। তার জুতোও মিলে গিয়েছে আর এক জোড়া ছাপের সঙ্গে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে পাইনি, তাই ছাপের সঙ্গে তার জুতোও মেলানো হয়নি।'

—'কিন্তু আপনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। পদচিহ্নের ছাপ বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করছে দুটো সত্য। প্রথমতঃ, ঘটনাস্থলে মণিমোহনের উপস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ, হত ব্যক্তি নন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। মামলাটা অনেকখানি হালকা হয়ে এল না কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু মামলাটার আর কোনও কোনও দিক আরও ভারি হয়ে উঠেছে।'

—'কি রকম?'

—'বলেছি তো, নন্দ ছিল কে. সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের কেসিয়ার! সেখানে এক নতুন কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।'

—'বুঝেছি। চুরি।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেমন করে বুঝলে?'

জয়ন্ত রূপোর ডিবে বার করে এক টিপ নস্য গ্রহণ করলে। মানিক কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালে। সে জানে, এই নস্যগ্রহণটা হচ্ছে তার বন্ধুর বিশেষ আনন্দের লক্ষণ।

সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'কেমন করে বুঝলে তুমি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'এটা আমার আন্দাজ মাত্র।'

—'বা রে, এমন যুক্তিহীন আন্দাজের কোনও কারণ নেই?'

—'কারণ আছে বইকি! আমার আন্দাজ মোটেই যুক্তিহীন নয়। লোকে অকারণে

নরহত্যা করে না। কিন্তু গোড়া থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমি কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নন্দ মারা পড়েছে ওই টাকার জন্যেই। যদিও হত ব্যক্তি বিখ্যাত এক জুয়েলারি ফার্মের কেসিয়ার শুনে একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি মারছিল। এখন জানা গেল, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। সুন্দরবাবু, আন্দাজে আমি আরও একটা কথা বলতে পারি।'

—'পারো না কি? বলে ফ্যালো।'

—'কে. সরকারের ফার্ম থেকে মোটা রকম চুরি হয়ে গিয়েছে, আর চুরির জন্যে দায়ি ওই হত নন্দলাল।'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে তালে তালে তিন বার তালি দিয়ে বললেন, 'ঠিক! ঠিক! ঠিক! বা রে আন্দাজ। বা রে জয়ন্ত!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি।'

—'কে. সরকার নিজে থানায় অভিযোগ করতে এসেছিলেন।'

—'কিসের অভিযোগ?'

—'চুরি বলেই ধরে নাও। চুরিটা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দিনেই। কে. সরকারের বসত-বাড়ি আর দোকান এক জায়গায় নয়। তাঁর দোকান বন্ধ হত সন্ধ্যার মুখে। সেদিন দোকান বন্ধ হবার আগেই জরুরি কাজের জন্যে তাঁকে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। কথা ছিল, দোকানের ক্যাস নিয়ে দোকান বন্ধ করে নন্দ তাঁর বড়িতে জমা দিয়ে আসবে। কিন্তু নন্দ সেদিন ক্যাস নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।'

—'টাকার পরিমাণ কত?'

—'তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ।'

—'নন্দের সম্বন্ধে কে. সরকারের ধারণা কি?'

—'অত্যন্ত উচ্চ। বললেন, নন্দ অতিশয় বিশ্বাসী আর সৎচরিত্র, তার দ্বারা কোনোরকম অসৎ কাজ হওয়া অসম্ভব।'

—'ঠিক। আমারও ওই বিশ্বাস।'

—'জয়ন্ত, আরও একটা এমন ব্যাপার জানা গিয়েছে, যা তুমিও কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না।'

—'পদে পদে আন্দাজে ঢিল ছোড়ার অভ্যাস আমার নেই।'

—'লাশের পরনে যে গেঞ্জি আর কাপড় ছিল, তা নন্দের নয়, মণিমোহনের।'

—'শুনে বিস্মিত হলুম না। নন্দের পরনে কোট বা অন্য কোনও রকম জামাও ছিল, অপরাধীরা তা খুলে নিয়ে গিয়েছে, প্রথম দিনেই আন্দাজে এ কথাটা আপনাকে বলেছিলুম। সুন্দরবাবু, দোকান থেকে নন্দ সেদিন বাসায় ফিরে এসেছিল?'

—'হ্যাঁ, তার বাসা দোকান থেকে কে, সরকারের বাড়িতে যাবার পথেই পড়ে। বাসায় এসে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খেয়ে আবার সে বেরিয়ে যায়—'

'হ্যাঁ, মালিকের বাড়িতে টাকাগুলো পৌঁছে দেবার জন্যে। তার পরের ঘটনাগুলোও আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি।'

—'হুম্, আবার আন্দাজ!'

—'নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মণিমোহনের সঙ্গে দেখা। আমার বিশ্বাস, সে ছিল শালিখার চন্দ্রনাথের কালো রঙের বুইক সিডানগাড়িতে, আর গাড়ি চালাচ্ছিল চন্দ্রনাথ নিজেই। মণিমোহনের আহ্বানে নন্দ গাড়িতে এসে ওঠে। নন্দের কাছে কত টাকা আছে প্রকাশ পায়। তার পরের ব্যাপারগুলো ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। নন্দ গাড়িতে ওঠে সন্ধ্যার সময়ে, কিন্তু মারা পড়ে অন্তত রাত দুটোর পরে। মাঝের কয়েক ঘণ্টার হিসাব হত্যাকারী ধরা না পড়লে জানা যাবে না। নন্দকে হত্যা করে চন্দ্রনাথ আর মণিমোহন—আমার বিশ্বাস, আসল হত্যাকারী হচ্ছে চন্দ্রনাথই, মণিমোহন বোধহয় স্বহস্তে বন্ধুহত্যা করেনি। তারপর মৃতদেহের জামা-কাপড় খুলে পরিয়ে দেওয়া হল মণিমোহনের জামা-কাপড়। লাশের মুখ নিশ্চিহ্ন, তার দৈর্ঘ্য, রং আর গড়ন-পিটন প্রায় মণিমোহনের মতোই তার পরনেও রইল মণিমোহনের জামা-কাপড়। সুতরাং সেটা মণিমোহনের দেহ বলেই সনাক্ত হওয়া স্বাভাবিক। সকলে বুঝবে, কোনও অজানা ব্যক্তি অজানা কারণে মণিমোহনকে হত্যা করেছে। ওদিকে পুলিস ভাবত নন্দ জুলেয়ারি ফার্মের টাকা চুরি করে পলাতক হয়েছে। অপরাধীরা খুব মাথা খেলিয়ে প্ল্যান তৈরি করেছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ করে দিলে তুচ্ছ একটা জড়ুল আর কতকগুলো পায়ের দাগ। সুন্দরবাবু, এইবারে আপনার মামলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তো?'

সুন্দরবাবু বললেন 'তা তো গেল দেখছি। কিন্তু—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু আমার আর একটা আন্দাজ এই। কাজ হাঁসিলের পর চন্দ্রনাথ হয়তো মণিমোহনকেও হত্যা করেছে।'

—'হুম্, আন্দাজেই তুমি কেল্লা ফতে করবে দেখছি। এখন চন্দ্রনাথকে হস্তগত করবার উপায়টাও আন্দাজে বাৎলে দিতে পারো?'

এমন সময়ে মধু ঘরে ঢুকে বললে, 'শালখে থেকে একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন।'

জয়ন্ত সচমকে বললে, 'শালখে থেকে? নাম বলেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ রায়।'

সুন্দরবাবু বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে বললেন, 'হুম্!'

চার

অভিনেতা চন্দ্রনাথ

সত্য সত্যই কল্পনাতীত। পলাতক আসামি চন্দ্রনাথ নিজেই দেখা করতে এসেছে তাদের সঙ্গে! মামলাটার গোড়াতেই কোনও গলদ নেই তো? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু খুসিভরা গলায় বললেন, 'আমাদের ভাগ্য ভালো। শিকার নিজেই জালে পড়তে চায়।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এখন চন্দ্রনাথকে নিয়ে কি করবেন?'

—'আগে করব গোটাকয় প্রশ্ন। তারপর তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার জুতো মিলিয়ে দেখব।'

জয়ন্ত বললে, 'মধু, বাবুকে এখানে নিয়ে এসো।'

মধুর প্রস্থান। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে চন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু লক্ষ্য করে দেখলেন মণিমোহনের পিতার বর্ণনার সঙ্গে তার চেহারা মিলে যায় অবিকল। প্রায় ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ঠ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ। নাক খ্যাঁদা কুৎকুতে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। পরনে প্যান্ট-কোট, হাতে বেজায় মোটা লাঠি। বাঁ হাতে আধখানা কাটা কড়ে আঙুল।

দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে ও সপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকেই চন্দ্রনাথ বললে, 'আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

—'আমার সঙ্গে? কিন্তু এখানে কেন? এটা কি আমার ডেরা?'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়! কে না জানে বাঘ থাকে বনে আর পুলিশ থাকে থানায়? আমি থানাতেও ধরনা দিতে গিয়েছিলুম। সেখানে থেকেই পেয়েছি এখানকার ঠিকানা।'

লোকটার প্রগলভতা দেখে সুন্দরবাবুর মনে হল ক্রোধের সঞ্চার। কিন্তু সে ভাব দমন করে তিনি শুধোলেন, 'আপনার নাম চন্দ্রনাথ রায়?'

—'তাই তো আমি জানি, লোকেও আমাকে ওই বলেই ডাকে বটে।'

তার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ বাড়িয়ে তুললে সুন্দরবাবু ক্রোধের মাত্রা। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলায় তিনি বললেন, 'মশায়ের পিতৃদেব কি অন্ধ ছিলেন?'

—'উঁহু।'

—'তবে মশাইকে কি স্বচক্ষে দেখে তিনি আপনার নাম রাখেননি?'

চন্দ্রনাথ নীরস কণ্ঠে হেসে উঠল—হা হা হা হা হা হা। বললে, 'ঠিক কথা। আমার গায়ের রংটা চাঁদের মতো নয় বটে! হ্যাঁ, বাবার যে ভ্রম হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কি করব বলুন, পিতা হচ্ছেন দেবতা-স্থানীয়, পুত্র হয়ে তাঁর ভ্রম আর শোধরাবার চেষ্টা করিনি।'

—'বেশ, তাহলে বাপের সুপুত্রের মতন ওই চেয়ারখানার উপরে একটু বসুন দেখি, আমি গোটা কয় প্রশ্ন করতে চাই।'

চেয়ারখানা হড় হড় করে সুন্দরবাবুর খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসে পড়ল। তারপর মোটা লাঠিগাছা পদযুগলের মাঝখানে রেখে তার উপরে দুই হস্ত স্থাপন করে বললে, 'আপনার প্রশ্নগুলো শ্রবণ করবার জন্যে আমার দুই কর্ণ অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।'

এ কি রকম ট্যাটা অপরাধী, পুলিস দেখে দূরে সরে দাঁড়ানো দূরের কথা, পুলিসের

গা ঘেঁষে বসতে ভয় পায় না! ভালো কথা নয় তো, যা দিন কাল পড়েছে, সাবধানের মার নেই। সুন্দরবাবু নিজেই তফাতে সরে গিয়ে দখল করলেন অন্য একখানা চেয়ার।

চন্দ্রনাথ হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে আপনার দেখা করবার শখ হল কেন?'

—'শুনলুম, সেদিন আমার বাড়িতে আপনি বেড়াতে গিয়েছিলেন।'

—'বেড়াতে নয়, অপনাকে খুঁজতে।'

—'বেশ তাই। কিন্তু কেন?'

—'নন্দলাল মিত্র খুন হয়েছে জানেন?'

—'কে নন্দলাল?'

—'একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে! মণিমোহন বসুর বিশেষ বন্ধু নন্দলালকে চেনেন না নাকি?'

—'না, আমি কেবল মণিমোহনকেই জানি।'

—'বটে। গেল পঁচিশে তারিখে মণিমোহনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

—'না।'

—'ওই তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?'

—'সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসাতেই ছিলুম। তার পর হঠাৎ এক আত্মীয়ের মারাত্মক অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশে চলে যেতে হয়।'

—'চাকর-বামুন-দারোয়ান সবাইকে নিয়ে?'

—'নিশ্চয়! একলা মানুষ, আমাকে দেখবে কে?'

—'আপনার দেশ কোথায়?'

—'এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ভজনপুর গ্রামে।'

—'আপনার সট-গান আছে?'

—'আছে। অন্য রকম বন্দুকও আছে।'

—'মণিমোহন আপনার বন্ধু।'

—'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু?'

—'তাকে আপনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন, পঁচিশে তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?'

—'না।'

—'ওই তারিখের পর তার সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?'

—'না।'

—'সে এখন কোথায় আছে?'

—'জানি না।'

—'তার আর কোথায় আসা-যাওয়া আছে?'

—'ভগবান জানেন।'

—'ঘটনাস্থলে তিন জন লোকের পদচিহ্ন পাওয়া গেছে। মণিমোহনের আর নন্দলালের! কিন্তু তৃতীয় পদচিহ্নের অধিকারী কে, তা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'শুনে দুঃখিত হলুম।'

—'আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি চুলোয় গেলেও আমি দুঃখিত হব না। হুম্! আমি এখন ভাবছি, কে এই তৃতীয় ব্যক্তি?'

—'বলতে পারব না, আমি গণৎকার নই।'

—'আরে গেল, এ প্রশ্ন কি আপনাকে করছি? আমি কথা কইছি নিজের সঙ্গেই। নিজের মনের ভিতরেই আমি উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করছি।'

—'চেষ্টা করুন। আপনার আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

—'আপাতত নেই।'

—'তাহলে আমি গাত্রোত্থান করতে পারি?'

—'নিশ্চয়ই! এইবারে আপনাকে গাত্রোত্থান করতে হবেই।'

—'তবে এই গাত্রোত্থান করলুম।'

সুন্দরবাবুও আসন ত্যাগ করে বললেন, 'এইবারে আপনাকে আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে।'

—'কোথায়?'

—'থানায়।'

চন্দ্রনাথ সভয়ে বলে উঠল, 'থানায়? কেন?'

—'যথাসময়েই সেটা জানতে পারবেন।'

—'আপনার সব কথারই জবাব তো দিলুম। আবার আমাকে থানায় টেনে নিয়ে যাবার কারণটা কি?'

—'কারণ? জলখাবার খাওয়াবার জন্যে নয়। ধরুন অকারণেই।'

এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ যেন হারিয়ে ফেললে নিজের সমস্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততা। কাতর কণ্ঠে বললে, 'অকারণে আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কি সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু নিজের বাহু বিস্তার করে সবলে ধারণ করলেন চন্দ্রনাথের দক্ষিণ বাহু। তারপর বললেন, 'হুম্! এখন সুড় সুড় করে আমার সঙ্গে চলুন তো! পরে ভাবা যাবে লাভ-লোকসানের কথা। আসি জয়ন্ত, আসি মানিক। খানিক পরেই ফোনে তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করব। আসুন, অমাবস্যার দৃশ্যমান চন্দ্র!'

চন্দ্রনাথ কলের পুতুলের মতো চলে গেল সুন্দরবাবুর সঙ্গে।

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মানিক, এইবারে আমরা মতামত বিনিময় করি এসো। চন্দ্রনাথ লোকটাকে তোমার কেমন লাগল?'

—'ভালো লাগল না।'

—'ঠিক। একেবারে পয়লা নম্বরের অপরাধীর চেহারা। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?'

—'কি?

—'চন্দ্রনাথ যতক্ষণ এখানে ছিল, একবারও সোজাসুজি তোমার আর আমার দিকে তাকায়নি! অথচ সে ছিল আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কারণ মাঝে মাঝে ওই বড়ো আয়নাখানার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিচ্ছিল আমাদের।'

—'কিন্তু সে এখানে এসেছিল কেন?'

—'অভিনয় করতে।'

—'অভিনয় করতে?'

—'হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণিত করতে।'

—'কিন্তু এ ভয়ও তো তার থাকা স্বাভাবিক যে, ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার নিজের পদচিহ্নও মিলে যেতে পারে?'

—'তা পারে। এইখানেই আমার কেমন খটকা লাগছে। এমন সম্ভাবনার কথা যে তারও মাথায় জাগেনি, তাকে তো এতটা নির্বোধ বলে মনে হল না। সুন্দরবাবু তো ওই জন্যেই তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেলেন।'

—'আর থানায় যাবার নামেই সে ভয়ে কি রকম জড়োসড়ো হয়ে পড়ল, লক্ষ্য করেছ তো?'

—'তা আবার করিনি? কিন্তু তা হচ্ছে অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়! আসলে সে একটুও ভয় পায়নি।'

—'কেমন করে জানলে?'

—'এখানে আসবার আগে সে নিজেই তো সুন্দরবাবুর খোঁজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। সুতরাং থানায় যাবার নামে তার ভয় পাবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। সে ভয় পায়নি, ভয়ের অভিনয় করছিল।'

—'কেন?'

—'বোধহয়, সুন্দরবাবুকে সে একেবারে অপদস্থ করতে চায়। আমার মনে হয়, সে ভালো করেই জানে যে, থানায় গিয়ে সুন্দরবাবু তার পদচিহ্ন পরীক্ষা করবেন।'

—'বল কি হে?'

—'হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে জানো? ঘটনাস্থলের পদচিহ্নের সঙ্গে মিলবে না তার পদচিহ্ন। পুলিস বনবে বোকা। সে হবে সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত। নিশ্চয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে আজ সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নইলে তার এই অভাবিত আবির্ভাবের কোনও অর্থই হয় না। যাক গে ওসব কথা। সুন্দরবাবু তো এখনও ফোন করলেন না দেখছি। আপাতত আমরা কি করি বলো তো? দুএক চাল দাবা-বোড়ে খেলবে না কি?'

—'আপত্তি নেই।'

চলল খেলা। চল্লিশ মিনিট পরে প্রথম চাল খেলা শেষ হল। আর এক চালের জন্যে তারা ঘুঁটি সাজাচ্ছে, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনযন্ত্র।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো।'

—'আমি সুন্দরবাবু।'

—'খবর কি?'

—'হুম্, সব গুলিয়ে গেল!'

—'তা তো যাবেই।'

—'মানে?'

—'মানে, চন্দ্রনাথের পদচিহ্ন পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়নি।'

—'কেমন করে জানলে?'

—'খুব সহজে। দুইয়ে দুইয়ে যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হল!'

—'ধেৎ, হেঁয়ালি ভালো লাগে না। দস্তুরমতো অপ্রস্তুত হয়েছি।'

—'ব্যাপারখানা কি?'

—'ঘটনাস্থলে তৃতীয় ব্যক্তির যে জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে, চন্দ্রনাথের জুতোর ছাপের চেয়ে তা বড়ো। চন্দুরে রাসকেলটা আমার মুখের উপরে কলা দেখিয়ে হাড়-জ্বালানে হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।'

—'এটুকু তো তিন-চার মিনিটের ব্যাপার। আমাকে ফোন করতে আপনার এত দেরি হল কেন?'

—'হঠাৎ আরও দুটো খবর পেলুম। দ্বিতীয় খবরটা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।'

'—যথা—'

—'আমার সহকারী সুনীলকে নন্দলালদের পাড়ায় তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলুম। সে এসে জানালে, ও-পাড়ার এক মণিহারী দোকানের মালিক হত্যাকাণ্ডের দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিল, নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে একখানা মোটর গাড়ি তার কাছে এসে থামে। গাড়ির ভিতর থেকে মণিমোহন মুখ বাড়িয়ে নন্দকে ডাকে। নন্দ গাড়িতে ওঠে গাড়িখানা চলে যায়।'

—'সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজের সঙ্গে অনেকটা মিলছে না?'

—'তা মিলছে।'

—'তারপর?'

—'গাড়ির ভিতরে দুইজন লোক ছিল, মণিমোহন আর চালক। দোকানি কিন্তু চালকের দিকে নজর দেয়নি, তাকে সনাক্ত করতে পারবে না।'

—'কালো রঙের বুইক সিডান-গাড়ি?'

—'দোকানি বলে, কালো রঙের সিডান গাড়ি বটে, কিন্তু বুইক কি ফোর্ড কি অস্টিন, তা বোঝবার মতো জ্ঞান তার নেই।'

—'গাড়ির নম্বর?'

—'দোকানি দেখেনি।'

—'সুন্দরবাবু, এ খবরে এইটুকু জানা গেল, আমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয়। এর উপর নির্ভর করে আমরা চন্দ্রনাথের কিছুই করতে পারব না, কিন্তু ধাবমান হতে পারব মণিমোহনের পিছনে।'

—'তারও একটা উপায় হয়েছে।'

—'কি রকম?'

—'দ্বিতীয় খবরটা শুনলেই বুঝতে পারবে। আমাদের এক চর এসে খবর দিলে; খিদিরপুর ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে একখানা বাগানবাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সে মণিমোহনকে প্রবেশ করতে দেখেছে।'

—'কবে?'

—'আজই ভোরবেলায়।'

—'কি করতে চান?'

—'বাড়িখানাকে চারিদিক থেকে পাহারা দেবার জন্যে জন কয় লোক পাঠিয়েছি। আমিও সদলবলে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। তোমরাও আসছ তো?'

—'সে কথা আবার বলতে!'

পাঁচ

ভদ্রেশ্বর ভদ্র

খিদিরপুর। গঙ্গার ধার। বেলা প্রায় বারোটা, কিন্তু সূর্যকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে পৃথিবীকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে দু-এক পশলা বৃষ্টি।

সদলবলে সুন্দরবাবু একখানা বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

পাঁচিল ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাগানের মাঝখানে একখানা সেকেলে বাড়ি। সেকেলে বাড়ি বটে, কিন্তু নিয়মিত সংস্কারের গুণে এখনও অব্যবহার্য হয়ে পড়েনি। বাগানের অংশটা নামেই বাগান, কোথাও ফুলগাছের কোনও চিহ্নও নেই। মধুলোভী মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে উড়ে আসে বটে, কিন্তু হতাশ হয়ে আবার উড়ে পালায়। সেখানে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা গুড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো গাছ—আম কাঁটাল জাম জামরুল তাল ও নারিকেল প্রভৃতি। আর আছে অগুন্তি কলাগাছের ভিড়। আর আছে শাকসব্জির ছোটো বড়ো ক্ষেত।

মানিক বললে, 'বাগানের মালিক যে শৌখীন নন, ফুলগাছের অভাবই তা প্রমাণিত করছে। কিন্তু তিনি যে আমাদের সুন্দরবাবুর মতোই উদর-পরায়ণ তাতে আর একটুকুও সন্দেহ নেই।'

সুন্দরবাবুর দুই চক্ষে ফুটল বিস্ফোরণের লক্ষণ। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'একটুও সন্দেহ না থাকার কারণ?'

'এখানে ফুলগাছ নেই, খালি ফলগাছ। এখানে শাক-সব্জির ক্ষেতে সুগন্ধ না থাকতে পারে, রন্ধনশালার মাল-মশলা আছে যথেষ্ট। আপনি কি রন্ধনশালাকে দুনিয়ার সব-চেয়ে ভালো জায়গা বলে মনে করেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। ওই যে জগন্নাথ আসছে! আমি এখন ওর সঙ্গেই কথা কইতে চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'জগন্নাথ কে?'

—'আমাদের চর। সেই-ই তো মণিমোহনকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।'

জগন্নাথ কাছে এসে নমস্কার করে বললে, 'বড়োবাবু, মণিমোহন এখনও ওই বাড়ির ভিতরেই আছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখো জগন্নাথ, আজ সকালেই এক বেটা চন্দুরে আমাকে যে ঠকানটা ঠকিয়ে গিয়েছে তা আর বলবার নয়। এক দিনে আমি দু-দুবার ঠকতে চাই না। তুমি মণিমোহকে ঠিক দেখেছ তো?'

—'আজ্ঞে, মণিমোহনকে আগে আমি অনেক বার দেখেছি, তার চেহারা কি ভুলতে পারি? তবে আগে তাকে কোনোদিন কোট পরতে দেখিনি, আজ সে কোট পরে আছে।'

—'হুম্, পুলিসের চোখে ধোঁকা দেবার চেষ্টা আর কি? আরে বাবা, এত সহজে কি পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া যায়?'

মানিক বললে, 'বিশেষ আমাদের সুন্দরবাবুকে!'

সে কথা সুন্দরবাবু গায়ে মাখলেন না।

হঠাৎ জগন্নাথ চমকে চাপা-গলায় বলে উঠল, 'বড়োবাবু—বড়োবাবু! ওই দেখুন মণিমোহনকে! আমাদের দিকেই আসছে!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সবাই গাছ কি ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দাও! এত সহজে কেল্লা ফতে! বরাত ভালো!'

মণিমোহন নতমুখে অসঙ্কোচে এগিয়ে এল, কোনও সন্দেহ করতে পারলে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একহারা কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ। মুখশ্রীও মন্দ নয়।

হঠাৎ চারিদিক থেকে পুলিশের দল তাকে ঘিরে ফেললে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবুজি এখন ভিজে বেড়ালের মতো আমাদের সঙ্গে সুড়সুড় করে আসবে কি?'

—'কোথায়?'

—'আমাদের পোশাক দেখে বুঝতে পারছ না, আমরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই?'

—'আপনারা তো পুলিস!'

—'আর তুমি তো মণিমোহন বসু?'

—'আজ্ঞে না, ও-নাম আমি জীবনে শুনিনি।'

জগন্নাথ এগিয়ে এসে বললে, না, 'তুমিই মণিমোহন। তোমাকে আমি খুব চিনি।'

—'আমার নাম ভদ্রেশ্বর ভদ্র।'

—'হুম্, আবার নাম ভাঁড়ানো হয়েছে? কিন্তু ও-প্যাঁচটা খুবই পুরোনো, ধোপে ট্যাঁকে না। ভদ্রেশ্বর ভদ্র! কোনও আধুনিক ভদ্রলোকই ও-রকম নাম ধারণ করতে পারে না। যাক, ও কথা। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। এ বাগানবাড়ির মালিক নিশ্চয়ই তুমি নও?'

—'না। আমি ভাড়াটে। বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন চন্দ্রনাথবাবু।'

—'কে?'

—'বাবু চন্দ্রনাথ রায়। তিনি শালখেয় থাকেন।'

সুন্দরবাবু একটি ছোটোখাটো লাফ মেরে বললেন, 'শুনছ জয়ন্ত? এখানে আবার সেই অলক্ষুণে চন্দুরে! বাপু ভদ্রেশ্বর, তাহলে তুমি মণিমোহন ছাড়া আর কেউ নও!'

—'আমি ভদ্রেশ্বর ভদ্র।'

—'বেশ, তোমার ভদ্রতার দৌড় কত বুঝতে দেরি লাগবে না। এ বাড়িখানা তুমি ভাড়া নিয়েছ কেন?'

—'আমার মিছরির কারখানা আছে। আর আছে আমার এক বন্ধুর মোটরের গ্যারাজ। সেখানে মোটর মেরামত হয়। আমি তারও অংশীদার।'

—'তাই না কি মণিমোহন? তুমি এখন একজন বিজনেসম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করতে চাও?'

মণিমোহন হাসতে লাগল।

সুন্দরবাবু খেপে গিয়ে বললেন, 'কে তোমাকে অমন করে হাসতে শিখিয়ে দিলে? আজ সকালে চন্দুরেটাও ঠিক ওই রকম হাড়-জ্বালানে হাসি হেসে আমাকে ঠাট্টা করেছে। আর তুমি হাসবেই বা কেন? পুলিস কি হাস্যকর জীব?'

মণিমোহন বললে, 'ভদ্রেশ্বরের ঘাড়ে মণিমোহন নাম চাপিয়ে দিলে ভদ্রেশ্বরের হাসি পাবে না কেন?'

—'তুমিই যে মণিমোহন, সেটা থানায় গিয়েই আমি প্রমাণ করে দেব। এই বাড়িতে আরো কত লোক আছে?'

মণিমোহন বললে, 'আজ রবিবার, কারখানা বন্ধ। বাড়ির ভিতরে ঝি-চাকর রাঁধুনী ছাড়া আর কেউ নেই।'

সুন্দরবাবু তাঁর সহকারী ইনস্পেক্টারকে ডেকে বললেন, 'তুমি লোকজন নিয়ে খানাতল্লাসি কর। বাড়ির ভিতর থেকে কারুকে বাইরে বেরুতে দিয়ো না। আর জগন্নাথ!'

—'আজ্ঞে!'

—'তুমি দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিটে মণিমোহনের বাড়িতে যাও। মণির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে গিয়ে বলবে, তাঁর ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে সঙ্গে করে থানায় ফিরে যাবে। চলো মণিমোহন, তুমি কতবড়ো ঘুঘু এইবারে সেই পরীক্ষাই হবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক!'

মণিমোহন বললে, 'বেশ মজা তো! কোন অপরাধে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন তাও আমি জানতে পারব না?'

—'সব জেনে-শুনে ন্যাকা সেজো না মণিমোহন! গেল পঁচিশে তারিখে রাত্রিবেলায় গড়ের মাঠে তুমি আর একজন লোকের সঙ্গে নন্দলাল মিত্রকে খুন করেছ। ঘটনাস্থলে তোমাদের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।'

মণিমোহন আবার হাসতে লাগল।

—'ফের হাসছ?'

—'পুলিসের মুখে রূপকথা শুনলে কার না হাসি পায়?'

—'রূপকথা মানে?'

—'কে এই নন্দলাল? ডি. এল. রায়ের হাসির কবিতার সেই বিখ্যাত নন্দলাল নয় তো? কিন্তু কে তাকে খুন করলে? তার কথা পড়ে আমরাই তো হেসে খুন হতুম!'

—'আবার রসিকতার চেষ্টা হচ্ছে? সেপাই, এই রসিক ব্যক্তিকে আমার গাড়িতে টেনে নিয়ে যাও তো!'

মণিমোহন বললে, 'টেনে নিয়ে যেতে হবে না। আমি জড় পদার্থ নই, সচল পদযুগলের সাহায্যে নিজেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি।'

—'তাই চলো তবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যাব না। আমরা এখানকার খানাতল্লাসে যোগ দিতে চাই।'

সুন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ আবার কি শখ?'

—'শখ নয়, খেয়াল। মণিমোহন বাবু, আপনার এখানে ফোন আছে?'

—'আছে। কিন্তু কেন?'

—'হয়তো ব্যবহার করবার দরকার হবে।'

মণিমোহনের মুখের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা দুর্ভাবনার ভাব। সে সহজ স্বরেই বললে, 'বেশ, ব্যবহার করবেন—তবে কি না, যথামূল্যে।'

—'যথামূল্য কেন, দ্বিগুণ মূল্য দিতে রাজি আছি। অগ্রিম।'

—'পরে পেলেও চলবে। আপাতত আমি সুন্দরবাবুর দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। আসুন সুন্দরবাবু, অকারণে বিলম্ব করছেন কেন?'

সুন্দরবাবুর মাথা কেমন গুলিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। জয়ন্ত কেন এখানে থাকতে চায়—কাকে সে ফোন করতে চায়? আর মণিমোহনটা কি পাঁড়ঘুঘু রে বাবা, খুনের আসামি হয়েও থানায় যাবার জন্যে পুলিসকেই তাড়া লাগাচ্ছে!

এই সব ভাবতে ভাবতে সুন্দরবাবু প্রস্থান করলেন।

পরের দৃশ্য থানায়। চেয়ারাসীন সুন্দরবাবু। দুই জন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দণ্ডায়মান মণিমোহন।

মণিমোহন বললে, 'পরীক্ষা শুরু করতে আজ্ঞা হোক।'

—'হুম্, ভারি ব্যস্ত যে! তোমার বাবার জন্যেও একটু অপেক্ষা করতে পারছ না?'

—'আমার বাবা!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই তোমার বাবা এখানে আসবেন।'

—'মশাই কি ভূত নামাতেও জানেন?'

—'তার মানে?'

—'আমার বাবা স্বর্গে। সেখানে থেকে কেমন করে তাঁকে এখানে আনবেন?'

—'একটু সবুর করলেই দেখতে পাবে। না, না তার আগেও আর একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।'

—'করুন মশাই, করুন। একটা থেকে একশোটা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তার বেশি পরীক্ষা আমি দিতে পারব না।'

মনে মনে উত্তপ্তও হয়ে সুন্দরবাবু মুখে কিছু বললেন না। একটা কাগজের মোড়ক খুলে একজোড়া জুতা বার করে শুধোলেন, 'এই জুতোজোড়া চিনতে পারো?'

—'উঁহু। আমার জুতো-চেনা ব্যবসা নয়। আমি মিছরির ব্যাপারী।'

—'ঘটনাস্থলে তোমার জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তোমায় বাড়ি থেকেই এই জুতো এনেছি—এ জুতো তোমারই। একবার জুতোজোড়া পায়ে পরো দেখি!'

মণিমোহন জুতোর ভিতরে পা গলাবার চেষ্টা করে বললে, 'এ জুতো ছোটো। এর মধ্যে পা ঢোকানো অসম্ভব।'

সুন্দরবাবুর ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালা দুজন মণিমোহনের পায়ে জোর করে জুতো পরাবার চেষ্টা করলে। তাদের চেষ্টাও সফল হল না।

সুন্দরবাবুর দুই ভুরু সঙ্কুচিত। মণিমোহনের কৌতুকহাস্য।

ঠিক সেই সময়ে জগন্নাথের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন মণিমোহনের পিতা মহেন্দ্রবাবু।

অকুলে যেন কূল পেয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'মহেন্দ্রবাবু, একে চেনেন?'

মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্রবাবুর চোখ উঠল চমকে। আরও দুই পা এগিয়ে তার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে তিনি বললেন, 'না, এঁকে আমি চিনি না!'

—'এ কি মণিমোহন নয়?'

—'এঁকে প্রায় মণিমোহনের মতন দেখতে বটে, কিন্তু ইনি আমার পুত্র নন।'

সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি যেন চুপসে গেল ছ্যাঁদা বেলুনের মতন। এবং ঠিক সেই সঙ্গেই বেজে উঠল টেলিফোনযন্ত্র। বিরক্তিভরে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যালো।'

রিসিভারের ভিতর দিয়ে জয়ন্তের কণ্ঠ ভেসে এল—'জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু! আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন!'

সুন্দরবাবুর চুপসেযাওয়া ভুঁড়ি আবার ফুলে উঠল। একসঙ্গে রিসিভার ও চেয়ার ত্যাগ করে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সেপাই! আসামিকে লকআপে নিয়ে যাও! এ বেটাও এক ঝাঁকের আর একটা ঘুঘু। খুব হুঁসিয়ার!'

ছয়

শালখের চন্দুরে

মানিক শুধোলে, 'জয়ন্ত, এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? আমরাও তো সুন্দরবাবুর সঙ্গেই যেতে পারতুম!'

—'যেতে তো পারতুমই, কিন্তু যাওয়া আর হল কই?'

—'তুমি কি নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছ?'

—'কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'তবে?'

—'মানে একটা সন্দেহ জাগছে।'

—'কি সন্দেহ?'

—'মণিমোহন স্বেচ্ছায় ধরা দিলে কেন?'

—'স্বেচ্ছায়?'

—'নিশ্চয়! সে খুনের মামলার পলাতক আসামি। এ বাড়িতে টেলিফোন আছে। তার বন্ধু চন্দ্রনাথ পুলিসের কার্যকলাপের কথা নিশ্চয় তাকে জানিয়েছে। এ সময়ে তার কতটা সাবধান হয়ে থাকবার কথা। তুমি কি বিশ্বাস করো, দিনেরবেলায় বাগানের ভিতরে সদলবলে পুলিসের আবির্ভাব হল, আর অতি-জাগ্রত খুনের আসামি মণিমোহন তা জানতে পারেনি? অম্লান বদনে ভেড়ার মতন সুড় সুড় করে এসে সে আত্মসমর্পণ করলে! কেবলই কি আত্মসমর্পণ? তাড়াতাড়ি থানায় যাবার জন্যে তার বিপুল আগ্রহও লক্ষ্য করলে তো?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও?'

—'এসব অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমার দৃঢ় ধারণা, মণিমোহনের ইচ্ছা ছিল, তাকে গ্রেপ্তার করেই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।'

—'এমন অদ্ভুত ইচ্ছা তার হবে কেন?'

—'সে জানে, পুলিশ গ্রেপ্তার করেও তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।'

—'ধেৎ, তাও কি সম্ভব! চন্দ্রনাথের কাছ থেকে সে নিশ্চয়ই শুনেছে, পুলিসের কাছে তার পায়ের জুতোর ছাপ আছে।'

—'খুব সম্ভব, তার জুতোর সঙ্গে সে ছাপ মিলবে না।'

—'কি যে বলছ জয়ন্ত!'

—'খুব সম্ভব সে মণিমোহন নয়, অন্য কেউ।'

—'তুমি পাগল হয়ে গেলে না কি? পুলিসের চর জগন্নাথ আগে থাকতেই মণিমোহনকে চেনে। সে নিজে তাকে সনাক্ত করেছে।'

—'সে মণিমোহন হলে কিছুতেই যেচে ধরা দিত না। যে খুনের আসামি পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে থাকে, সে কখনও হাসতে হাসতে যেচে ধরা দেয়? অসম্ভব মানিক, অসম্ভব!'

—'কিন্তু জগন্নাথ তাকে সনাক্ত করেছে!'

—'সে মণিমোহন নয় বটে, কিন্তু হয়তো প্রায় মণিমোহনেরই মতন দেখতে।'

মানিক বিস্ময়ে হতবাক।

জয়ন্ত বললে, 'এ ছাড়া এমন ব্যাপারের আর কোনও অর্থই হয় না।' এই বাড়ির ভিতর নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে। তাই জাল মণিমোহন আমাদের বিপথে চালনা করে এই বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়।'

—'কিন্তু সুন্দরবাবু বিপথগামী হলেও এখনও আমরা যথাস্থানেই বর্তমান আছি।'

—'হ্যাঁ মানিক। রহস্যভেদের ভারগ্রহণ করব আমরাই।'

—'কেমন করে?'

—'তা জানি না। ঐ যে সাব-ইনস্পেক্টার পরেশ আমাদের দিকেই আসছেন। ওঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খানাতল্লাসির ফল সন্তোষজনক হয়নি।...কি পরেশবাবু, কতখানি অগ্রসর হলেন?'

পরেশ হতাশ ভাবে বললে, 'অগ্রসর কি মশাই, এখন আমাদেরও সুন্দরবাবুর পশ্চাদগামী হতে হবে।'

—'খানাতল্লাস করে সন্দেহজনক কিছুই পেলেন না বুঝি?'

—'কিছু না, কিছু না!'

—'তাই থানায় ফিরে যেতে চান?'

—'তা ছাড়া আর কি! এখানে বসে আর অশ্বডিম্বে তা দিয়ে কি হবে? এর চেয়ে বাড়িতে ফিরে ভেরেণ্ডা ভাজা ভালো।'

—'বাড়ির লোকজনদের পরীক্ষা করেছেন?'

—'করেছি। লোকজন তো ভারি! দুটো বেহারি চাকর, একটা উড়িয়া বামুন, একটা বুড়ি, আর একটা ছুঁড়ি ঝি। ছুঁড়িটা দেশ থেকে নতুন এসেছে, এত লজ্জা যে কথা কইতে কি মুখের ঘোমটা খুলতেও নারাজ।'

—'আপনার লোকজনরা কোথায়?'

—'তাদের গাড়িতে গিয়ে বসতে বলে আমি আপনাদের ডাকতে এসেছি।'

জয়ন্ত হঠাৎ সক্রোধে গর্জন করে বলে উঠল, 'পরেশবাবু!'

মানিক চমকে উঠল। জয়ন্ত তো সহজে এমন বিচলিত হয় না! পরেশও হতভম্ব!

—'পরেশবাবু আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। —এস মানিক, শীগগির!' মানিকের হাত ধরে টেনে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল এবং যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে পরেশকে বলে গেল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ির চারিদিকে আবার পাহারা বসান!'

পরেশ মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিজের মনেই বললে, 'বড়োবাবু বলেন জয়ন্তবাবুর মাথায় ছিট আছে। কথাটা মিথ্যা নয়। শখের গোয়েন্দা হয়ে কিনা আসল পুলিসকে ধমক দেয়! কি আর করব, বড়োবাবুই ওঁকে মাথায় তুলেছেন!'

জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে দালান ও উঠান এবং দালানের কোণে দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে তারা দোতলার দালানের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দালানের এক পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ জটলা করছিল। তাদের দেখেই তারা একেবারে চুপ মেরে গেল। একটি অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি মুখে ঘোমটা টেনে দিয়ে জড়সড়ো হয়ে রইল।

প্রায় মিনিটখানেক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ন্ত বললে, 'তোমরা কেউ একবার এদিকে এগিয়ে এসো তো!'

একটা বুড়ি এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

জয়ন্ত শুধোলে, 'তুমি কে?'

—'আমি এ বাড়ির পুরনো ঝি।'

—'তোমার নাম কি?'

—'ভালোর মা।'

—'আর ওই মেয়েটি?'

—'উটি আমাদের নতুন ঝি। দিন তিনেক হল দেশ থেকে এসেছে।'

—'হ্যাঁগা বাছা নতুন ঝি, তোমার নামটি কি?'

সে ফিসফিস করে কি বললে শোনা গেল না।

ভালোর মা বললে, 'ওর বড়ো নজ্জা বাবু! ওর নাম হরিদাসী।'

—'আচ্ছা ভালোর মা, তোমাদের টেলিফোন আছে কোন ঘরে?'

ভালোর মা দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলিনির্দেশে। সিঁড়ির ডানপাশে টেলিফোনের ঘর।

—'দেখো ভালোর মা, তোমরা সবাই এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি টেলিফোনের কাজ সেরে তোমাদের সঙ্গে কথা কইব।'

জয়ন্তের সঙ্গে মানিক টেলিফোনের ঘরে গেল। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, জয়ন্ত ফোনে সুন্দরবাবুকে এই কথাই জানিয়ে দিলে যে—'জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু! আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন!'

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কোথায় আছে আসল মণিমোহন?'

—'এই বাড়িতেই।'

—'তাকে তুমি দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, তুমিও দেখবে এসো।'

দুজনে আবার দালানে গিয়ে উপস্থিত। ভালোর মা প্রভৃতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ভালোর মা, তোমাদের সকলকেই আমি এইখানেই হাজির থাকতে বললুম না?'

—'আমরা তো হাজির আছি বাবু!'

—'কিন্তু হরিদাসী কোথায়?'

—'সেও আছে।'

—'কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

—'সে বাসন মাজতে গিয়েছে।'

—'কোথায়? কলতলায়?'

—'না, খিড়কির পুকুরে।'

—'তোমাদের আবার খিড়কির পুকুর আছে বুঝি? কিন্তু কোন দিক দিয়ে সে গেল? ফোন করতে করতে আমি সিঁড়ির উপরে চোখ রেখেছিলুম, ওখান দিয়ে কেউ যায়নি।'

—'আমাদের অন্দরমহলে আর একটা সিঁড়ি আছে।'

জয়ন্তের মুখে ফুটে উঠল দারুণ হতাশা, কিন্তু সহজ স্বরেই সে বললে, 'আমাকে খিড়কির পুকুরে নিয়ে চলো।'

ছোটো একটা পুকুর। নোংরা জল। ভাঙা ঘাট। চার পাড়েই আগাছার ভিড়। কিন্তু সেখানেও হরিদাসীর পাত্তা মিলল না।

জয়ন্ত কঠিন স্বরে বললে, 'এর পর তুমি কি বলতে চাও ভালোর মা?'

ভালোর মা ভয়ে ভয়ে বললে, 'কি জানি বাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, 'দেখছ মানিক, নিরেট পরেশটা বাড়ির চারিদিকে এখনও পাহারা বসায়নি? সেইই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল! তার উপরে নির্ভর করেই আমি হরিদাসীকে ছেড়ে ফোন করতে গিয়েছিলুম।'

—'কিন্তু হরিদাসী কে?'

—'সে কথার জবাব একটু পরে দেব। আপাতত ভালোর মাকে তোমার জিম্মায় রেখে আমি একটু উদ্যানভ্রমণ করে আসি।' জয়ন্ত চলে গেল দ্রুতপদে।

অনতিবিলম্বে ব্যস্ত ভাবে এসেই সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'মানিক, তুমি একা কেন?'

—'জয়ন্ত উদ্যানভ্রমণে গিয়েছে।'

—'এই কি উদ্যানভ্রমণের সময়? কোথায় তোমাদের আসল মণিমোহন?'

—'ওই যে জয়ন্ত আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

—'জয়ন্ত, মণিমোহন কোথায়?'

একখানা শাড়ি আর একটা সেমিজ মাটির উপর নিক্ষেপ করে জয়ন্ত বললে, 'জামা-কাপড় আমাদের উপহার দিয়ে মণিমোহন এখান থেকে প্রস্থান করেছে।'

—'আরে হুম্! এ তো দেখছি স্ত্রীলোকের জামা-কাপড়।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। মণিমোহন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেই বাড়ির ভিতরে লুকিয়েছিল। তারপর নারীর খোলস ত্যাগ করে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে লম্বা দিয়েছে। এর জন্যে দায়ি হচ্ছেন আপনাদের পরেশবাবু। তিনি সেপাইদের সরিয়ে নিয়ে না গেলে এ বিপত্তি ঘটত না।'

রাগে ফুলতে ফুলতে সুন্দরবাবু বললেন, 'বটে, বটে? আচ্ছা, তার সঙ্গে পরে বোঝা-পড়া করব। কিন্তু তুমি মণিমোহনকে চিনতে পারলে কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'মণিমোহন এখানে দাসী হরিদাসী সেজেছিল। সে নাকি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সবে কলকাতায় এসেছে, এখনও লজ্জা ভাঙেনি, বাইরের লোক দেখলেই ঘোমটা টেনে দিলে, আমিও কিন্তু তার আগেই চট করে হরিদাসীর মুখ দেখে নিলুম। সে মুখ হরিদাসীর মুখ নয়, সে মুখ দেখতে প্রায় ভদ্রেশ্বর ভদ্রের মতন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মহেন্দ্রবাবু বলেছেন, ভদ্রেশ্বরের মুখ নাকি প্রায় তাঁর ছেলে মণিমোহনেরই মতন দেখতে। এই জন্যেই জগন্নাথ তাকে মণিমোহন বলে ভ্রম করে আমাদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে মেরেছে।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, জগন্নাথের ভ্রমের কথা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। হরিদাসীর পুরুষত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ পেলুম তার পা লক্ষ্য করে। জানেন তো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবৃত পা দেখলে খুব সহজেই ধরা যায় কে নারী, আর কে নর? তার উপরে হরিদাসীর আঙুলে আর গোড়ালিতে ছিল বড়ো বড়ো কড়া। পাড়াগেঁয়ে গরিবের মেয়ে জুতো পরে না, পায়ে কড়া পড়বে কেন? সে কথা কয় ফিসফিস করে, এও সন্দেহজনক। লজ্জার ছুতো বাজে, সে নিজের পুরুষকণ্ঠ চাপা দিতে চায়। সুন্দরবাবু, আপনার সহকারী পরেশবাবু নিশ্চয় খুব হুঁসিয়ার ব্যক্তি, নইলে এতগুলো প্রমাণ তাঁর নজর এড়িয়ে যায়?'

সুন্দরবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সবই আমার অদৃষ্ট ভাই! জাল ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাচ্ছে বারবার! তার উপরে দেখ না, মন বলছে, শালখের ঐ চন্দুরে ব্যাটাই হচ্ছে এই দলের মোড়ল, অথচ তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও যোগাড় করতে পারছি না!'

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'বিলাতি প্রবাদে বলে, 'শয়তানের কথা ভাবলেই শয়তানের উদয় হয়'! ওই দেখুন, কে আসছে।'

সুন্দরবাবু ফিরে বিস্ফারিত চক্ষে দেখলেন, হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে, হেলতে হেলতে, দুলতে দুলতে এবং হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে শালিখার চন্দ্রনাথ রায়!

সাত

দু-দুজন বেপরোয়া লোক

আগতপ্রায় চন্দ্রনাথের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্!'

চট করে কি ভেবে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সুন্দরবাবু, হুম্ বলে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শীগগির বাড়ির ভিতরে যান।'

—'কেন বলো দেখি? চন্দুরের ভয়ে?'

—'ভয়ে নয়, আপনাকে থানায় একটা ফোন করতে হবে।'

—'কি জন্যে?'

—'সেপাইদের জিম্মায় ভদ্রেশ্বরকে একবার এখানে নিয়ে আসুন। আমি তাকে গুটি-কয় প্রশ্ন করব।'

—'উত্তম।'

—'দাঁড়ান। আর একটা কথা। সেই সঙ্গে মণিমোহনের জুতোর ছাঁচও পাঠিয়ে দিতে বলবেন।'

—'এখানে! কেন হে?'

—'সে কথা বলবার সময় নেই। ওই চন্দ্রনাথ এসে পড়েছে।'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। চন্দ্রনাথ বুক ফুলিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে শুধোলে, 'সুন্দরবাবু সরে পড়লেন কেন? আমার চন্দ্রবদন দেখতে রাজি নন?'

মানিক হেসে উঠে বললে, 'মশাই কি নিজের বদনকে চন্দ্রবদন বলে সন্দেহ করেন?'

চন্দ্রনাথ আরও জোরে হেসে উঠে বললে, 'না মশাই, তা করি না। পিতার ভ্রমে নামেই আমি চন্দ্রনাথ। আর সত্যি কথা বলতে কি, চন্দ্রবদনের মালিক হলে আমি সুখী হতুম না।'

—'দুঃখিত হতেন?'

—'ঠিক তাই। পূর্ণচন্দ্রের বদন আকাশেই মানায়। ও-রকম অখণ্ডমণ্ডলাকার বদন কোনও মানুষকেই সুখী করতে পারে না। যাক সে কথা। এখন আপনারা কে বলুন দেখি? মাণিকজোড়ের মতন সর্বদাই সুন্দরবাবুর আশেপাশে বিরাজ করেন?'

—'ঠিক ধরেছেন। আমার নাম মানিকই বটে, আর জয়ন্তও আমার জোড়াই বটে।'

—'নাম তো শুনলুম, এখন পরিচয়টাও দিতে আজ্ঞা হয়।'

—'ওই সুন্দরবাবু আসছেন। আমাদের পরিচয় ওঁর মুখেই শুনতে পাবেন।'

কিন্তু সুন্দরবাবুর কাছ থেকে জয়ন্ত ও মানিকের পরিচয় জানবার জন্যে চন্দ্রনাথ কোনও আগ্রহই প্রকাশ করলে না। হাত জোড় করে নমস্কার করে যেন ব্যঙ্গের স্বরেই বললে, 'আসুন সুন্দরবাবু!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিনমস্কার করে সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'হুম্, এই আমি এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

—'কি আশ্চর্য প্রশ্ন!'

—'আশ্চর্য প্রশ্ন?'

—'কেবল আশ্চর্য নয়, যুক্তিহীন প্রশ্ন।'

—'মানে?'

—'আমি এখানে আসব না তো, আসবে কে? আপনি বোধহয় জানেন না, এ বাড়ির মালিক হচ্ছি আমি?'

—'খুব জানি বাবা, খুব জানি! আর জানি বলেই তো আজ আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

—'গ্রেপ্তার করবেন? আমি এই বাড়ির মালিক বলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

—'না, না, না! বাড়ির মালিক হওয়াও অপরাধ না কি?'

—'যে বাড়ির ভিতরে খুনি আসামি আশ্রয় পায়, তার মালিক হওয়া অপরাধ বই কি!'

—'কে খুনি আসামি?'

—'আপনার সাঙাত মণিমোহন।'

—'তার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কি?'

—'সে এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়েছিল।

—'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আর এ কথা সত্য হলেও আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

—'পারি না নাকি?'

—'না। আমি এই বাড়ির মালিক বটে, কিন্তু এখানা ভাড়া দিয়েছি ভদ্রেশ্বরবাবুকে। আজ তাঁর কাছে আমি ভাড়ার টাকা আদায় করতে এসেছি। ভদ্রেশ্বরবাবুর বাড়ির ভিতরে কে থাকে, আর না থাকে, তার কোনও খবরই আমি রাখি না। কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন? চুপ করে রইলেন কেন, বলুন! কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন সুন্দরবাবু? এখনো বোবা হয়ে রইলেন? হা হা হা হা হা! গ্রেপ্তার করবেন! গ্রেপ্তার করলেই হল!'

সুন্দরবাবুর হতাশ ভাব। অসহায়ের মতন তিনি তাকালেন জয়ন্তের মুখের পানে।

জয়ন্ত বললে, 'না চন্দ্রবাবু, আপনাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারে না। সুন্দরবাবু বলছিলেন কথার কথা মাত্র। ও-কথায় আপনি কান দেবেন না। ওই দেখুন, আর একখানা জিপ গাড়ি বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কে নামছে? ভদ্রেশ্বরবাবু না?'

সুন্দরবাবুর মুখ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে তিনি বললেন, 'ভদ্রেশ্বর বেটাও আসছে ঠিক চন্দুরের মতন বুক ফুলিয়ে বেপরোয়া ভাবে। এমন দু-দুজন বেপরোয়া লোককে সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় না। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি বাবা?'

কাছে এসে এক গাল হেসে ভদ্রেশ্বর বললে, 'আরে সুন্দরবাবু মশাই, এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে বাসায় ফিরতে দেবেন, আমি তা ভাবতেই পারিনি। তারপর? আপাতত এদিককার খবর টবর সব ভালো তো?'

সুন্দরবাবু গুম [illegible] গিয়ে বললেন, 'মোটেই ভালো নয়—অন্তত তোমার পক্ষে।'

ভদ্রেশ্বর চক্ষু বিস্ফারিত করে যেন সভয়েই বললে, 'অ্যাঁ, বলেন কি! খবর আমার বিপক্ষে?'

—'হুম্ তাই। খবর তোমার বিপক্ষেই বটে।'

—'হায়, হায়! কেন এমনটা হল?'

—'তুমি খুনি আসামি মণিমোহনকে এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলে।'

—'বটে, বটে, বটে! মণিমোহন নামধেয় সেই কাল্পনিক ব্যক্তিটি এখনও আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে রাজি হয়নি? একটু আগে আমিই ছিলুম মণিমোহন। এখন স্থির করেছেন, মণিমোহন এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে আছে!'

—'না, এখন সে এই বাড়ির ভিতরে নেই। সে লম্বা দিয়েছে।'

—'আপনার চোখে ধুলো দিয়ে?'

—'এ জন্যেও তুমি দায়ি! মণিমোহনের সঙ্গে তোমার চেহারার খানিকটা মিল আছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে তুমি যদি আমাকে ভুলিয়ে এখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতে, তাহলে মণিমোহন কখনোই পালাতে পারত না।'

—'যত দোষ, নন্দ ঘোষ। মশাই, আমার আর রূপকথা শোনবার বয়স নেই। পথ দেখুন কিংবা পথ ছাড়ুন। আমাকে বাড়ির ভিতরে যেতে দিন।'

—'বাড়ির ভিতরে যাবে মানে? মামার বাড়ির আবদার না কি? তোমাকে আমাদের সঙ্গে আবার থানায় যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'কতবার বলব? খুনি আসামিকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।'

—'কোথায় সে? প্রমাণ দেখান।'

—'সে এখানে হরিদাসী নাম দিয়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল।'

ভদ্রেশ্বর আগে হা হা করে খুব খানিকটা হেসে নিলে। তারপর বললে, 'বাহবা কি বাহবা! মণিমোহন আগে ছিল শ্রীমান ভদ্রেশ্বর, কিন্তু এখন সে হয়েছে শ্রীমতী হরিদাসী? চমৎকার। মশাই গাঁজা-টাজা খান না তো?'

—'চোপরাও বদমাইস!'

—'মোটেই চুপ করব না। হরিদাসীকে আগে এখানে নিয়ে আসুন।'

—'পুলিস দেখে সে পালিয়ে গিয়েছে কেন?'

—'পালিয়ে গিয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে সে স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ, হরিদাসী নয়, মণিমোহন? এটা কোন দেশের যুক্তি? হরিদাসী পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে, নতুন সহরে এসেছে, পুলিস দেখে সে তো ভয়ে পালিয়ে যাবেই।'

সুন্দরবাবুর অবস্থা আবার অসহায় হয়ে পড়ল। জয়ন্তকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে নিম্ন স্বরে বললেন, 'ভায়া, যেমন ঐ চন্দুরেটা, তেমনি এই ভদ্রেশ্বর—দু বেটাই মাছের মতন পিছল, ধরলেও হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। তোমার কথাতেই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি, এখন তুমিই ওর মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করো।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাই করছি। আমি আর একবার বাড়ির ভিতরে যাব। ততক্ষণে আপনি মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ গাড়ি থেকে আনিয়ে রাখুন। এসো মানিক!'

দোতলার দালানে দাস-দাসীরা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ ভালোর মা, হরিদাসী কি রাতে তোমার সঙ্গেই শুত?'

ভালোর মা বললে, 'না বাবু, সে শুত একলা অন্য ঘরে।'

—'বেশ, সে ঘরখানা একবার আমরা দেখতে চাই।'

ভালোর মা তাদের ভিতরমহলে নিয়ে গিয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মানিক বললে, 'জয়ন্ত, কি উদ্দেশ্যে তুমি এ ঘরখানা দেখতে চাও?'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, কায়ার পিছনে ছায়ার মতন কেবল আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কোনোই লাভ নেই। যা স্বচক্ষে দেখছ আর স্বকর্ণে শুনছ, তা নিয়ে তোমারও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহার করা উচিত। এ ঘরে যে একবার আমাদের আসতেই হবে, আমি তা আগে থাকতেই জানতুম। আর সেই জন্যেই থানা থেকে মণিমোহনের পদচিহ্নের ছাঁচ এখানে আনিয়ে রেখেছি।'

মানিক বললে, 'তুমি কি এই ঘরের মেঝেতে মণিমোহনের নূতন পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে চাও?'

—'সে চেষ্টা বোধহয় সফল হবে না।'

—'তবে?'

—'হরিদাসী যে পুরুষ, এটা আমার সন্দেহ মাত্র। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষ হলেও সে সত্য সত্যই মণিমোহন কি না? এই ঘরে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার সম্ভাবনা আছে।'

—'যুক্তিটা মাথায় ঢুকছে না।'

—'নিরেটদের মাথায় পেরেকও ঢোকে না। সুন্দরবাবুর সঙ্গগুণে তুমিও একটি নিরেট হয়ে উঠছ। নির্বোধ, হরিদাসী যদি ছদ্মবেশী পুরুষ হয় তাহলে এই ঘরে নিশ্চয়ই তার পুরুষ বেশ ধারণের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। পুলিসের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সেগুলো যে সে নিয়ে যেতে পারেনি, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। টেবিলের উপরে রয়েছে রূপোর সিগারেটকেস আর দেশলাই। আনলায় দুখানা শাড়ি, একটা সেমিজ আর একটা ব্লাউজ ঝুলছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে দুখানা ধুতি আর দুটো পাঞ্জাবিও। মানিক, মানিক, হরিদাসী পুরুষই বটে!'

মানিক বললে, 'কিন্তু সে মণিমোহন কি না?'

সিগারেটকেসটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে মানিকের সামনে ধরে জয়ন্ত বললে, 'দেখো। এর উপরে ইংরেজিতে খোদা রয়েছে 'এম'। ওটা মণিমোহনের নামের আদ্য-অক্ষর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে কি না?'

মানিক সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এটা একটা বড়ো প্রমাণ।'

এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি ও এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে জয়ন্ত বললে, 'তবু আমি যা খুঁজছি তা পাচ্ছি না।' তারপর হেঁট হয়ে পড়ে খাটের তলায় দৃষ্টিচালনা করে জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, 'পেয়েছি মানিক, পেয়েছি। যা খুঁজছি তা পেয়েছি!'

—'কি?'

—'খাটের তলায় রয়েছে এক জোড়া জুতো। ব্যাস, আপাতত আমাদের খোঁজাখুঁজি শেষ। মাণিক, জুতোজোড়া খাটের তলা থেকে টেনে নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো।'

বাগানে নেমে এসে তারা দেখলে, ভদ্রেশ্বর তখনও সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে এবং চন্দ্রনাথ আপন মনে পায়চারি করছে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবেই।

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, এই ঠোঁটকাটা ভদ্রেশ্বরের লেকচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর মুখ বন্ধ করবার কোনও উপায় পেয়েছ কি?'

মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'বোধহয় পেয়েছি। মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ কোথায়?'

—'এই যে ভাই, এই যে।'

খিল খিল করে হেসে উঠে ভদ্রেশ্বর বললে, 'আবার ওই ছাঁচের সঙ্গে আমার জুতো মেলানো হবে না কি?'

জয়ন্ত বললে, 'মোটেই নয়। মণিমোহনের জুতোর ছাঁচের সঙ্গে আমি এই জুতোজোড়া মিলিয়ে দেখব।'

ভদ্রেশ্বর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ও কার জুতো?'

ছাঁচের সঙ্গে জুতো মেলাতে মেলাতে জয়ন্ত বললে, 'বাঃ, অবিকল মিলে যাচ্ছে! হ্যাঁ এ হচ্ছে মণিমোহনের জুতো, পাওয়া গিয়েছে হরিদাসীর ঘরে।'

সুন্দরবাবু সহর্ষে এবং সদম্ভে বলে উঠলেন, 'হুম্! হুম্! বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—'

চন্দ্রনাথ সহসা বললে, 'ভদ্রেশ্বরবাবু, এখন আমি চললুম। ভাড়ার টাকার জন্যে পরে আর একদিন এসে দেখা করব।' সে হনহন করে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে গেল, চন্দুরেটা পালায় যে!'

জয়ন্ত বললে, 'ওকে যেতে দিন সুন্দরবাবু! চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে পারি, এমন কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

ভদ্রেশ্বর বললে, 'আপনারা আমাকেও গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মণিমোহনের জুতো আবিষ্কারের পরেও?'

—'ও জুতো নিশ্চয়ই হরিদাসীর ঘরে ছিল না। এ সব হচ্ছে পুলিসের কারসাজি।'

ভদ্রেশ্বরকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে সুন্দরবাবু বললেন, 'পাজি, ছুঁচো, এখনও বকবকানি! চুপটি মেরে থানায় চলো, তোর যা বলবার আদালতে গিয়ে বলবি!'

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দুই হাতে নিজের বুক চেপে ধরে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আট

পকেট-বুকের মহিমা

সুন্দরবাবু প্রথমটা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে

ব্যস্তভাবে জয়ন্তের দিকে ছুটে গেলেন। মানিক তার আগেই জয়ন্তের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত, তোমার কোথায় লাগল?'

জয়ন্ত টপ করে উঠে পড়ে একটুখানি হেসে বললে, 'বুকে।'

—'অ্যাঁ, বলো কি? বুকে গুলি লেগেছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ!'

—'কান্নার চেয়ে হাসিই আমি পছন্দ করি।'

—'না, ঠাট্টা রাখো। দেখি কোথায় লেগেছে।'

—'এই যে, বাঁ দিকের বুক-পকেটের উপরে।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সভয়ে বলে উঠলেন, 'ও বাবা, ও যে একেবারে মোক্ষম আঘাত! গুলি পকেট ছ্যাঁদা করে ভিতরে চলে গিয়েছে।'

মানিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, কি করে তুমি এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? চলো, আমরা তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

—'না মানে?'

—'না মানে, না। হাসপাতালে যাব না।'

—'সে কি হে?'

—'বন্ধু, শিকারীর লক্ষ্য অব্যর্থ বটে, কিন্তু সে লক্ষ্য ভেদ করতে পারেনি।'

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'হুম, এ আবার কি রকম কথা?'

জয়ন্ত বুক-পকেট থেকে একখানা হৃষ্টপুষ্ট পকেট-বই বার করে বললে, 'দেখুন।'

—'কি দেখব?'

—'আততায়ীর বুলেট জামার পকেট ভেদ করে পকেট-বইয়ের মলাট আর অনেকগুলো পাতা ফুঁড়ে আর বেশি এগুতে পারেনি। আমি অক্ষত, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

মানিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন।'

—'হ্যাঁ ভাই। কিন্তু কেবল আমাকে নয়, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ভগবান এই উপায়ে বহু সৈনিকেরই প্রাণরক্ষা করেছেন।'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ চমৎকৃতের মতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন নিজের মতন মনেই বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার, আশ্চর্য ব্যাপার!'

মানিক চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'কিন্তু বন্দুক ছুড়লে কে?'

দুইজন পাহারাওয়ালার মাঝখানে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ভদ্রেশ্বর। সে মুখ টিপে হেসে বললে, 'বন্দুকটা যে আমি ছুড়িনি অন্তত এ সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই?'

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই, চোপ। বন্দুক তুই না ছুড়ে থাকিস, তোর সাঙাত ছুড়েছে।'

—'আমার সাঙাত?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই পাজি ছুঁচো উল্লুক মণিমোহন ব্যাটা!'

—'সুন্দরবাবু, আপনাদের ওই মণিমোহন পাজি কিনা জানি না, কিন্তু সে একসঙ্গেই ছুঁচো আর উল্লুক হতে পারে না। ওরা হচ্ছে দুজাতের দুরকম জীব।'

—'চোপরাও, চোপরাও! তাহলে ছুঁচো হচ্ছিস তুই, আর উল্লুক হচ্ছে মণিমোহন।'

—'মহাশয়, আর একবার ভ্রম সংশোধন করবার আজ্ঞা হোক।'

—'ভ্রম সংশোধন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। মণিমোহন উল্লুক কি না জানি না, কিন্তু আমি যে ছুঁচো নই, এ বিষয়ে আপনারা সকলে একমত হতে বাধ্য। আমি মানুষ।'

—'হুম্, হুম্! তোর মতন বক্কেশ্বর জীবনে আমি আর দেখিনি। তুই যদি ফের বক বক করিস তাহলে তোর দুই গালে মারব দুই থাবড়া!'

অতি বিনীত ভাবে মাথা কাত করে ভদ্রেশ্বর বললে, 'দয়াময়, এই আমি গাল পেতে দিলুম। থাবড়া মারবেন তো অনুগ্রহ করে ঝটিতি এগিয়ে আসুন!'

সুন্দরবাবু হার মেনে ভদ্রেশ্বরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগলেন।

ভদ্রেশ্বর তবু নাছোড়বান্দা। টিটকারি দিয়ে বললে, 'বেশি ফুলবেন না মহাশয়, আপনার দোদুল্যমান ভুঁড়ির অসুখ হতে পারে।'

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, গর্জন করে বলে উঠলেন, 'সেপাই, সেপাই! ভদ্দুরেটাকে টানতে টানতে বাগানের বাইরে নিয়ে যাও! একেবারে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলো গে!'

ভদ্রেশ্বর বললে, 'টানাটানি হানাহানির দরকার নেই বাবা! সেপাইগণ, অগ্রসর হও! আমি পোষমানা ভেড়ার মতন তোমাদের সঙ্গে কুইকমার্চ করব।'

ভদ্রেশ্বর বিদায় হলে পর জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু তাহলে আপনার বিশ্বাস, মণিমোহনই আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেছে?'

—'সে নয় তো আর কে এ কাজ করতে পারে? ব্যাটা নিশ্চয়ই আড়ালে-আবডালে কোথায় লুকিয়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে, সে যদি আবার গুলি ছোড়ে?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি ফটকের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলুম। গুলিটা এসেছে ওই দিকের কোনো ঝোপঝাপ থেকেই।'

—'তাই না কি, তাই না কি? তাহলে তো এখনই ওদিকটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হয়!'

—'হ্যাঁ, তাই দেখুন। বাগানের বাইরে পুলিশের কড়া পাহারা আছে, আততায়ী নিশ্চয়ই এখনও বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু একেবারে থ! দূরে দেখা গেল, মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে ফটকের দিকে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ!

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'চন্দ্রনাথ এখনও বাগানের ভিতরে কি করছে?'

সুন্দরবাবু চিৎকার করে নিজের সহকারীকে ডেকে বললেন, 'পরেশ, পরেশ! লোক-জন নিয়ে দৌড়ে যাও, চন্দুরেকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসো!'

অনতিবিলম্বে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথের পুনরাগমন। তার চেহারায় ভয়-সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্র নেই, ভাবভঙ্গি অতীব সপ্রতিভ।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে শুধোলেন, 'আপনি এতক্ষণ এখানে কি করছিলেন?'

—'হাওয়া খাচ্ছিলুম না নিশ্চয়ই!'

—'স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিন। আপনি এতক্ষণ এখানে কি করছিলেন?'

—'হঠাৎ শ্রবণ করলুম বন্দুকের শব্দ। পরমুহূর্তে দর্শন করলুম আপনার বন্ধুর পতন। তাই শুনে আর দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কি তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। সেটাও কি বে-আইনি?'

সুন্দরবাবু বুলেটবিদ্ধ পকেট-বইখানা চন্দ্রনাথের সামনে ধরে বললেন, 'দেখুন।'

—'দেখছি।'

—'এই পকেট-বই আজ জয়ন্তকে বাঁচিয়েছে।'

—'বুঝছি।'

—'এইবার আমরা আপনার জামা-কাপড় খুঁজে দেখব!'

—'কেন?'

—'দেখব, জামা-কাপড়ের মধ্যে আপনি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন কি না?'

—'কি রকম আগ্নেয়াস্ত্র? রাইফেল?'

—'জামা-কাপড়ের ভিতরে রাইফেল লুকিয়ে রাখা চলে না।'

—'তবে কি খুঁজতে চান? রিভলবার?'

—'ধরুন তাই।'

—'কিন্তু যে বুলেট দেখালেন, ওটা তো রাইফেলের বুলেট। কোনও ছোটো আকারের রাইফেলের বুলেট।'

—'তবু খুঁজে দেখব।'

—'দেখুন।'

খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ। বিপজ্জনক কিছুই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'পরেশ, লোকজন নিয়ে ফটকের ওই দিকে যাও। ঝোপঝাপ খুঁজে রিভলবার-টিভলবার কিছু পাও কি না, দেখ।'

সদলবলে পরেশের প্রস্থান।

চন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'পাওয়া গেছে রাইফেলের বুলেট, আপনি খুঁজছেন রিভলবার!'

—'রাইফেলও পেতে পারি।'

—'আপনাদের অন্বেষণ সফল হলে খুসি হব।'

—'আপনার হাতে অমন মোটা লাঠি কেন?'

—'আমার শখ।'

—'ও-রকম শখ ভালো নয়। ভবিষ্যতে রোগা লাঠি নিয়ে আমার সামনে আসবেন।

—'উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।'

খানিক পরে পরেশ ফিরে এসে জানালে, কোথাও কোনও রকম আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান মিলল না।

চন্দ্রনাথ সকৌতুকে বললে, 'তাহলে সুন্দরবাবু অতঃপর আমি সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করতে পারি?'

—'হুম্!'

—'নমস্কার।'

সুন্দরবাবু প্রতিনমস্কার করলেন না। চন্দ্রনাথ চলে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, এই চন্দুরে আর ওই ভন্দুরেটা দেখছি আমাকে সাত ঘাটের জল না খাইয়ে ছাড়বে না।'

জয়ন্ত বললে, 'খাওয়ায় যদি, খেতে হবে। আপাতত কি করবেন?'

—'আরও ভালো করে থানাতল্লাস। দেখি, মণিমোহন কোথাও ঘুপটি মেরে আছে কি না।'

—'আমি আর মানিক এইবারে প্রস্থান করতে চাই।'

* * * *

পরদিন প্রভাতে বেজে উঠল জয়ন্তের টেলিফোনঘণ্টা।

রিসিভার নিয়ে জয়ন্ত বললো, 'হ্যালো!'

—'আমি সুন্দরবাবু।'

—'আপনার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কেন?'

—'আবার খুন! আবার চুরি—যে-সে চুরি নয়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না উধাও! আবার পদচিহ্ন!'

—'পদচিহ্ন?'

—'হ্যাঁ, মণিমোহনের আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পদচিহ্ন—যাকে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি শীঘ্র এসো।'

—'আপনি কোথায়?'

—'ঘটনাস্থলে।'

—'ঠিকানা?'

—'সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট!'

নয়

অপরিচিতের সুপরিচিত পদচিহ্ন

সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট। নূতন ঘটনাস্থল। একখানা রেলিংঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ি। ফটক পার হলেই সামনে পাওয়া যায় খানিকটা খোলা জমি। সেইখানে কয়েকজন পুলিসকর্মচারি ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে চেয়ার পেতে বসেছিলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এসো ভায়া, এসো। আগে গোড়ার কথা শুনবে, না একেবারেই বাড়ির ভিতরে যাবে?'

জয়ন্ত বললে, 'আগে গৌরচন্দ্রিকাটা হয়ে যাওয়াই ভালো।'

—'হুম্ উত্তম! এই বাড়ির মালিকের নাম রামময় মণ্ডল। লোহার ব্যাপারী। ধনী ব্যক্তি। স্ট্যান্ড রোডে গদি। সংসার খুব বড় নয়—স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে ও এক ভাই। বহু দিন রোগ ভোগের পর স্ত্রীর দেহ ভেঙে যাওয়াতে ডাক্তাররা বায়ুপরিবর্তনের ব্যবস্থা দেন। কাজের চাপের জন্যে রামবাবু নিজে কলকাতা ছাড়তে পারেননি, ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিমুলতলায়। হঠাৎ পরশু রাত্রে সেখান থেকে তাঁর ভাইয়ের কাছে এক টেলিগ্রাম আসে ঃ 'বউদি মৃত্যুশয্যায়। অবিলম্বে চলে এসো।' কিন্তু টেলিগ্রাম পাবার পর ট্রেন ছিল না বলে রামবাবু পরশু রাত্রে শিমুলতলায় যেতে পারেননি। তিনি গতকল্য সকালের ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করেছেন, বাড়িখানা পুরাতন ও অতিবিশ্বস্ত কর্মচারি দ্বিজদাসের জিম্মায় রেখে।'

বাধা দিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, 'দ্বিজদাস ছাড়া বাড়ির ভিতরে আর কেউ ছিল না?'

—'ছিল। তিন জন বেয়ারা আর দুই জন দ্বারবান। বাড়িখানার দু'টো মহল—সদর আর অন্দর। বেয়ারা আর দ্বারবানদের ঘর সদরের একতলায়। দ্বিজদাস ছিল অন্দরে দোতলার একখানা ঘরে—রামবাবুর শয়নগৃহের ঠিক পাশেই। আজ সকালে দেখা যায়, দোতলার বারান্দার উপরে পড়ে আছে দ্বিজদাসের মৃতদেহ, কে তার বুকের উপরে ছোরার আঘাত করেছে। রামবাবুর ঘরের দরজার কুলুপ ভাঙা, ঘরের ভিতরকার লোহার সিন্দুক থেকে অদৃশ্য হয়েছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না।'

—'অত টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে বাড়ির ভিতরে রাখা হয়েছিল কেন?'

—'টাকাটা রামবাবুর হাতে এসেছিল পরশু বৈকালেই। রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে রামবাবু দুশ্চিন্তায় পাগলের মতন হয়ে যান। কাল সকালে উঠেই তাঁকে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ছুটতে হয়েছিল বলে তিনি টাকার কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি।'

—'অপরাধীরা কি দলে ভারি ছিল?'

—'জানি না। তবে পদচিহ্ন পেয়েছি দুই জনের। ফোনেই তো বলেছি, দুই পদচিহ্নই আমাদের পরিচিত। এক চিহ্নের মালিক মণিমোহন, অন্য চিহ্নের মালিক আজও অজ্ঞাতবাস করছে।'

—'তারা বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে?'

—'খিড়কির দরজা দিয়ে!'

—'ওখানকার দরজা কি বন্ধ ছিল না?'

—'ছিল বলেই তো শুনেছি।'

—'তবে?'

জয়ন্তের কাছে এসে সুন্দরবাবু তার কানে কানে বললেন, 'বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই

অপরাধীদের সহকারী আছে। হয়তো কোনও দ্বারবান বা বেয়ারা। সে খোঁজ পরে নেওয়া যাবে। আপাতত তাদের সবাইকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।'

—'আপনার গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল?'

—'আর একটু বাকি আছে। কিন্তু যে সে একটু নয়, দস্তুরমতো গুরুতর একটু।'

—'অর্থাৎ?'

—'মিনিট পঁচিশ আগে আজ শিমুলতলা থেকে দ্বিজদাসের নামে রামবাবুর এই জরুরি টেলিগ্রামখানা এসেছে। পড়ে দেখো।'

টেলিগ্রামখানা নিয়ে জয়ন্ত পাঠ করলে ঃ স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ মিথ্যা। তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত। অবিলম্বেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।'

জয়ন্ত মৌন মুখে ভাবছে, সুন্দরবাবু বললেন, 'রামবাবুকে কলকাতা থেকে যথাসময়ে সরাবার জন্যে কেউ তাঁকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল। কে সে? নিশ্চয়ই অপরাধীদের কেউ!'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার অনুমানই সত্য বলে মনে হচ্ছে। দেখছি অপরাধীরা রীতিমতো আট-ঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু অগ্রসর হয়ে বললেন, 'এইবারে বাড়ির ভিতরে চলো।'

প্রথমেই তারা গিয়ে ঢুকল রামময়বাবুর শয়নগৃহে। যার ভিতর থেকে টাকা ও গহনা চুরি গিয়েছে সেটা লোহার সিন্দুক নয়, স্টিলের আলমারি।

আলমারিটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, অপরাধীরা কাজ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তারা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে এনেছিল একটা পোর্টেবল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, আগুনের শিখায় ইস্পাত গলিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলা হয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'একেবারে ঝানু অপরাধী। এত কাণ্ডকারখানার মধ্যেও কোথাও আধখানা আঙুলের ছাপ পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মানিক একটু বিস্মিত স্বরে বললে, 'অথচ আপনি বলছেন, তারা তাদের পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে?'

—'ছাপ বলে ছাপ? স্পষ্ট স্পষ্ট ছাপ।'

জয়ন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক!'

—'সন্দেহজনক? কেন?'

—'কেন তা জানি না। এখন বাইরে চলুন।'

বারান্দায় পড়েছিল রক্তাক্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা মূর্তি। হতভাগ্য দ্বিজদাসের মৃতদেহ। কাপড় সরিয়ে দেহটার উপরে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে ছোরার এক আঘাতেই ভদ্রলোক মারা পড়েছেন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বিয়োগান্ত দৃশ্যের কতকটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। খুব সম্ভব অপরাধীরা যখন রামবাবুর ঘরের দরজা খোলবার চেষ্টা করছিল, সেই সময়ে দ্বিজদাসের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ব্যাপার কি জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত হন।'

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে বললে, 'এই পদচিহ্নগুলোর কথাই বলছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

ছয়জোড়া পদচিহ্ন...তার মধ্যে তিনজোড়া খুব স্পষ্ট। দুইজন লোকের কর্দমাক্ত জুতার ছাপ। চিহ্নগুলো আরম্ভ হয়েছে বারান্দায় একটা নর্দমার কাছ থেকে।

হেঁট হয়ে দেখতে দেখতে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, গতকল্য রাত্রে এ অঞ্চলে কি বৃষ্টি পড়েছিল?'

—'নিশ্চয়ই নয়।'

—'আজ সকালের কাগজে আমিও আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখেছি। কাল কলকাতার কোথাও একফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি।'

—'হয়নি তো হয়নি। তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

—'মাথা থাকলেই মাথায় ব্যথা হওয়া সম্ভব।'

—'তার মানে তুমি বলতে চাও, আমার মাথা থেকেও নেই?'

—'আমি ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি এই কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগুন না থাকলে যেমন ধোঁয়া দেখা যায় না, তেমনি জল না পড়লে মানুষের জুতোও কর্দমাক্ত হয় না।'

চমৎকৃতভাবে সুন্দরবাবু কেবলমাত্র উচ্চারণ করলেন—'হুম্!'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ির কোনও বেয়ারাকে ডাকুন।'

একজন বেয়ারা হাজির।

জয়ন্ত শুধোলে, 'নর্দমার কাছে দেখছি একটা মগ আর একটা খালি বালতি রয়েছে।'

বেয়ারা বললে, 'আজ্ঞে, ব্যবহার করবার জন্যে ওখানে সব সময়েই জলভরা বালতি থাকে।'

—'কাল রাত্রেও ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! কাল সন্ধের সময়ে আমি নিজের হাতে ওখানে জলভরা বালতি রেখে গিয়েছি।'

—'কিন্তু বালতিতে এখন জল নেই।'

—'তাহলে কাল রাতে কারুর জলের দরকার হয়েছিল।'

—'আচ্ছা, তুমি যাও। সুন্দরবাবু!'

—'কি ভাই?'

—'নর্দমার কাছটা পরীক্ষা করে দেখুন। ওখানে রয়েছে পাৎলা কাদার প্রলেপ।'

—'এখেকে কি বুঝব?'

—'এই পদচিহ্নগুলো হচ্ছে প্রদর্শনীর জন্যে।'

—'প্রদর্শনী?'

—'হ্যাঁ! অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়।'

—'কারণ?'

—'কারণ বোঝবার চেষ্টা করুন আপনি। এসো মানিক, এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই।'

জয়ন্ত ও মানিকের একসঙ্গে প্রস্থান। সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টাক চুলকোতে লাগলেন।

পরের দিন সকালবেলায় মানিক এসে দেখলে, কি যেন ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত তার পুস্তকাগারের মেঝের উপরে পদচারণ করছে।

মানিক বললে, 'তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি যেন কিছু মনে করবার চেষ্টা করছ, কিন্তু মনে করতে পারছ না।'

—'ঠিক তাই। একখানা বইয়ের নাম কিছুতেই স্মরণে আসছে না।'

—'কি রকম বই?'

—'সেইটেই তো প্রশ্ন। বইখানা কিনে পড়েছিলুম অনেক দিন আগে। আর একটা বিশেষ ঘটনার কথাও মনে আছে। কিন্তু বইখানার নাম মনে আনতে পারছি না বলে বুঝতে পারছি না, ঘটনাটা কাল্পনিক কিংবা সত্যকাহিনী।'

—'ঘটনাটা কাল্পনিক হলে কিছু ক্ষতি আছে?'

—'আছে বইকি, খুব আছে! সেটা কাল্পনিক ঘটনা হলে আমার অনুমানও অমূলক বলে প্রমাণিত হবে।'

—'অনুমানটা কি শুনতে পাই না?'

—'ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত বুলেটটা এসেছিল কিরকম আগ্নেয়াস্ত্রের ভিতর থেকে, সেইটেই আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।'

মানিক অত্যন্ত বিস্মিত হল, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। জয়ন্ত বইয়ের আলমারিগুলোর ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বারংবার এদিকে-ওদিকে আনাগোনা করতে লাগল। মানিক একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে সেদিনের খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। এই ভাবে কেটে গেল প্রায় বিশ মিনিট।

হঠাৎ জয়ন্ত সানন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

—'কি পেয়েছ হে?'

—'সেই বইখানা।'

—'কি বই?'

—'জোসেফ গোল্লোম্ব সাহেবের 'মাস্টার ম্যান হান্টারস,'—অর্থাৎ ওস্তাদ মনুষ্য-শিকারী। বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে।'

—'ওখানা কি উপন্যাস?'

—'মোটেই নয়! ওর আগাগোড়াই আছে কেবল সত্য ঘটনার পর সত্য ঘটনা। দস্তুরমতো অপরাধ-বিজ্ঞানের বই, 'কাল্পনিক কথা একটাও নেই।'

—'তাহলে তোমার অনুমান ভুল নয়?'

—'খুব সম্ভব তাই।'

—'কি রকম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তোমাকে গুলি করা হয়েছিল?

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

—'হ্যালো! ......আ-রে, কাজ সকালেও ফোনে সুন্দরবাবু! ব্যাপার কি? এখনই আমাকে আপনার কাছে ছুটতে হবে? কেন? কাল রাত্রেও আবার একটা নূতন নরহত্যা হয়েছে? অ্যাঁ, কে খুন হয়েছে বললেন? এবারে স্বয়ং মণিমোহন? এবারের ঘটনাস্থলেও সেই অপরিচিত ব্যক্তির পরিচিত পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা এখনই যাচ্ছি।'

'রিসিভারটা, রেখে দিয়ে জয়ন্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গম্ভীর মুখে। তার পর ধীরে ধীরে বললে, মানিক, সব শুনলে তো! ঘটনার স্রোত যে এমনি কোনও দিকেই ছুটবে, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। যবনিকা পড়তে আর বেশি দেরি নেই! নাও, এখন ওঠো।'

দশ

সুপরিচিত অপরিচিত

তখন মর্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল মণিমোহনের দেহ। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে সুন্দরবাবু সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করলে, ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে মণিমোহনের আকৃতিগত সাদৃশ্য। একরকম দীর্ঘতা, একরকম গঠন এবং প্রায় একরকম মুখ-চোখ-নাক। কেবল ভদ্রেশ্বরের জোড়া ভুরু, মণিমোহনের ভুরু জোড়া নয়। এবং ভদ্রেশ্বরের চেয়ে মণিমোহনের রং একটু বেশি ফরসা। এবং মণিমোহনের চেয়ে ভদ্রেশ্বরের কপাল বেশি প্রশস্ত। কিন্তু এই অল্প-স্বল্প পার্থক্য চেষ্টা করলে খুব সহজেই ঢেকে ফেলা যায়।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি মণিমোহন মারা পড়েছে ছোরার আঘাতে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বুকের উপরে মোক্ষম আঘাত! ডাক্তারের মতে, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে, মণিমোহন হয়তো ছটফট করবারও সময় পায়নি।'

—'কোন সময়ে এর মৃত্যু হয়েছে, ডাক্তার সে সম্বন্ধে কোনও মতপ্রকাশ করেছেন কি?'

—'ডাক্তারি হিসাবে প্রকাশ, মণিমোহনের মৃত্যু হয়েছে অন্তত গতকল্যকার সন্ধ্যার আগে।'

—'মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কখন?'

—'আজ ভোরবেলায়।'

—'আপনার মুখে শুনলুম, বালির কাছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে একটা সরু গলির ভিতরে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে। সে কি রকম গলি? সেখান দিয়ে কি লোক-চলাচল হয় না?'

—'এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

—'কাল সন্ধ্যার আগে খুন হয়েছে, অথচ লাশ পাওয়া গেছে আজ সকালে! জায়গাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নির্জন?'

—'না, জায়গাটা মোটেই নির্জন নয়। স্থানীয় লোকরা বলে, কাল রাত দুপুরেও গলির ভিতরে লাশ-টাশ কিছুই ছিল না।'

—'তাহলে মণিমোহন মারা পড়েছে অন্য কোনও জায়গায়? হত্যার অনেক পরে, গভীর রাতে তার দেহটা ওই গলির ভিতরে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

—'জয়ন্ত, আগে আমিও ওই সন্দেহ করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম খুনটা হয়েছে ওই গলিতেই। কিন্তু তারপর ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু—কিন্তু—' বলতে বলতে সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

—'থামলেন কেন? ভাবছেন কি?'

—'হুম্! আমি ভাই একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছি!'

—'কেন?

—'সন্ধ্যার আগেই যদি মণিমোহনের মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে রাত বারোটার পরেও তার মৃতদেহ থেকে কি রক্তের ধারা বইতে পারে?'

—'আপনার কথার অর্থ কি?'

—'মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেখানকার মাটি ভিজে গিয়েছে রক্তের ধারায়।'

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বলল, 'না, অতক্ষণ পরে মৃতদেহ থেকে রক্ত বেরুতে পারে না।'

—'তবে? ডাক্তার কি ভুল রিপোর্ট দিয়েছেন?

—'উঁহু, সম্ভবতঃ ডাক্তার ভুল করেননি। সুন্দরবাবু, আমি আর একটা ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছি।'

—'কি আন্দাজ?'

—'ফোনে আমাকে বললেন না ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছে সেই নিরুদ্দেশ অপরিচিত ব্যক্তির সুপরিচিত পদচিহ্ন?'

—'হ্যাঁ। সেই পদচিহ্নগুলো—'

—'পাওয়া গিয়েছে রক্তমাখা মাটির উপরে? কেমন, এই তো?'

চরম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, কেমন করে জানলে তুমি?'

—'বললুম তো আন্দাজে।'

—'এ কি রকম আন্দাজ বাবা? এ যে মন্ত্রশক্তিকেও হার মানায়!'

—'আমার আন্দাজ প্রায়ই সত্য হয়ে দাঁড়ায়, কারণ যুক্তি থেকেই তার উৎপত্তি।'

—'ধন্য ভায়া। দাদা হয়েও তোমার পায়ে গড় করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন কি করবে? ঘটনাস্থলটা একবার দেখে আসবে না কি?'

—'না সুন্দরবাবু, প্রয়োজন নেই। আমি মনে মনে মামলাটা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছি, কেবল একটু তদন্ত বাকি আছে। বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা, শুভস্য শীঘ্রম।'

—'আমাকে কি করতে বলো?'

—'জনকয়েক লোক নিয়ে এখনই আমার সঙ্গে চলুন।'

—'কোথায় হে?'

—'এখনই দেখতে পাবেন।'

*　　*　　*　　*

জয়ন্তের নির্দেশে পুলিশের জিপ গাড়ি এসে থামল শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ির সামনে।

সবিস্ময়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'জয়ন্ত তুমি কি চন্দুরের কাছেই এসেছ!'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি কি ওর বিরুদ্ধে নতুন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?'

—'কোনও প্রমাণই পাইনি।'

—'তবে?'

—'আমি চন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতে চাই।'

—'আর আমরা কি করব?'

—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করবেন।'

এমন সময়ে বোধহয় গাড়ি থামার শব্দ শুনেই চন্দ্রনাথ স্বয়ং বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দোতলার বারান্দায়। তারপর উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, 'আরে, আবার আমার দ্বারে সুন্দরবাবুর দল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। নেমে আসুন।'

মিনিট দুই পরে চন্দ্রনাথ নিচেয় নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এল। হাতে তার সেই মোটা লাঠিগাছা।

জয়ন্ত বললে, 'মশাই কি বাড়িতেও ওই বাঘমারা লাঠিছাড়া হয়ে থাকেন না?'

চন্দ্রনাথ বললে, 'কোমরে হঠাৎ লাম্বেগোর ব্যথা হয়েছে। লাঠি ছেড়ে চলতে কষ্ট হয়। সুন্দরবাবু, কি একটা খবরের কথা বলছিলেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা কইতে হবে না কি? আপনি কি আমাদের ধুলো-পায়েই বিদায় করতে চান?'

চন্দ্রনাথ নাচারের মতো বললে, 'বেশ, তবে বাড়ির ভিতরেই আসুন।'

সকলে বৈঠকখানায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলে পর চন্দ্রনাথ বললে, 'আপনারা এমন কি জরুরি খবর দেবার জন্যে এত দূর ছুটে এসেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার বন্ধু মণিমোহনকে মনে আছে তো?'

—'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। জানি না সে কোথায় অজ্ঞাতবাস করছে।'

—'আমরা এত দিন পরে তাকে খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় নয়।'

—'কি বলছেন!'

—'হ্যাঁ, গতকল্য কে তাকে খুন করেছে। আমরা তার মৃতদেহ পেয়েছি।'

—'শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। অপরাধীর কোনও সন্ধান পেয়েছেন?'

—'না। মণিমোহনের সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এমন কোনও লোককে আপনি জানেন?'

—'তার কোনও শত্রু বা বন্ধুকেই আমি চিনি না, কারণ তার সঙ্গে বেশি দিন আমার আলাপ হয়নি।'

জয়ন্ত এইবার মুখ খুললে। বললে, 'আপনার বাড়িতে কয়খানা ঘর আছে চন্দ্রবাবু?'

—'দশখানা।'

—'ঘরগুলো একবার দেখাবেন?'

—'আপনার কৌতূহল একটু অদ্ভুত নয় কি?'

—'কেন, দেখাতে কোনও আপত্তি আছে?'

—'কিছু না। আসুন।'

একে একে সব ঘর দেখিয়ে চন্দ্রনাথ সর্বশেষে দোতলায় একখানা ঘরে ঢুকে বললে, 'এই আমার শোবার ঘর।'

জয়ন্ত একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর এক দিকে চেয়ে বললে, 'ওখানে রয়েছে পরে পরে সাত জোড়া জুতো। সব জুতোই আপনার?'

শুকনো হাসি হেসে চন্দ্রনাথ বললে, 'হ্যাঁ। আমার কিঞ্চিৎ পাদুকাবিলাস আছে।'

জয়ন্ত জুতোগুলোর সামনে গিয়ে বসে পড়ল। একে একে সব জুতো হাতে করে তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে বললে, 'বাঃ, বেশ জুতোগুলি। চন্দ্রবাবুর পছন্দ আছে বটে!'

চন্দ্রনাথ ভাবহীন মুখে গম্ভীর স্বরে বললে, 'মশায়ের আর কিছু জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য বা বক্তব্য আছে?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'নিচেয় ফিরে যাই চলুন।'

সকলে আবার বৈঠকখানায়।

সুন্দরবাবুর এক সহকারী কর্মচারী একটা লোককে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে। বললে, 'স্যার, এই লোকটা বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল, আমরা যেতে দিইনি।'

লোকটা বললে, 'আমি এই বাড়ির চাকর। বাজারে যাচ্ছি।'

সহকারী বললে, 'কিন্তু ও বাজারে যাচ্ছে রেশন ব্যাগের ভিতরে এক জোড়া জুতো নিয়ে!'

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, 'জুতো! দেখি, দেখি!'

চন্দ্রনাথ বললে, 'কোথাকার একটা উটকো লোক আজ ভোরে রেশন ব্যাগ সুদ্ধ ওই জুতো জোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিল। তাই চাকরকে আমি বলেছিলুম সে যেন বাজারে যাবার সময়ে জুতোজোড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়।'

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে একখানা আতশী কাচের সাহায্যে জুতোজোড়া খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'সুন্দরবাবু, গাড়িতে ওঠবার সময় আপনাকে কি আনতে বলেছিলুম, মনে আছে?'

—'সেই অপরিচিত ব্যক্তির পদচিহ্নের ছাঁচ তো? এনেছি।'

—'তার সঙ্গে এই জুতো জোড়া মিলিয়ে দেখুন।'

গাড়ি থেকে ছাঁচ আনানো এবং জুতোর সঙ্গে মেলানো হল। অবিকল মিলে গেল—একচুল এদিক-ওদিক হল না।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হত্যাকারীর জুতো!'

জয়ন্ত বললে, 'সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। জুতোর তলার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন জায়গায় জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ। তার মানে হচ্ছে কাল মণিমোহনকে বধ করবার পরেও এই জুতোজোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জুতো সংগ্রহ করবার জন্যেই আমার এখানে আগমন।'

চন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললে, 'কি বললেন? আপনি জানতেন যে ওই জুতো আছে আমার এইখানেই?'

—'ঠিক জানতুম বলতে পারি না, তবে এইরকম একটা সন্দেহ করেছিলুম বটে।'

চন্দ্রনাথ খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, 'এতক্ষণ আমার ধারণা ছিল কোনও উটকো লোক জুতোজোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে পুলিশের কারসাজি! কিন্তু আপনাদের সমস্ত কূট-কৌশলই ব্যর্থ হবে। দেখুন ওই জুতোর সঙ্গে আমার পা মিলিয়ে। আমি বলছি, এ জুতো আমার নয়।'

—'জয়ন্ত সহাস্যে বললে, জানি ও-জুতোর মাপ আপনার পায়ের চেয়ে বড়ো। কিন্তু আমি কেবল জুতোর আসল গুপ্তকথাই জানি না, বোধ হচ্ছে আপনার ওই লাঠির গুপ্তকথাও আমার কাছে অবিদিত নেই। সুন্দরবাবু, আপনি এখন অনায়াসেই চন্দ্রনাথকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারেন।'

আচম্বিতে চন্দ্রনাথের মুখ হয়ে উঠল বীভৎস এক দানবের মতন! সঙ্গে সঙ্গে ফস করে সে লাঠিগাছা দুই হাতে কোমর-বরাবর উঁচু করে তুলে ধরলে—

এবং তৎক্ষণাৎ একটা রিভলবার গর্জন করে উঠল ও পরমুহূর্তে লাঠিগাছা তার হাত থেকে খসে মেঝের উপরে পড়ে গেল সশব্দে। চন্দ্রনাথের ডান হাতের কবজির উপরে ফুটে উঠল রক্তের রেখা!

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'রিভলবার ছুড়লে কে, রিভলবার ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'সে কথা পরে শুনবেন সুন্দরবাবু! এখন চট করে লাঠিগাছা তুলে নিন দেখি! কিন্তু খুব সাবধান, বোধহয় ওটা লাঠি নয়—কোনও সাংঘাতিক ভয়াবহ অস্ত্র!'

এগারো

পদচিহ্ন রহস্য

চন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত লাঠিগাছটা মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'কিন্তু রিভলবার ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'রিভলবার ছুড়েছি আমি সুন্দরবাবু!'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'হতেই পারে না! যখন রিভলবারের আওয়াজ হয় তখন তোমার ডান হাত ছিল জামার পকেটের ভিতরে।'

—'ঠিক দেখেছেন। এখনও আমার ডান হাত জামার পকেটের ভিতরেই আছে।'

—'তবে?'

—'পকেটের ভিতর থেকেই আমি রিভলবার ছুড়েছিলুম।'

—'সে কি হে?'

—'এই দেখুন, আমার পকেট ছেঁদা করে রিভলবারের গুলিটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।'

—'হুম্!'

—'চন্দ্রনাথকে আমি বিশ্বাস করিনি, আর আমার সব চেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল ওর ওই মোটা লাঠিগাছার উপরে। আমি জানতুম, সে যদি হঠাৎ কোনও চালাকি খেলে বসে, তাহলে পকেট থেকে আর রিভলবার বার করবার সময় পাব না। তাই পকেটের ভিতরেই রিভলবার ধরে আমি আগে থাকতে তৈরি হয়ে ছিলুম।'

—'ধন্যি ছেলে যা হোক!'

—'না সুন্দরবাবু, ব্যাপারটায় নূতনত্ব নেই কিছু। চোখের পলক পড়বার আগেই কাজ সারবার জন্যে মার্কিন গুণ্ডাদের মধ্যে এই নিয়মই প্রচলিত আছে। এখন ও কথা থাক। লাঠিগাছটা আমার হাতে দিয়ে আগে চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করুন।'

সুন্দরবাবুর হুকুমে তখনই পাহারাওয়ালারা এসে চন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়াল।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে চন্দ্রনাথ বললে, 'বটে, বটে! আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পেয়েছ তোমরা?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চন্দ্রনাথের লাঠিগাছা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর সকলের দিকে পিছন করে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে লাঠিগাছা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরলে। তার পরেই ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে গুডুম করে একটা আওয়াজ হল।

সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, 'বন্দুক ছুড়লে কে, বন্দুক ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'মানে? বন্দুকটাও তোমার পকেটের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ না কি?'

তখনও ধূমায়মান লাঠিগাছা দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'না। আমি ছুড়েছি এই লাঠি-বন্দুকটা।'

—'লাঠি আবার বন্দুকে পরিণত হতে পারে না কি? 'গুপ্তি'র কথা শুনেছি বটে, লাঠির ভিতরে লুকানো থাকে ছোটো তরোয়াল। কিন্তু লাঠি-বন্দুক আবার কি চীজ বাবা?'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আমার হাতে যা দেখছেন, তা লাঠির ছদ্মবেশে বন্দুক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দেখুন লাঠির রূপোবাঁধানো মুণ্ডি। তার তলায় এই যে দেখছেন সোনার ব্যান্ড বা বন্ধনী, আঙুল দিয়ে এটা একটু সরানো যায়। কিন্তু সরাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাঠির ভিতরে যে ট্রিগার বা টিপকল আছে, সেটা পড়ে যাবে আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে বুলেটটা। কি হে চন্দ্রনাথ, তাই নয় কি?'

চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ মুখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিলে না।

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'এমন আজব বন্দুকের কথা কখনও তো শুনিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'না শোনবারই কথা! এ দেশে এরকম বন্দুক থাকতে পারে আমিও আগে তা জানতুম না।'

—'তবে তুমি লাঠির গুপ্তকথা আবিষ্কার করলে কেমন করে?

—'বলছি শুনুন। এই মোটা লাঠিগাছা দেখলেই অসাধারণ বলে মনে হয় না কি? এরকম লাঠি নিয়ে কোনও শৌখীন বাবুই হাওয়া খেতে বেরোয় না। লাঠির ওই অসাধারণতা প্রথম দিনেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আমি তখন ওটাকে ভেবেছিলুম সাধারণ গুপ্তি জাতীয় কোনও অস্ত্র। তারপর আমার প্রথম সন্দেহ জাগ্রত হয় ভদ্রেশ্বরের বাগানে গিয়ে।'

—'কেন, সেখানে তো আমরাও ছিলুম, আমরা তো চন্দ্রনাথের লাঠিকে তখন সন্দেহজনক বলে মনে করতে পারিনি।'

—'গুটিকয় কথা ভেবে দেখুন। ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমাদের কোনোই বন্দুকধারী শত্রু ছিল না। মণিমোহন পলাতক, ভদ্রেশ্বর বন্দী, যেদিক থেকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে দাঁড়িয়েছিল কেবল চন্দ্রনাথ! কিন্তু তার হাতে ছিল, মাত্র এই লাঠিগাছা। বাগান তল্লাস করেও অন্য কোনও লোক বা বন্দুক খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বন্দুক ছুড়লে কে? একমাত্র উত্তর হতে পারে, চন্দ্রনাথ। কিন্তু তার কাছেও ওই লাঠি ছাড়া আর কোনও অস্ত্রই ছিল না। গুলি তো আকাশ থেকে খসে পড়েনি, তাই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি চন্দ্রনাথের ওই লাঠির ভিতরেই কোনও রহস্য নিহিত আছে? বাড়িতে ফিরে এসে এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগে কি একখানা ইংরেজি কেতাবে অদ্ভুত একটা লাঠির কথা পাঠ করেছিলুম। কিন্তু বইখানার নামটা প্রথম মনে পড়েনি। তারপর আমার লাইব্রেরির আলমারিগুলোর ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ যখন বইখানা চোখে পড়ে গেল, তখন মানিকও সেখানে হাজির ছিল। কি হে মানিক, বইখানার নাম তুমি এরই মধ্যে ভুলে যাওনি তো?'

মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি! বইখানা হচ্ছে জোসেফ গোল্লাম্ব সাহেবের 'মাস্টার ম্যান হান্টার্স'।'

—'ঠিক। ওখানা উপন্যাস নয়, সত্য ঘটনায় পরিপূর্ণ অপরাধবিজ্ঞানের বই। তারই

পাতা ওলটাতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্যারিসের 'অপরাধ যাদুঘরে'র বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পেলুম চন্দ্রনাথের এই লাঠির জুড়ি।'

সুন্দরবাবু আগ্রহভরে বললেন, 'কি রকম, কি রকম?'

—'সম্পূর্ণ ঘটনার কথা পরে আপনি বিস্তৃত ভাবে বইখানা পাঠ করলেই জানতে পারবেন, আপাতত আমি সংক্ষেপেই তার কথা বলব। ফ্রান্সে একবার একটা গার্ডেন-পার্টিতে জনৈক ব্যক্তি কোনও অজানা আততায়ীর দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হয়। তখনই ঘটনাস্থলে পুলিস আসে আর সারা বাগান আর প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জামা-কাপড় তল্লাস করে, কিন্তু বন্দুক বা কোনও রকম আগ্নেয়াস্ত্রই খুঁজে পায় না। অন্য কোনও সূত্র না পেয়ে গোয়েন্দারা খোঁজ নিতে লাগল, নিহত ব্যক্তির সঙ্গে কারুর বিশেষ শত্রুতা আছে কি না? ফলে এক ব্যক্তির উপরে পুলিসের সন্দেহ হয়। তারপর তার বাড়ি খানাতল্লাস করে আবিষ্কৃত হয় এমন একগাছা লাঠি, যা অবিকল চন্দ্রনাথের এই লাঠি গাছারই মতন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও, চন্দ্রনাথ মাথা খাটিয়ে ওই রকম সর্বনেশে লাঠি তৈরি করেছে?'

—'সে নিজে হয়তো তৈরি করেনি, হয়তো ইউরোপ থেকেই অস্ত্রটা আমদানি করেছে।'

—'তাহলে চন্দ্রনাথকে বড়ো জোর তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে বলে আমরা চালান দিতে পারি। কিন্তু আমাদের আসল মামলা তো এখনও রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই!'

রূপোর নস্যদানী বার করে নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত বললে, 'মোটেই নয়! চন্দ্রনাথের বাড়িতে আজ যে জুতো জোড়া খুঁজে পেয়েছি, আসল মামলার কিনারা হবে তার সাহায্যেই।'

—'সে কি হে, ও জুতোর মাপ যে চন্দ্রনাথের পায়ের মাপের চেয়ে বড়ো!'

—'হ্যাঁ, কিন্তু কোনও ঘটনাস্থলে যাবার সময়ে চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওই জুতোর ভিতরে কাগজের নুটি বা প্যাড গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কোনও রকমে জুতোজোড়া ব্যবহার করত।'

—'কেন?'

—'পুলিসকে ভোলাবার জন্যে।'

—'কেমন করে এটা জানতে পেরেছ?'

—'রামময়বাবুর বাড়িতে যে চুরি আর হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিন বৃষ্টি হয়নি তবু ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছিল মণিমোহনের আর এই জুতো জোড়ার কাদামাখা ছাপ। তার পর দেখা গেল, নর্দমার কাছে গিয়ে বালতির জল ঢেলে ধুলোমাখা জুতো ভিজিয়ে কারা ইচ্ছা করেই সেই পদচিহ্নগুলো সৃষ্টি করেছে। মনে আছে সুন্দরবাবু, তখনই আপনাকে আমি বলেছিলুম, অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়?'

—'হুম্!'

—'তারপর যেখানে মণিমোহন খুন হয় সেখানেও এই জুতো জোড়ার ছাপ পাওয়া যায় রক্তমাখা মাটির উপরে, অথচ সেখানে রক্ত থাকবার কথা নয়, কারণ লাশটাকে হত্যাকাণ্ডের অনেক পরে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আসলে সে রক্তও আমদানি করা। সেখানেও হত্যাকারী এই জুতো জোড়ার ছাপ দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চেয়েছিল। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

—'খানিক খানিক, সবটা নয়।'

—'গোড়া থেকে ভেবে দেখুন। চন্দ্রনাথের কুকর্মের সহকারী হল মণিমোহন। প্রথমেই কে, সরকারের জুয়েলারি ফার্মে চুরি। তারপর নন্দলালকে হত্যা করে তাকে মণিমোহন বলে চালাবার চেষ্টা। সেখানেও নন্দলালের, মণিমোহনের আর অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতো জোড়ার ছাপ পাওয়া যায়। তারপর ধরা পড়ে, মণিমোহন খুন হয়নি, মারা পড়েছে নন্দলালই। পুলিসের সন্দেহ যায় মণিমোহন আর এক অজ্ঞাত ব্যক্তির দিকে। চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল তাই।

'তারপর রামময়বাবুর বাড়িতে খুন, পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না চুরি। সেখানেও পাওয়া গেল মণিমোহনের আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতোর ছাপ। তারপর ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু খুব সম্ভব চোরাই টাকা-গয়নার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মণিমোহনের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ঝগড়া হয়, যার ফলে মণিমোহনের অকাল-মৃত্যু। লাশ অন্যত্র পাঠিয়ে সেখানে আবার পুলিসের অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির জুতোর ছাপ রেখে আসা হল। ফলে চন্দ্রনাথ ভেবেছিল সে নিজে থাকবে নিরাপদে, আর পুলিস খুঁজে মরবে এমন কোনও ব্যক্তিকে পৃথিবীতে যার অস্তিত্বই নেই।'

চন্দ্রনাথ ঝাঁজালো গলায় বললে, 'ও জুতো যে আমার, সেটা প্রমাণ করবে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'সে ভার পুলিসের হাতে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারো। এই জুতো জোড়া পাওয়া গিয়েছে তোমার বাড়িতে। পুলিস দেখেই জুতো জোড়া তুমি সরিয়ে ফেলতে গিয়েছিলে। তার উপরে এমন আরও অনেক সারকামসট্যানসিয়াল এভিডেন্স বা অবস্থা-ঘটিত প্রমাণও আছে, তোমাকে ফাঁসিকাঠে দোলাবার পক্ষে যা হবে যথেষ্ট।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল! যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর! হুম্, জয়ন্তের মতো রোজা না হলে চন্দুরের মতো ভূতকে শায়েস্তা করতে পারে কে?'